তারাসুন্দরী।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা,

১৮৮ নং অপার সারকুলার রোড

দরিদ্রকুটীর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৯০৮।

[মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

PRINTED BY L. N. MUKHERJEE,
AT THE NEW ARYA MISSION PRESS;
10, SUMBHU CH. CHATTERJEE'S STREET,
CALCUTTA.

জ্ঞানগৌরবের উচ্চ আদর্শ,

দেশীয় সর্ব্বপ্রথম ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

পণ্ডিতাগ্রগণ্য সখ্যস্নেহ-প্রেমনিপুণ,

অমরধাম নিবাসী,

মহামতি

৺জগদীশনাথ রায় মহোদয়ের

উদ্দেশে

এই ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি পুস্তক,

সসম্ভ্রমে সমর্পিত হইল।

দেব !

কেবলমাত্র বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতি সাহিত্য
আপনার সাহিত্যবিষয়ক অমূল্য উপদেশ গ্রহণ করিয়া প

হইতেন না। ক্ষুদ্র হইলে আমিও উহাতে বঞ্চিত হই নাই তদুপরি আপনার সুধাবিনিন্দিত বাৎসল্য স্নেহের মধুর রস আস্বাদন করিয়া, কতদিন কতই আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। জানিনা কোন্ পুণ্যবলে আপনার কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। সেই প্রেমমধুবিমিশ্রিত কৃপাই, আমার ইহ জীবনের উন্নতির মূলভিত্তি বলিয়া এখনও বিস্মৃত হইতে পারি নাই। আজি তাহারই সুখস্মৃতি এবং অপরিমিত কৃতজ্ঞতারাশি প্রণোদিত হইয়া এই "তারাসুন্দরীকে" ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। সুরলোক হইতে সদয় দৃষ্টিতে এই চির অনুগৃহীতের প্রতি একবার কটাক্ষ করুন এই প্রার্থনা।

ভবদীয়—

চিরানুগৃহীত শ্রীতারাপ্রসন্ন পাধ্যায়।

তারাসুন্দরী।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পর্ণকুটিরে।

অজয় নদের উপকণ্ঠে একখানি জীর্ণ পত্র কুটিরে মাতা ও কন্যা বসিয়া আছেন। মাতা প্রৌঢ়াবস্থা প্রায় অতিক্রম করিয়াছেন। কন্যার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ অতীত হয় নাই। শতগ্রন্থি কষায়বসন পরিহিতা জননীকে দেখিলে বোধ হয় বনদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া এই নির্জ্জন পর্ণকুটিরে আবির্ভূতা হইয়াছেন। তাঁহার গাত্রে অলঙ্কারের লেশমাত্র নাই। কেবল সধবা চিহ্ন রক্ষা করিবার নিমিত্ত দুই হস্তে দুইগাছি লাল সুতা এবং সীমন্তে সুদীর্ঘ সিন্দূর বিন্দু। আহা! তাহাতে যে শোভা হইয়াছে, তেমন শোভা বুঝি আর কখন দেখিতে পাইবনা। মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারে সে শোভা হয় না; রেশম পশমের বহুমূল্য বস্ত্রে সে সৌন্দর্য্য আনিতে পারে না। সে এক অপূর্ব্ব অনুপম স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য। দেখিলে ভক্তিরসে আত্মহারা হইয়া মা! মা! বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে; আর ইচ্ছা হয়, সেই

নী দেবীকন্যা মাতৃদেবার সুমধুর কণ্ঠের স্নেহসম্ভাষণ শুনিয়া
চরিতার্থ করি।

মা! কেন তোমার এ দীনা হীনা ভিখারিণী বেশ? কেন
এ নির্জ্জন বাস? মা! তোমার ঐ অনিন্দ্য মুখমণ্ডলে কালিমা
? প্রশস্ত ললাটে চিন্তা রেখা কেন? মা! তুমি যতই চেষ্টা
ন, তোমার রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি লুকাইতে পারিবে না।

ধ্যানস্তিমিতনেত্রা বর্ষীয়সীর পার্শ্বে যে সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী
াছেন, তাঁহারও রূপলাবণ্য অতুল। সে রূপপ্রভায়, পত্রকুটির
ত।

র রূপসাগরে পূর্ণজোয়ার ঢলঢল করিতেছে। সেই যুবতীর
শ্রান্ত নয়ন, সুদীর্ঘ কেশপাশ, সুগঠিত বাহুযুগল প্রভৃতি যে অঙ্গে
করা যায়, সকলই যেন পূর্ণ সৌন্দর্য্যময় বলিয়া বোধ হয়। কোন
কোন ত্রুটি দেখা যায় না।

া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কিন্তু জননীর ধ্যান ভঙ্গ
। তখন মধুরকণ্ঠে মা! মা! বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।
ব্যস্তে চক্ষুঃ উন্মিলন করিয়া কন্যার দিকে চাহিলেন।

—

এমন করিয়া আর কত দিন চলিবে?

া—

মা! কি হইয়াছে?

া—

! আরত চলে না। আজ দ্বাদশী (হরসুন্দরী সধবা হইলেও
ব্রত পালন করিতেন) তোমার পারণের জন্য একমুঠা
তেছি তাহাতে এ স্থানে থাকিলে শীঘ্রই

বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা। জীবন দাদাকে কাল হইতে দেখিতে পাইতেছি না; আর গৌরী দিদিও আজ পাঁচছয় দিন আমাদের কোন খোঁজখবর লয় নাই। আমার বোধ হয়, উহারা কোন বিপদে পড়িয়াছে; নতুবা নিশ্চয়ই আমাদের সংবাদ লইত।

মাতা—

মা! দীনবন্ধুকে অনবরত ডাকিতেছি। তিনিই বিপদে রক্ষা করিবেন। আহা! জীবন আর গৌরীই আমাদের জীবন রক্ষক। তাহাদের জন্যই এ ঘোর বিপদে এতদিন জাতিকুল প্রাণ বজায় আছে। চাকর চাকরাণী অনেকের থাকে; কিন্তু এমন আত্মবঞ্চনা করিয়া, এমন ত্যাগ স্বীকার করিয়া কে কখন্ দুঃখিনী প্রভুপত্নী ও প্রভুকন্যাকে প্রতিপালন করিয়া থাকে? একজন অন্যের বাড়ী দাসীত্ব করিয়া, আমাদিগকে খাওয়াইতেছে, আর একজন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া এমন কি প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া আমাদের রক্ষা করিতেছে।

আমার দেবকান্ত নিরুদ্দেশ হইয়াছে; সে জীবিত আছে কি নাই তাহারও স্থিরতা নাই। কিন্তু জীবনের অসাধারণ ভক্তি শ্রদ্ধায় আমার সে পুত্র অদর্শন শোকের অনেক লাঘব হইয়াছে। আর গৌরীও নিজগুণে কন্যা স্থানীয়া হইয়াছে। সে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা, তুমি কনিষ্ঠা। আহা! বাছারা বোধ হয় আমার জন্য ঘোর বিপদে পড়িয়াছে; নতুবা এসময়ে অনুপস্থিত থাকিবে কেন? আমি বিশেষ করিয়া বুঝিয়াছি, তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা অকৃত্রিম। তাহাদের এই অকৃত্রিম ভক্তিশ্রদ্ধা না পাইলে আমরা এতদিন কোথায় ভাসিয়া যাইতাম। দয়াময় ভগবন্! আমরাত বিপদসমুদ্রে ডুবিতে বসিয়াছি; বরং আরো বিপদে আমাদিগকে ফেলিয়া দাও; কিন্তু আমার বাছাদের, আমার পুত্র কন্যা স্থানীয় বিপদের বন্ধু জীবন ও গৌরীকে বিপদে ফেলিও না।

জীবনদাদা আর গৌরীদিদি আমাদের জন্য যাহা করি-
ার তুলনা নাই। এমন পরোপকারী পুণ্যবান্ যাহারা, তাহাদের
য়? ভগবান্ নিশ্চয়ই তাহাদের সহায় হইবেন।

—

বিপদে ধৈর্য্য ধারণ আর ভগবানে নির্ভর করিতে পারিলে,
ন আশঙ্কা থাকে না। ভগবানে নির্ভর করিয়া বিপদকে
না করিলে বিপদের সাধ্য কি যে তোমাকে ক্লেশ দেয়? মা
বালিকা নও, এখন উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইয়াছ। অত-
ানে নির্ভর কর। সুখ দুঃখ মনে। যদি সুখে উল্লাসিত এব
ভিভূত না হও, তবে কিসের ভাবনা?

—

আমি তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং ছায়ার ন্যায়
সঙ্গিনী হইয়া বিপদে ধৈর্য্য ধারণের ক্ষমতা লাভ করিয়াছি; আর
কার্য্য এবং তোমার নির্ব্বাক উপদেশ আমার হৃদয়ের বল বৃদ্ধি
িয়াছে।

—

।! আমার জ্ঞান বুদ্ধি অতি সামান্য। তোমার ঋষিতুল্য
সেবা করিয়া যে কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছি, এই ঘোর বিপ-
য়ে তাহাতে বিশেষ উপকার হইয়াছে। জানি না—আমার সেই
তা কোন্ নির্জ্জন গিরিগুহায় সমাধিমগ্ন আছেন। সেই জ্ঞান
অগ্রগণ্য মহাপুরুষ যে খানেই থাকুন, তাঁহার স্নেহদৃষ্টি নিশ্চয়ই
প্রতি আছে।

কন্যা—

মা! বাবা কি সত্য সত্যই আমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন? এত দয়া, এত প্রেম কি করিয়া পরিত্যাগ করিলেন?

মাতা—

বাছা! তুমি বালিকাবস্থায় তাঁহাকে চিনিতে পার নাই। তিনি মায়াবীও নহেন, আবার মায়াত্যাগী, সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীও নহেন। তিনি কর্ত্তব্য পরায়ণ। এক কথায় সংসার এবং ভগবান্ উভয় ভাবেই তিনি বিজড়িত। যখন সন্ন্যাসীরাও বসুধৈবঃ কুটুম্বকং জ্ঞান করেন, তখন তিনি কর্ত্তব্য পরায়ণ পরম জ্ঞানী হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন কেন? তবে যে আমাদের হইতে দূরে আছেন, ইহার নিগূঢ় কারণ আছে। সে নিগূঢ় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার সময় হইলে তোমার নিকট প্রকাশ করিব। এই বলিয়া জননী আবার স্তিমিতনেত্রা হইয়া ধ্যানে বসিলেন। এ আরাধনার উদ্দেশ্য জীবনের গৌরীর বিপদ মোচন। গৃহে আহারীয় দ্রব্যের কণামাত্র সংস্থান নাই, একথা ইতি পূর্ব্বে কন্যার নিকট শুনিয়াছেন; কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন প্রকার ব্যগ্রতা দৃষ্ট হইল না; কন্যাও তৎসম্বন্ধে আর কিছুই বলিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০ঃ০—

ভগবানের করুণা।

কে বলে ভগবানে আত্মনির্ভর করিলে তাহার ফল পাওয়া যায় না? যে বলে সে হয় নাস্তিক, না হয় প্রকৃত নির্ভর কাহাকে বলে তাহা জানে

না। কায়মনে ডাকিতে পারিলে, ভক্তবৎসল ভগবান্ কখনই স্থির থাকিতে পারেন না। সেই জন্যেই লোকে তাঁহাকে ভক্তের ভগবান্ এবং বিপদের কাণ্ডারী বলে। তুমি বিংশ শতাব্দীর সুশিক্ষিত বিজ্ঞানবিদ্, এরূপ আত্ম-নির্ভরকারীকে বাঁতুল বলিয়া হাস্য করিবে; কর। তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তুমি তোমার শুষ্ক এবং প্রেমশূন্য হৃদয় লইয়া একান্তে অবস্থান কর; তোমার সহিত কাহারও সহানুভূতি নাই। যে ভগবানে অবিশ্বাস করে, সে কখন ভাল বাসিতে জানে না; আর যে ব্যক্তি পুত্র কন্যাকে ভালবাসে, এমন কি পশু পক্ষীকেও প্রিয় জ্ঞান করে, তাহার হৃদয়ে ভাগবতপ্রেম প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজ করে; সময় পাইলে সে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া আনন্দধারার ফোয়ারা ছুটাইয়া দেয়।

আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত প্রবীণা রমণীর নাম হরসুন্দরী দেবী। হরসুন্দরীর সবিশেষ পরিচয় পাঠক পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বিশেষরূপে অবগত হইবেন। এক্ষণে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে হরসুন্দরী বড় বিপন্না। কন্যা তারাসুন্দরীর নিমিত্তই এই বিপদের সূচনা। কি প্রকারে কন্যার সতীত্ব রত্ন অক্ষুণ্ণ রহিবে, কিসে জাতি কুল মান বজায় থাকিবে, এই চিন্তায় হরসুন্দরী বড়ই কাতরা হইয়াছেন। তাঁহার রাজাধিরাজ স্বামী কি অবস্থায় কোথায় আছেন, কিছুই জানিবার উপায় নাই। স্নেহময় পুত্রও পিতৃপথ অনুসরণ করিয়াছে; তাহারও কোন সংবাদ নাই। তাঁহার প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা, বিপুল জমিদারী পরের হস্তগত। রাজরাজেশ্বরী এখন পথের ভিখারিণী। কিন্তু হরসুন্দরীর বিপদ যত ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, তাঁহার ভাগবত প্রেম তত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। হরসুন্দরী এখন সেই প্রেমে আত্মহারা।

জীবন ও গৌরীর বিপদ আশঙ্কায়, হরসুন্দরী বৃথা হা হুতাশ না করিয়া ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। উপবাসিনী

হরসুন্দরী অনন্তধ্যানেনিমগ্না। চক্ষুতে পলক নাই; শরীরে স্পন্দন নাই; বোধ হয় সমাধি হইয়াছে। আহা কি সুন্দর, কি অপূর্ব্ব, কি দিব্যদ্যুতি প্রকাশ পাইতেছে। পবিত্র পর্ণকুটিরে স্বর্গীয় শোভার সমাবেশ হইয়াছে। মা! এই ভাবে কিছুক্ষণ থাক; তাহা হইলে ক্ষুধাতৃষ্ণা রোগ শোক দুঃখ দারিদ্রে আর ক্লেশ পাইতে হইবে না। নৃশংসের নিষ্ঠুরতা চলিয়া যাইবে; পাপীর পাষাণ হৃদয় গলিবে; কামুকের কামস্পৃহা দূরে যাইবে। তাই বলি মা! এই অবস্থায় কিছুকাল অবস্থান কর। মা! বিষধর ফণা গুটাইবে; ব্যাঘ্র বদন অবনত করিবে; দস্যু চরণধূলি লইতে অগ্রসর হইবে। তাই বলি মা! আরো কিছুক্ষণ ঐ যোগীজনদুর্ল্লভসমাধিমগ্না হইয়া থাক। সহসা কুটির বাহিরে মনুষ্য পদধ্বনি শ্রুত হইল। হরসুন্দরীর এই উগ্র সমাধি ভগবানের চরণে পঁহুছিয়াছে; তাঁহার কঠোরতপের চরম ফলের প্রেরণা উপস্থিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—•:○—

বিজয় কুমার।

কেশব পুরের জমিদার রায় উমাশঙ্কর চৌধুরীর জামাতা বিজয় কুমার বিবিধ খাদ্য দ্রব্য এবং পরিধেয় বসন সঙ্গে লইয়া কুটিরদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। সঙ্গে দুইটী ভার বাহক।

শ্যামাসুন্দরী ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

হরসুন্দরী এবং শ্যামা শত্রুভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতেন। জীবনের অদর্শনে আজকাল আশঙ্কার মাত্রা কিছু বেশী হইয়াছিল।

প্রভুপত্নী এবং প্রভুকন্যার রক্ষার নিমিত্ত জীবন নিজজীবন উৎসর্গ করিয়াছে। সে প্রাণেরমায়া করেনা। জীবন অস্ত্রচালনায় ও লাঠিখেলায় সিদ্ধ হস্ত। সে তরবারি কিম্বা লাঠি ধারণ করিয়া দাঁড়াইলে কাহার সাধ্য তাহার সম্মুখীন্ হয়? সিদ্ধহস্ত জীবন পঞ্চাশ যাটি জনের মহাড়া অনায়াসে লইতে পারে। ইহাতে তাহার কিছু মাত্র ক্লেশ হয় না। ইহাভিন্ন হরসুন্দররীর সাবেক প্রজা বাগ্দীজাতীয় বহু সংখ্যক লোক জীবনের পক্ষপাতী। তাঁহাদের অনেকেই জীবনের সাকরেদ, তাহারা পূর্ব্ব প্রভুর প্রতি ভালবাসা এবং জীবনের প্রতি ভক্তি, এই উভয় কারণে জীবনের আজ্ঞাবহ। এই সকল বুঝিয়া উমাশঙ্করের ন্যায় প্রবল শত্রু এবং নবাবের লোকপর্য্যন্ত হরসুন্দরীর প্রতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন অত্যাচার করিতে সাহস করে নাই। আজ কয়েক দিন জীবনের দর্শন নাই।

হরসুন্দরীর ভাব বুঝা যায় না। তিনি তন্মনা। কিন্তু শ্যামার ব্যগ্রতার পরিসীমা নাই। শ্যামার আকুল ক্রন্দনে মাতার ধ্যানভঙ্গ হইল। বিজয়ও সেই সময়ে তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন।

হরসুন্দরী একটু বিরক্তির সহিত কহিলেন "বাছা! এ অসহায়া, বিপন্নাস্ত্রীলোকদিগের নিকট তোমাদের আগমনের কোন কারণ বুঝিতে পারিতেছিনা"। বিজয়কুমার সমভিব্যাহারী বাহকদ্বয়কে চাউল ঘৃত এবং বস্ত্রাদি নামাইতে কহিয়া, নতশিরে হরসুন্দরীকে প্রণাম করিলেন। পরে অতি বিনীত ভাবে কহিলেন "মা! (হরসুন্দরীকে দেখিলে মাতৃশব্দ যেন আপনাআপনি উচ্চারিত হয়), আমি শত্রু ভাবে আপনার নিকট আসি নাই। আমি আপনার প্রধান শত্রুর নিকট-আত্মীয় বটে, কিন্তু আপনার ও আপনার মহাপুরুষ স্বামীর দেবচরিত্র শ্রবণ করিয়া বহুদিন হইতে চরণ ধূলি ভিক্ষা করিব বলিয়া মানস করি-

সাছি। এতদিন সময় ও সুযোগ পাই নাই; আজ আপনাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। কিঞ্চিৎ পূজার উপকরণ দ্রব্য আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুণ। এই বলিয়া উমাশঙ্করের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, শ্যামাসুন্দরী অপহরণের ষড়যন্ত্র, জীবন ও গৌরীর নির্যাতন একে একে সমস্ত বর্ণনা করিলেন।

বিজয় কুমার উমাশঙ্করের জামাতা শুনিয়া প্রথমে হরসুন্দরীর মনে একটু অবিশ্বাসের আবছায়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সরলতামাখা সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া শীঘ্রই সে ছায়া বিলীন হইয়া গেল। তিনি আগ্রহের সহিত বিজয়কুমারের সকল কথা শুনিলেন এবং বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করিলেন। শ্যামার প্রতি অত্যাচার সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতে গিয়া বিজয় কুমার লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হইয়াছেন, শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, বাবা! এ অভাগিনীর উপকার করিতে গেলে বিশেষরূপে ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হইবে। আমার জীবন এবং গৌরীই তাহার নিদর্শন। বাপ! আমার জীবন ও গৌরী কি অবস্থায় আছে? তাহারা বোধ হয় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। হরসুন্দরী আর কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার দুনয়নে দরদর ধারা বহিতে লাগিল। শ্যামারও চক্ষুঃ সজল। সে বিজয়কুমারের উত্তর শুনিবার নিমিত্ত ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া রহিল।

বিজয়—

মা! আমার শ্বশুর মহাশয় যে প্রকার অত্যাচারী, আর তাঁহাদের প্রতি তাঁহার যে প্রকার আক্রোশ, তাহাতে তাহাদের ক্লেশ হইবারই কথা। কিন্তু আমার দয়াবতী শাশুড়ীঠাকুরাণী ও একজন পুরাতন ধর্ম্মশীল ভৃত্যের চেষ্টায় উহাদের ক্লেশের অনেক লাঘব হইয়াছে।

মা! তাহারা আপনাদের ক্লেশকে ক্লেশ বোধ করেনা; খাদ্য দ্রব্য দিলে স্পর্শ করে না; গৌরী বলে "মা আমার উপবাসিনী আছেন, শ্যামা অনাহারে কষ্ট পাইতেছে, এ অবস্থায় আমি কি করিয়া আহার করিব?" সে অনবরত কাঁদিতেছে আর বলিতেছে "আমি না গেলে কে তাঁহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিবে?" জীবন বলিতেছে "বৃথা প্রাণ ধারণ করিয়াছিলাম, *এই ঘোর বিপদের সময় প্রভু পত্নীর কোন উপকার করিতে পারিলাম না; শ্যামাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না।* এই সুযোগে নিশ্চয়ই দুর্বৃত্তরা শ্যামাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; শ্যামাকে লইয়া গেলে জননী জীবন ত্যাগ করিবেন। প্রভু শুনিলে আমাকে কি বলিবেন—বলিবেন—জীবন! তোমার শক্তি সামর্থে নির্ভর করিয়া আমি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছি; তোমারই ভক্তি ভালবাসায় বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত আছি; আজ তাহার কি করিলে? তখন আমি কি বলিব? সেই দয়াল ঋষিতুল্য প্রভুর নিকট কি করিয়া আত্ম দোষ ক্ষালন করিব? আমি জীবনান্ত পণ করিয়া সাহস না দিলে বোধ হয় তিনি এতদূর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। হায়! আমার ন্যায় অধমের প্রতি নির্ভর করিয়াই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইতে চলিল। আমার যদি জীবন শেষ হইত তাহা হইলে বড় সুখের হইত।"

আমি অনেক বুঝাইয়া তাহাদের উভয়েরই কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়াছি। আমি ভার লইবার পরে তাহারা অন্নজল গ্রহণ করিয়াছে। আমি শপথ করিয়াছি, যে প্রাণ দিয়াও আপনাদিগকে রক্ষা করিব। আর তাহাদেরও যাহাতে কোন কষ্ট না হয় এবং যাহাতে তাহারা শীঘ্র নিরাপদ হইতে পারে, তাহাও আমাকে করিতে হইবে। রায়জির এই ঘৃণিত অভিসন্ধি কোনমতে সফল হইতে দিব না। ইহাতে তাঁহার বিদ্বেষ বিরাগ বা তাঁহার সহিত চিরবিচ্ছেদের কিছুমাত্র ভয় করিব না।

এক্ষণে আমার সবিনয় অনুরোধ এই যে আপনারা কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া একটু সুস্থ হউন।

এই অল্প সময়ের মধ্যে বিজয়ের প্রতি হরসুন্দরীর বড় স্নেহ হইয়াছে। অতএব বিজয়ের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন বেলা প্রায় আড়াই প্রহর অতীত হইয়াছে, আর রন্ধনের সময় নাই, তোমার আনীত দ্রব্য দ্বারা জলযোগের ব্যবস্থা হউক। কিন্তু বাবা? তোমাকেও আমাদের সঙ্গে কিছু খাইতে হইবে।

বিজয় অস্বীকার করিতে সাহসী হইলেন না। শ্যামা পরিবেশন করিলে সকলে তৃপ্তিপূর্ব্বক জলযোগ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গৌড়নগর।

পাঠক! একবার কল্পনা নয়নে গৌড়নগরের সুচারু চিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। সুরম্য হর্ম্ম্য নিচয়ের ভগ্নস্তূপ মণ্ডিত শ্বাপদ সংকুল বন গহন পরিবৃত হইয়া যে গৌড় এখনও অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এ সেই গৌড়; কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ইহা ধনধান্যঐশ্বর্য্যে বঙ্গভূমির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া সগৌরবে নৃত্য করিতেছিল; এই গৌড়ের নামানুসারে সমস্ত বঙ্গভূমিকে গৌড়দেশ বা গৌড়ভূমি বলিত।

ইহার সে সময়ের শোভার কথা কি কহিব? দিল্লীর পাঠান মোগল বাদসাহগণ দিল্লী ও আগরার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে অকাতরে অর্থ ব্যয়

করিতেন। বাঙ্গালার নবাবগণও সেই মত গৌড় নগরের শোভা বর্দ্ধনে অর্থ ব্যয় করিতে কৃপণতা করিতেন না। কখন কখন দুই একজন খেয়ালী নবাব মনোমুগ্ধকর সৌধরাজি নির্ম্মাণ করিতে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। শিল্প, বাণিজ্য, বিলাসিতা ইত্যাদি কোন বিষয়েই এই পুরাতন গৌড়, দিল্লী বা আগরা হইতে ন্যূন ছিল না। সুবিস্তীর্ণ রাজপথ, সুগভীর সরোবর, বিপুলবাণিজ্যসম্ভারপরিপূর্ণবিপণীশ্রেণী, দেবালয়, শিল্পালয়-শোভিত গৌড় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। কোথাও ফলপুষ্প শোভিত উদ্যানরাজি, কোথাও মুসলমান বিলাসিতার চূড়ান্তদৃশ্য, কৃত্রিম কেলি-কানন; মধ্যে মধ্যে জলের ফোয়ারা; অগণ্য সৌধরাজি, প্রান্তভাগে সুদৃঢ় সুন্দর দুর্গ। হস্তী অশ্ব পদাতিক সৈন্যে দুর্গ প্রাচীরের পরিখাবেষ্টিত স্থানগুলি যেন তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত বীচীমালায় উৎক্ষিপ্ত হইতেছে; ইহা ভিন্ন, হাম্মাম, মসজিদ, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি মুসলমান রুচি অনুমোদিত অসংখ্য অট্টালিকায় নানাস্থান পরিশোভিত।

পৌষ মাস। দারুণ শীতের প্রকোপ পড়িয়াছে; সূর্য্যোদয়ের এখনও একটু বিলম্ব আছে; কিন্তু এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেই বহুজনসমাকীর্ণ গৌড়পুরী জাগরিত হইয়াছে।

কোথাও ডোর কৌপীনধারী দুই একটী বৈরাগী ভৈঁরোরাগে

ভোর ভৈল জাগো জাগো নন্দলাল,
ভানু উঠলো তিমির টুটলো জগো উজল।
তুহুরূপ হেরয়িতে, ধ্যান পরায়ণ চিতে,
কত ঋষি মুনি ব্রজধামে আয়ওলো॥
ধ্যানসে নেহারে যোই; আঁখমে হেরব সোই,
তুহু দরশন আসে সবে ধাওয়লো॥

কালিন্দী কল কলে, জাগো বংশী ধারী বোলে,

পরম আনন্দে রঙ্গে উজান বহওলো॥

ইত্যাদি গান করিতে করিতে পথে যাইতেছে। কোথাও তেজঃপুঞ্জ স্থবির বিপ্রগণ "হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোবিন্দ গোপাল মকুন্দ সৌরে" বলিতে বলিতে ভাগীরথী স্নান করিতে যাইতেছেন।

দলে দলে অবগুণ্ঠনবতী রমণীরদল অলক্তরাগরঞ্জিতচরণে অলঙ্কার ধ্বনি করিতে করিতে সুরতরঙ্গিণী তীরে গমন করিয়াছেন। কঠোর সামাজিক শাসনের ভয়ে কম্পিত দুই একটী নাগরিক যুবক সমস্ত রাত্রি বিপথে বিচরণ করিয়া অতি সংকুচিত ভাবে গমন করিতেছে; তখন তাহারা এইরূপ মনে করিতেছে যে অদ্য কোন প্রকারে লোকলজ্জা হইতে রক্ষা পাইতে পারিলে আর এপথে পদার্পণ করিবে না। কৃষিজীবি এবং শিল্পীগণ অতি প্রত্যুষেই নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০:০—

নবাব দরবার।

নবাব বাড়ীতে নাকাড়াধ্বনি হইল। সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর নহবত বাদ্য বাজিতে লাগিল; নকিব সুতান এবং সুকণ্ঠে নবাবের নিদ্রাভঙ্গ-সূচক গীত আরম্ভ করিয়া দিল।

আজি নবাব বাড়ীতে দরবার হইবে। কর্ম্মচারীবর্গের, ভৃত্যগণের তৎপরতার সীমা নাই; সকলেই আপন আপন কর্ম্মে বিশেষ ব্যাপৃত; কে কাহাকে ডাকিতেছে, কে কাহাকে কি বলিতেছে তাহার স্থিরতা নাই। অনেকেই প্রত্যুষে উঠিয়াছে, কেহবা রাত্রি জাগরণ করিয়া সকলেই যেন চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। অদ্যকার এই দরবারে কা সর্ব্বস্ব যাইবে; আবার কেহ ঐশ্বর্য্যশালী হইবে; কেহ রায়বা রাজাবাহাদুর হইবে, কেহবা রাজকোপানলে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হ কাহারও সর্ব্বনাশ, কাহারও পৌষ মাস। বহু রাজা, রাজড়া, জমিদা দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু সকলেই থরহরি কম্প নবাব, বাদসাহ দরবারে কাহার জন্য কিরূপ এত্তেলা করিয়াছেন, অনেকেই তাহা অবগত নহে।

এই জন্যই তাহাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা। কেবল উমাশঙ্কর প্রভৃতি কতিপয় জমিদার আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছেন। নবাবদরবারে ঘনিষ্টতা থাকাতে বাদসাহদরবারে তাঁহাদের জন্য যে এত্তেলা হইয়াছে তাহা তাঁহারা অবগত আছেন। সেই নিমিত্তই তাঁহাদের আনন্দ। বাদসাহ দরবার হইতে একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী দলবল সহ আগমন করিয়াছেন।

বাদসাহের পাঞ্জা সাক্ষরিত হুকুমনামা সহিত যে কর্ম্মচারী আগরা হইতে আসিতেন, তাঁহার গৌরব ও সম্মানের সীমা থাকিত না। দস্যুতস্কর সমাকীর্ণ তখনকার সে দুর্গম রাজপথে নিরস্ত্র এবং নিঃসহায় হইয়া আসা বড়ই বিপদ সংকুল ছিল। উভয় পার্শ্বস্থ নিবীড় অরণ্য ভেদ করিয়া ঐ পথে গমনাগমন করিতে হইত বলিয়া, বাদসাহ দরবার হইতে যে কর্ম্মচারী আগমন করিতেন, তাঁহাকে বিশেষ আড়ম্বর এবং শক্তিসম্পন্ন হইয়া আসিতে হইত।

সম্রাটপ্রেরিত হুকুমনামা, হস্তীপৃষ্ঠে মহাসম্মানে আনীত হইত

সঙ্গে গোলন্দাজ, অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য আসিত। একদল রণবাদ্যকারী বাদ্য ধ্বনি করিতে থাকিত; এবং মধ্যে মধ্যে তোপধ্বনি সাহান সাহাকি জয়শব্দে দিক্‌স্ত কম্পিত হইত। গত দিবস আগরা বাদসাহ প্রেরিত কর্ম্মচারীর সহিত হুকুমনামা আসিয়াছে। সেই নদ্য এই দরবারের আয়োজন।

বলা এক প্রহর অতীতপ্রায়। নবাব বাড়ীর দরবারগৃহ লোকে- রণ্য। নবাবসরকারের কর্ম্মচারীবর্গ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান। ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে; বঙ্গাধীপের অধীনস্থ রাজা ও রগণ বহুমূল্য সাজ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া উপযুক্ত আসনে উপবেশন ছেন; হীরামুক্তার যেন ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে; যিনি যত াছেন, মণি মাণিক্যে বিভূষিত হইয়া আসিয়াছেন; কেহ কেহ এক পরিবর্ত্তে দুই তিন গাছি মুক্তার মালা গলদেশে পরিধান করিয়াও বাধ করিতে পারিতেছেন না।

রবারগৃহের মধ্যস্থলে সুচারু কাঞ্চনকার্য্যখচিত মুক্তামণ্ডিত প নিম্নে বঙ্গাধীপের মসনদ। মসনদ এখনও পর্য্যন্ত শূন্য আছে; পের এখনো বার হয় নাই। আগরা হইতে সমাগত সম্রাট্ কর্ম্মচারী র দক্ষিণ পার্শ্বে সগর্ব্বে বসিয়া আছেন। সম্রাটের নিকট হইতে আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার গর্ব্বের সীমা নাই। সেনাপতি মোনায়েমখাঁ, অসুস্থতা বশতঃ দরবারে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তিনি বাদসাহ কর্ত্তৃক নিয়োজিত; সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাদসাহের অধীন। বঙ্গাধীপ স্বাধীন হইবার চেষ্টা করায়, বাদসাহ, রাজাতোডর্ম্মল্লকে তাঁহার দমনে প্রেরণ করেন। তোডর্ম্মল্ল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দায়ুদ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। তদবধি সৈনিক বিভাগ বাদসাহের খাসে থাকিবার বন্দোবস্ত হয়। দায়ুদখাঁ নির্ব্বিষ বিষধরের ন্যায় অগত্যা এই বন্দোবস্তে সম্মত হইয়া-

ছেন। মোনায়েম খাঁ স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলেও সহকারী সেনাপতি এবং অন্যান্য পদস্থ সৈনিকগণ দরবার গৃহের শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছেন, অশ্বারোহী, পদাতিক এবং গোলন্দাজ সৈন্যে সভা গৃহের চারিদিকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হইয়াছে। অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নিত সুনীলপতাকাধারী অসংখ্য সৈন্য বঙ্গাধীপের তোরণ দ্বার হইতে দরবার গৃহ পর্য্যন্ত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান আছে।

দরবার ভবন নীরব নিস্তব্ধ। একটী সূচিকা পতনেরও শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সহসা পার্শ্বদ্বার সবলে উন্মোচিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে মণি রত্ন বিজড়িত বঙ্গাধীপ দায়ুদ খাঁ মসনদে উপবেশন করিলেন। বঙ্গবিহার উড়িষ্যার অধিশ্বরের উপযুক্ত সাজসজ্জা। এ সজ্জার নিকট দরবার গৃহে উপবিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বহুমূল্যসাজসজ্জা বিমলিন হইয়া গেল অনেকের অহঙ্কার চূর্ণ হইল।

বঙ্গাধীপ মসনদে উপবিষ্ট হইয়াই পেসকারকে বাদসাহ প্রেরিত হুকুমনামা পাঠ করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

পেসকার সসম্ভ্রমে হুকুম নামা গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিল। পরে পুনর্ব্বার হস্তে ধারণ করিয়া পাঠ করিতে লাগিল।

হুকুম।

রাজা রতিকান্ত রায়ের জমিদারী রাজেয়াপ্তি ও তাঁহার গ্রেফ্তারীর হুকুম বাদ হইল। রতিকান্তের রাজাউপাধি কাড়িয়া লইয়া উমাশঙ্কর রায়চৌধুরীকে প্রদান করিবার হুকুমও রহিত করা গেল। আগরা

দরবারে এত্তেলা দিবার পূর্ব্ব হইতেই রাজা রতিকান্তকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দেওয়া ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য সুবেদারকে যথোচিত চসম্‌নামাই করা গেল এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেওয়া গেল। ক্ষণবিলম্ব না করিয়া রাজা রতিকান্তরায়কে স্বপদে পুনঃস্থাপিত ও তাঁহার নিকট ত্রুটি স্বীকার করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। রতিকান্ত রায়ের রাজভক্তি, শৌর্য্য, বীর্য্য এবং গুণবত্তার কয়েকখানি প্রশংসাপত্র এই হুকুমনামার সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া গেল। বঙ্গাধিপ ঐ প্রশংসা-পত্র গুলি পাঠ করিবার অনুমতি দিলে, পেসকার উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলেন। ঐ প্রশংসাপত্র রাজাতোডর্ম্মল্ল, প্রধান উজির এবং কয়েকজন ওমরাহের স্বাক্ষরিত। বাদসাহপক্ষের বিশেষ হিতকারী বলিয়া ঐ প্রশংসা পত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

বাদসাহের এই হুকুমনামা শ্রবণ করিয়া সকলেই নীরব হইয়া রহিল; উষাশঙ্করের প্রফুল্লবদন মলিন হইয়া গেল। বঙ্গাধিপের কৃতকার্য্যের উপর এরূপ কড়া হুকুম আসিতে পারে, ইহা তিনি স্বপ্নেও মনে করিতে পারেন নাই।

বঙ্গাধিপ যারপরনাই বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "অসহ্য—অসহ্য—এরূপ অপমান অসহ্য"।

বাদসাহের হুকুমের এরূপ বিরক্তিকর প্রতিবাদ শুনিয়া, সভাস্থ লোক ভয়ে ও বিস্ময়ে মস্তক অবনত করিয়া রহিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সেনাপতি মোনায়েমখাঁ অদ্য সভাস্থলে উপস্থিত নাই। তিনি উপস্থিত থাকিলে, আজ একটা ভীষণ কাণ্ডের অভিনয় হইয়া যাইত। কিন্তু সম্রাট্-প্রেরিত কর্ম্মচারীর কর্ণে সুবাদারের এই প্রতিবাদ নিতান্ত অসহ্য হইল।

তিনি কম্পিতকলেবরে বলিয়া উঠিলেন, বদ্‌বখ্‌ত, বেৎমিজ! সাহান্ শাহার হুকুমের প্রতিবাদ? এত স্পর্দ্ধা?

অধিকাংশ লোক সেই বাক্যের প্রতিধ্বনিতে "কেরামত, কেরামত' করিয়া উঠিল ?

দায়ুদখাঁর চৈতন্য লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে; ক্ষোভে, রোষে মর্ম্মাহত সুবাদার চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন।

এ অপমানের প্রতিশোধ সেই মুহূর্ত্তেই অপমানকারার দণ্ডবিধান; কিন্তু তাহা তাঁহার সাহসে কুলাইল না।

তিনি বুঝিলেন যে ভয়, ভক্তি এবং কর্ত্তব্যতার অনুরোধে, এক্ষেত্রে সম্রাটপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া কেহই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবে না। এদিকে অপমানকারীও নিস্তেজ ও নিঃসহায় নহে। বিশেষতঃ সেনাপতির সাহায্য পাইলে আরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে। বঙ্গাধিপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সভাভঙ্গ পূর্ব্বক সত্বরপদে বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—*—

শশী পাগলিনী।

সূর্য্যদেব অস্তগমনের উদ্‌যোগ করিতেছেন, বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে; গাভীদল দলে দলে গোষ্ঠ হইতে হাম্বারবে ফিরিতেছে; সে সময়ে তাহাদের গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? তাহারা তন্ময় হইয়া কেবল বৎসের ভাবনায় উন্মত্ত; পক্ষীকুল চিচি কুচি ধ্বনি করিয়া নিজ নিজ নীড় অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়াছে; সমস্ত দিবস প্রখর আলোকে আনন্দে বিচরণ করিয়া সহসা অন্ধকার আগমনের আভাস বুঝিতে পারিয়া তাহারা যেন কিছু ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণ; বড়ই স্নিগ্ধ, বড়ই রমণীয়।

এই সময়ে অষ্টাবিংশবর্ষীয়া শশীপাগলী হরসুন্দরীর কুটিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। শশীর আকর্ণবিশ্রান্তনয়ন, অনিন্দ্যমুখশ্রী, ঈষৎ গোলাপীমিশ্রিতসমুজ্জ্বলগৌরবর্ণ এবং অন্যান্য অঙ্গের গঠনসৌষ্ঠব দর্শনে তাহাকে সামান্যা বা মনোবিকারগ্রস্তা স্ত্রীলোক বলিয়া বুঝা যায় না। কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর তাহার কথার অসামঞ্জস্য এবং হাসি, গান ইত্যাদিতে, পাগলামী প্রকাশ পাইত। ভাবুক লোক বলিত শশী পাগল নহে; পাগলামীর ভাণ করে মাত্র। তাহাদের বিবেচনায় শশীর প্রত্যেক কথায় এবং প্রত্যেক গানের নিগূঢ় ভাব আছে। শশীর অঙ্গে আভরণে[illegible] মাত্র নাই। একখানি মলিন বসন পরিধান করিয়াছে। কিন্তু [illegible] তাহার রূপের জ্যোতিঃ বিস্ফারিত হইতেছে।

শশী গাহিল—

আমারে পাগল বলে একা আমি নয়।
পাগলের পাগলামী হেরি জগন্ময়॥
সকলে আপন লয়ে, অঘোর উন্মত্ত হয়ে,
পাগল বলিয়ে সুধু আমারে দেখায়।
হায়রে! মায়ার খেলা হায় হায় হায়!॥

হরসুন্দরী ধ্যানতৎপরা। গানের এক বর্ণও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। কিন্তু শ্যামাসুন্দরী সে সুকণ্ঠের সঙ্গীত শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। কুটিরের বাহিরে আসিয়া পাগলিনীর রূপে মোহিত হইলেন।

পাগলিনী আবার গাহিল—

কেহ আপনারে ভাবে বুদ্ধি ধুরন্ধর,
কেহ বলে "আমি বড় নির্ম্মল অন্তর"।

ভ্রান্ত পাপী বুঝেনা ত,
ভাবে কেহ দেখেনা ত ?
তাই সে পাপের খেলা খেলে নিরন্তর।
পাগল—পাগলে ভরা এই চরাচর ॥

শ্যামা—

এ কি পাগলের কথা ! লোকে বলে শশিমুখী ঘোরপাগল। এ—ত—পাগলের কথা নহে ; পাগলের গান নহে। এ, যে, মহাজ্ঞানীর জ্ঞানের কথা ; যাহার হৃদয় নাই, বুঝিবার ক্ষমতা নাই, তাহার নিকটই শশী পাগলিনী। শ্যামাসুন্দরী ছুটিয়া গিয়া শশীমুখীর হাত ধরিয়া কহিলেন—ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি কে ভাই তুমি ? আমার মাথার দিব্য, তোমার প্রকৃত পরিচয় দাও।

পাগলিনী—

আমাকেত ভাই সকলেই জানে। কেন, তুমি কি শশী পাগলীকে জান না ? না—তাহার নাম শুন নাই ?

শ্যামা—

ভাই ! তোমাকে যে পাগল বলে, তাহার সাতপুরুষ পাগল। তোমাকে আমরা শশী পাগলী বলিয়া জানি বটে, কিন্তু আজ তোমাকে একটু একটু চিনিতে পারিতেছি।

দিদি ! যদি অনুগ্রহ করে দেখা দিয়েছ, তবে আর ছলনা করিও না।

শশিমুখী শ্যামার কাতরতা দর্শনে আর আত্মগোপন করিতে পারিলেন না। তখন তিনি দায়ুদখাঁর দুরভিসন্ধি, উমাশঙ্করের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের পরিচয় দিয়া শ্যামাকে সাবধানে থাকিবার উপদেশ দিতে লাগিলেন।

শ্যামা—

শশী দিদি ! যেরূপ চক্রান্তের কথা বলিলে, তাহাঁতে এই নির্জ্জন কুটিরে এই অসহায়া রমণীর জাতিকুল কি প্রকারে রক্ষা হইবে ?

শশী গান ধরিলেন—

রাজরাজেশ্বর পতি কর্ম্ম শূন্য নহে।
কত শত দলপতি তাঁর আজ্ঞা বহে॥
দেখিয়াছি কর্ম্মবীর শত শত জন।
এমন অদ্ভুতকর্ম্মা না দেখি কখন॥
না জানি বীরত্ব তাঁর আশ্চর্য্য কেমন ?
আভাস পেয়েছে সবে হেরে আয়োজন।
তাই তাঁর অসিতলে দলে দলে সেনা
দলবদ্ধ হইতেছে কে করে গণনা !
এক চক্ষে অশ্রু তাঁর অপরে বিজলী।
বীরব্রতে অগ্রগণ্যা প্রেমের পুতলী॥

গান শুনিয়া শ্যামাসুন্দরী আশ্বস্তা হইলেন। স্বামীর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা থাকায়, তিনি এতদিন সংশয় দোলায় দুলিতে ছিলেন। আজ শশীমুখী তাঁহার সে সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিলেন। তাঁহার স্বামী যে ভীরু ও কাপুরুষ নহেন, ইহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন; আর উমাশঙ্করের ন্যায় তিনি যে ঐশ্বর্য্যের কাঙ্গাল নহেন তাহাও জানিতেন; তবে বঙ্গাধিপের ন্যায় প্রবল শত্রুর সহিত প্রত্যক্ষভাবে বলের পরীক্ষা করিয়া, মান, সম্ভ্রম এবং জাতিকুল রক্ষা করিতে পারিবেন কি না, এই সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ সন্দেহ ছিল। আজ শশীর কৃপায় সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন।

শশিমুখী আবার গাহিলেন—

হৃদয়ে জিজ্ঞাসা কর পাইবে উত্তর।
কাপুরুষ নহে পতি সমরতৎপর ॥
নাহি ডরে শমনেরে সুবাদার ছার।
সময়ে দেখিতে পাবে পরাক্রম তাঁর ॥

এইবার শশিমুখী শ্যামাসুন্দরীকে সমস্ত বৃত্তান্ত পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলেন। শ্যামার পিতা রাজা রতিকান্ত রায়ের মোগলদিগের সহিত যোগ দান, পতি বীরেন্দ্রনারায়ণের কার্য্যতৎপরতা, বিজয়কুমারের সংযোগ প্রভৃতি একে একে বিবৃত করিলেন।

শশিমুখী আরও কহিলেন—ভাই! তোমরা ভাবিতেছ, যে অতি নিঃসহায় অবস্থায় আছ, কিন্তু তাহা নহে। তোমাদের প্রতি শত শত বলবান্ যোদ্ধার দৃষ্টি আছে। কাহার সাধ্য যে তোমাদের একগাছি কেশ স্পর্শ করে!

আর একটী কথা বলি এই যে, তোমার জননী একপ্রকার সমাধি-মগ্না। পিতাও পরম জ্ঞানী মহাপুরুষ। এ প্রকার মাতা পিতার সন্তানের কোন আশঙ্কা থাকিতে পারে না। আর তোমার স্বামীর কথা কি বলিব? কত পুণ্যে যে এমন স্বামী লাভ করিয়াছ, তাহা বলিতে পারি না। এমন বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনিকোমলানিচ দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন বীর, তেমনি প্রেমিক। আহা! যখন তোমার জন্য তাঁহার দুই চক্ষে শতধারা দেখি, তখন ভীরু বলিয়া সহসা ভ্রম হয়; আবার যখন অদ্ভুত কার্য্য-তৎপরতা, অদম্যসাহস এবং ক্লেশসহিষ্ণুতা দেখি, তখন মনে হয়, এ হৃদয়ে কোমলতার নাম গন্ধও বুঝি নাই।

তিনি সংগোপনে সর্ব্বদাই তোমাদের সংবাদ রাখিতেছেন। আজ প্রত্যক্ষ ভাবে আশ্বাস দিবার নিমিত্ত তোমার নিকট আমাকে পাঠাইয়া-

ছেন। সখি! তোমার জননীকে আমার প্রণাম জানাইবে। আমি বিদায় হইলাম। এই বলিয়া শশিমুখী মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্যা হইয়া গেলো।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তারাসুন্দরী।

তারাসুন্দরী দেবী ত্রয়োদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। বাঃ
যে বয়সে প্রবীণা এবং গৃহিণীবৎ হয়, বালিকা হইলেও তার
হইয়াছে। তাহার উপর আবার তাহার বিবাহ হইয়াছে। [illegible]
বাঙ্গালীর মেয়ে শৈশব হইতেই গম্ভীর ভাব ধারণ করে; কিন্তু তারা-
সুন্দরীর সেই উচ্ছৃঙ্খলতা, সেই আবদার, সেই ছুটাছুটি, সেই দৌড়া-
দৌড়ি। [illegible] ার অসন্তোষে দৃক্পাত নাই, মাতার নিষেধ গ্রাহ্য
নাই। [illegible] দেখিলে আজকাল একটু সঙ্কুচিতা হন। উমা-
শঙ্করে [illegible] দুর্দ্ধর্ষ, আকৃতিও সেই মত ভয়ঙ্কর। সে ভীষণ
মূর্ত্তি [illegible] সন্ত্রস্ত হইত। সে মূর্ত্তির নিকট বক্তার কথার
জড়ত [illegible] নের বুদ্ধিভ্রংশ হইত; শিশু আতঙ্কে চীৎকার করিয়া
উঠি [illegible] পাইত না তারাসুন্দরী।
[illegible] খিলে তারার আবদারের সীমা থাকিত না। একমাত্র
কন্য [illegible] র্ণ করিতে, উমাশঙ্কর বড় আনন্দ অনুভব করিতেন;
বি [illegible] ারার আর সে আবদার নাই। সেইজন্য কুটীর প্রকৃতি
উ [illegible] ন্দ কোকিল পিতাকে আর সে পূর্ণানন্দ প্রদান করিতে

পারে না। রায়গিণী ইহাতে বড়ই দুঃখিত। আর একজনের সাড়াশব্দ পাইলেও তারার এই চাঞ্চল্য স্থিরভাব ধারণ করে। সে বিজয়কুমার। প্রথম প্রথম বিজয় কুমারকে পাইয়া তারার আনন্দ উচ্ছ্বাস দেখে কে? লজ্জার নাম নাই, আনন্দের অবধি নাই। খেলিবার সাথীরা পর হইল; আপন হইল কেবল বিজয় কুমার; দাস দাসীর সহিত ঘনিষ্টতা রহিল না, নৈকট্য রহিল কেবল বিজয়ের সহিত।

বিজয় আহার করিতে বলিলে আহার করেন; শয়ন করিতে বলিলে শয়ন করেন; আর খেলাধুলা যাহা কিছু বিজয়ের সঙ্গে। বিজয়কুমারও এই মহৈশ্বর্য্যশালিনী বালিকা পত্নীর সুমধুর ভাব দেখিয়া [illegible] হইয়াছেন। বড় মানুষের একমাত্র আদরিণী কন্যা যে তাঁহার মত দরিদ্র স্বামীর এত অনুগতা হইবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তারাসুন্দরী এখন বিজয়কুমারের পোষা পাখী। বিজয় যাহা বলেন, তারা তাহাই করে। এইরূপই চলিয়া আসিতেছিল; সহসা পরিবর্ত্তন কেন হইল? স্বভাবচঞ্চলা তারাসুন্দরী বিজয়ের নিকট সে চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিলেন কেন? তারার চাঞ্চল্য একবারে যায় নাই বটে, কিন্তু পিতার নিকট যেমন আবদার গিয়াছে, পতির নিকটেও সেরূপ বালিকাভাব আর নাই। এখন পতির পরিতুষ্টির জন্য তাঁহাকে অনেক কার্য্য করিতে হয়। অনেকে বলে তারার প্রণয় পরিপক্ব হইয়া আসিতেছে; পাছে চাঞ্চল্য দেখিলে স্বামী বিরক্ত হন, সেই জন্য এই গাম্ভীর্য্যের ছলনা। সে যাহাই হউক, আমাদিগের বিবেচনায় উমাশঙ্করের ব্যবহারেই তারার এই পরিবর্ত্তন। স্নেহময় পিতার পরুষ প্রকৃতির ছায়া যতই তারার নয়নে প্রতিভাত হইতে থাকিল, ততই তাহার চাঞ্চল্যের হ্রাস হইতে লাগিল। যেন একখানি কাল মেঘ সেই হাস্যময়ী তড়িৎ-সুন্দরীর স্বচ্ছ হৃদয়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

বিশেষতঃ যে দিন হইতে শ্বশুর জামাতার কথোপকথন তারার কর্ণে প্রবেশ হইল, সেই দিন হইতে তারা আর সে তারা রহিলেন না; তবে অভ্যাসবশতঃ এবং সরলা জননী অন্তরে ক্লেশ না পান, এই জন্য মধ্যে মধ্যে একটু একটু চাঞ্চল্য দেখাইয়া থাকেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ী-যুগল।

বিজয়কুমার হরসুন্দরীর কুটিরে গমন করিয়াছেন। কাছারী বাটীতে বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন; তাঁহার গৃহিণী গৃহকার্য্যে তন্মনা।

বেলা শেষ হইতে চারি দণ্ড বাকী। তারাসুন্দরী একাকিনী আপন গৃহে উপবিষ্টা। বড় মানুষের দুহিতার সময় কাটাইবার নিমিত্ত যাহা যাহা প্রয়োজন, তারার তাহার কিছুরই অভাব নাই। অনেকক্ষণ একাকিনী থাকিয়া তারার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। পরিশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া অলঙ্কারের বাক্স বাহির করিয়া একে একে সমস্ত গুলিই পরিধান করিলেন। তাঁহার গহনাগুলির অধিকাংশই জড়োয়া, শুদ্ধ সুবর্ণের অলঙ্কার অতি অল্পই ছিল।

তারা সমস্ত অলঙ্কারের সহিত এক খানি কারু কার্য্য খচিত বেনারসী শাটী পরিলেন। একটী জড়োয়া পেশওয়াজে বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া দিলেন। সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা তারা এইবার এক খানি দর্পণের নিকট,

পারে নাইয়া একবার আপনার পরিহিত অলঙ্কার রাশি, একবার বেনারসী শাড়ীখানি, একবার মণিমুক্তাখচিত পেশওয়াজটী এবং একবার নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। কিছুই ভাল লাগিতেছে না। এক এক করিয়া প্রত্যেক অলঙ্কার পরীক্ষা করিলেন। এইবার দুই তিন খানি অলঙ্কার বড় মনোরম বোধ হইল। সেই কয়েক খানি রাখিয়া আর সকল গুলি খুলিয়া ফেলিলেন।

ঐ কয়খানি বিজয়কুমারের পিতৃপ্রদত্ত অলঙ্কার। তারাসুন্দরী যাহা করিতেছেন, তাহা করিতে থাকুন; আমরা এই অবসরে পাঠককে তাঁহার রূপ লাবণ্যের পরিচয় দিয়া লই।

ত্রয়োদশবর্ষীয়া তারার রূপের কথা কি বলিব? গোলাপ, চম্পক বেণু, বীণা ইত্যাদি যাহা কিছু বলিব, তাহাতে তাঁহার একটী অঙ্গেরও পূর্ণ বর্ণনা হইবে না। সুতরাং বলিতে হইতেছে যে, বিধাতা বুঝি যাবতীয় উৎকৃষ্ট পদার্থ একত্র করিয়া তারাসুন্দরীর অঙ্গের গঠন সমাধা করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমরকৃষ্ণকেশদাম, বেণুবিনিন্দিতনাসিকা, মৃগলাঞ্ছিতনয়ন, শারদকৌমুদীমাখাবর্ণ, সুবর্ণচম্পকবৎঅঙ্গুলীসমূহ, মৃণালসমভুজযুগল, নবনীতের ন্যায় দেহখানি ইত্যাদি ইত্যাদি বলিলে যেন সে কমনীয় লাবণ্যের কিছুই বলা হয় না। ফলতঃ সে রূপ অতুল্য, অনুপম। একবার দেখিলে আর নয়ন ফিরাইতে পারা যায় না। সে আভাময়ী, মোহময়ী রূপবিভায় শুদ্ধ নয়ন কেন, প্রাণ মন আকৃষ্ট হইয়া যায়। আহা! কি ঢল ঢল রূপ-চ্ছটা, কি সুধাময় মধুময় লাবণ্যের ঘটা, আবার তাহারই সঙ্গে সরলতা, মধুরতার মধুর ভাব প্রকাশিত, অঙ্গে অঙ্গে স্বর্গীয় প্রভা প্রবাহিত। ঐ দেখ বিদ্যুদ্দাম বিস্ফারিত রূপের আভা স্বচ্ছদর্পণে প্রতিভাত হইয়া গৃহ আলোকিত করিয়াছে।

পাঠক! এ, সে, নেত্রঝলোকর রূপরাশি নহে, যাহার তীব্র জ্যোতিতে

নয়ন ঝলসিয়া উঠে ; হাবভাব লাবণ্যে হৃদয় কলুষিত হয় ; অবশেষে ঘৃণার ভাব আসিয়া সেই অশ্রদ্ধেয় রূপরাশিতে বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেয়।

তারাসুন্দরী দর্পণের নিকট গিয়া, বিজয়ের পিতৃপ্রদত্ত অলঙ্কারগুলি মাত্র রাখিয়া আর সমস্ত খুলিয়া ফেলিয়াছেন। এইবার বেনারসী ও পেসওয়াজ খুলিয়া একখানি সামান্য শাটী পরিধান করিলেন। এতক্ষণে যেন কিছু শান্তি পাইলেন। শান্তি অধিকক্ষণ থাকিল না। আবার অস্থিরতা বাড়িয়া উঠিল। তিনি পিতার ইচ্ছাক্রমে গুরুমহাশয়ের নিকট কিতাবতি বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়াছিলেন ; কিন্তু ত বিদ্যায় প্রকৃত শিক্ষা হইত না ; কেবল সামান্যভাবে পত্রাদি ও লেখাপড়ার কার্য্য চলিত। উমাশঙ্কর সেইজন্য উৎকৃষ্ট অধ্যাপ করিয়া তারাসুন্দরীর সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া কাব্য অলঙ্কারে এক প্রকার ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া ছিলেন। এমন কি সামান্য সামান্য শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। অধ্যাপকের প্রযত্নে গীতা এবং ভাগবতে তারার হৃদয় আকৃষ্ট হয়। এই গীতা ভাগবত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তারাসুন্দরীর ভাবতরঙ্গের আলোড়ন আরম্ভ হইল। লোকে মনে করিল বয়োবৃদ্ধির সহিত তারার বাল্য ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে ; কিন্তু বিজ্ঞান বিমিশ্রিত গীতারত্ন পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে ভাবের লহরী উঠিতেছে, ইহা কেহই মনে করে নাই। তাঁহার সুশিক্ষিত এবং সুযোগ্য স্বামী বিজয়কুমারও তারার এ ভাব বুঝিতে পারেন নাই। যাহা হউক তারা পুস্তকাধার হইতে একখানি সংস্কৃত পুঁথি বাহির করিয়া পড়িতে বসিলেন। ভাল লাগিল না। পুস্তক বন্ধ করিলেন। বিরক্তি উচ্চ মাত্রায় উঠিল। দাসীদিগকে অকারণ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। স্বর সপ্তমে উঠিল ; শেষে কাঁদিয়া ফেলিলেন। মাতা ছুটিয়া আসিলেন ; কিন্তু তারার বিরক্তির কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না। তারাও কিছু

বলিতে পারিলেন না। তিনি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও কন্যাকে শান্ত করিতে সমর্থা হইলেন না। অদূরে পদধ্বনি হইল। বিজয়কুমার গৃহে প্রবেশ করিলেন। মাতাও নিশ্চিন্ত হইয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—•—

যুদ্ধসজ্জা।

বিজয়কুমারকে গৃহপ্রবেশ করিতে দেখিয়া তারার ক্রোধের আবেগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। ভাবিলেন—এইবার নাকালের এক,শেষ করিব। এই মনে করিয়া মানিনী, শাণিতমানঅস্ত্রে সজ্জীভূতা হইয়া চঞ্চল চরণে গৃহে আগমন করিলেন।

অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বুরঃ,
দম্পত্যাঃ কলহাশ্চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

এই সুরসাল কবিতাংশ যে নিতান্ত সুরসিক এবং ভুক্তভোগীর রচনা, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তারাসুন্দরী এই ঘোরতর রণসজ্জায় সজ্জিতা হইয়াও যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারিলেন না।

বিজয়কুমার গৃহের প্রায় নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময় তারার চরণ চুম্বিত রজতালঙ্কারের অস্বাভাবিক ঝন্ ঝন্ ঝঁন্ ঝনৎকার শব্দ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান্ হইলেন। তারা বিজয়ের সহিত বিবাদ করিতেন না বটে, কিন্তু অন্যের উপর রাগ করিলে, এইরূপ শব্দ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেন।

তারাসুন্দরী

বিজয়কুমার দায়মালের আসামীর মত ...

কথা কহিবেনা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ; সুতরাং কোন্ কথা কহিলেন না। এতক্ষণ যাহাকে দেখিতে না পাইয়া, জগৎ সংসার শূন্য জ্ঞান করিতেছিলেন, বিরক্তি বিষাদের তুফান উঠাইতে ছিলেন, সম্মুখ সংগ্রামে সম্মুখে পাইয়াও তাঁহার প্রতি কোন অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন না। কেমন করিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন ? তারা বিপক্ষ হইলেও তাঁহার হৃদয় বিপক্ষ হইতে চাহে না। সে মুহূর্ত্ত মধ্যে ঝগড়া বিবাদের একটা মীমাংসা করিতে চাহে। সে বলিতেছে—'প্রাণেশ্বর ! আমার সর্ব্বস্বধন ! আমি কি তোমার সহিত বিবাদ করিতে পারি ? আমি কি তোমার সহিত কথা না কহিয়া থাকিতে পারি ? তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব।"

বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারা কি হইয়াছে ? মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই, অথচ এত তরঙ্গ কিসের" ? তারা কথা কহিবেন না সঙ্কল্প করিয়াছেন ; কিন্তু হাসিও চাপিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। প্রথমে মৃদু, পরে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। সে হাসিতে বিজলী খেলিতে লাগিল। বিজয়কুমার আত্মহারা। বিজয় আর থাকিতে পারিলেন না ; দুই করে তারাসুন্দরীকে বেষ্টন করিয়া, সেই মেঘমুক্ত সুধাংশু বদনে বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। Marvellous কাজটা সুরুচিসঙ্গত হইল কি না, বলিতে পারি না ; তবে প্রকৃত যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা গোপন করিবার অধিকার আমাদের নাই ; এইজন্য প্রকাশ করিতে হইল।

বিজয়কুমার মনে করিতেছেন—... কি পুণ্য করিয়াছি, যে এমন নিরুপমা সুন্দরী বক্ষেঃ ধারণ করিব ? এমন কি সুকৃতি সঞ্চয় আছে, যাহাতে এ অমূল্য রত্ন কণ্ঠে করিতে পারি ? শারদ পূর্ণিমার শশধরেত এত শোভা হয় না ; মুক্তাবি... এত সুষমা বিস্তার করে না ; আমার ...

বল তারা! কি জন্য আজি তোমার এত অভিমান, এত বিরক্তি আহা তারা! যদি তুমি বালিকা না হইতে, তাহা হইলে বুঝিতে, যে আমি কিরূপ পাষাণে বুক বাঁধিয়া অসহ্য যাতনা সহ্য করিতেছি। তোমাকে লইয়া ভবিষ্যৎ সুখের আশায় আমি দুঃখযাতনার নিদারুণ প্রহার পৃষ্ঠ পাতিয়া লইতেছি। আমার বল বুদ্ধি ভরসা সকলই তুমি। এই বলিয়া—বিজয়কুমার সাদরে তারাসুন্দরীর কর ধারণ করিয়া ছল ছল নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এইবার তারার মুখ ফুটিল। প্রিয়পতির হৃদয় মধ্যে যে একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে, তাহা তারা বালিকা হইয়াও বুঝিতে পারিয়াছেন। তারা বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী এবং স্বামীগতপ্রাণা; তাঁহার ক্ষুদ্রপ্রাণ স্বামী হৃদয়ে মিশিয়া যাইতেছে; সুতরাং স্বামীর সুখ দুঃখ বুঝিবার শক্তি তাঁহার না হইবে কেন?

প্রাণীহৃদয়ের এই আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বিদ্যা বুদ্ধির বিচারে কোন মীমাংসা হয় না; বিজ্ঞানে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। অথচ ইহার ফল অতি প্রত্যক্ষ। প্রাণাধিক পুত্র সাংঘাতিক পীড়ায় বিদেশে বিঘোরে প্রাণ হারাইতেছে; এখানে জননীর হৃদয়ে যাতনার তুফান বহিতেছে; শরীরে সুখ নাই, প্রাণে শান্তি নাই; অন্তরের অন্তর তল চিন্তার আগুণে পুড়িয়া যাইতেছে। তার বিহীন বৈদ্যুতিক শক্তির অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে মাতার হৃদয়ে এই সংবাদ বহনের কার্য্য হইয়া থাকে।

পতি, পুত্র, পিতা, মাতা আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি প্রিয়জনের হৃদয়েও পূর্ব্বোক্ত শক্তি ঐরূপে কার্য্য করে। এই আত্মাগত আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে তারাসুন্দরী পতির বিষাদভাবের সূচনা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বুদ্ধিমতী তারা বুঝিতে পারিয়াও, সময় ও সুযোগের অভাবে

মনের কথা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। আজি করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

তারা কহিলেন—তোমার হৃদয়ে যাহা উদয় হইয়াছে, এবং যাহার জন্য তুমি ক্লেশ পাইতেছ, তাহা আমি বুঝিয়াছি। বালিকা বলিয়া উপেক্ষা করিও না। আমাকে বল। উহাতে এই হইবে, যে তোমার হৃদয়ের দুঃসহ ক্লেশের ভার, আমরা দুইজনে বিভাগ করিয়া লইতে পারিব। তাহাতে তোমার ক্লেশের কিছু লাঘব হইবে।

বিজয়—

আমি এত নরাধম নহি, যে তোমার ন্যায় গুণবতী পত্নীকে, দুঃখের বোঝার ভাগ দিয়া পীড়িতা করিব, আর নিজের ভার লাঘব করিব। ইহা নিতান্ত স্বার্থপরতার কার্য্য তারা!

তারা—

এমন কথা বলিও না। আমি যদি দুঃখের ভাগ না লইতে পারি, তবে পত্নী হইবার অযোগ্যা। স্বামীর সুখ দুঃখে সমভাগিনী হওয়াই পত্নীর একমাত্র কার্য্য। তাহাতে অতুল সুখ। সে সুখে আমাকে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছ কেন?

বিজয়—

যে দুঃখ ক্লেশে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত, তাহার অংশভাগী তোমাকে করিতে চাহি না। তাহাতে তুমি অন্তরে বড়ই বেদনা অনুভব করিবে।

তারা—

প্রিয়তম! আমার যখন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, তখন আমার নিকট গোপন চেষ্টা বৃথা; বিশেষতঃ তোমার হৃদয়ের ক্লেশ হইলে যখন আমার হৃদয়ে বেদনা, অবশ্যই হইবে, তখন আমাকে অন্ধকারে রাখিলে কোন উপকারের প্রত্যাশা নাই।

বিজয়—

তারা! আমি অনেক দিন হইতে তোমাকে আমার এই বিষাদের কথা বলিয়া নিজের ভাব লাঘব করিব মনে করিতেছি, আর তুমি বালিকা হইলেও বিদ্যা বুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণদর্শিতা গুণে, এ রহস্য শ্রবণ করিবার যোগ্য পাত্র তাহাও বুঝিয়াছি; কিন্তু—

তারা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন—প্রিয়তম! বহুদিন হইতে তোমার ভাব নিরীক্ষণ করিয়া আমি এক প্রকার বুঝিয়াছি; তবে আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার নিমিত্ত এতক্ষণ চেষ্টা করিতেছিলাম। যাহা হউক আমার পূজনীয় পিতৃদেবই যে ইহার হেতু, তাহাতে সন্দেহ নাই। পিতা আমার দুরাকাঙ্ক্ষার প্রলোভনে উন্মত্ত হইয়া, কি সর্ব্বনাশই করিতে বসিয়াছেন! তিনি এখন ভোগবিলাসের পূর্ণ-অবতার বঙ্গাধিপের হাতের পুতুল। নরাধম [illegible] যে দিকে খেলাইতেছে, তিনি সেই দিকেই খেলিতেছেন। [illegible] যখন দেবচরিত্র ঋষিকল্প রতিকান্ত রায়ের সর্ব্বনাশ সাধনে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, তখনই বুঝিয়াছি যে তাঁহার পতন অনিবার্য। তিনি যখন সর্ব্বগুণে গুণাকর এবং আমার সর্ব্বস্বধন জানিয়াও তোমার ন্যায় জামাতার সুপরামর্শ শ্রবণ করেন নাই, অধিকন্তু তোমাকে অপমানিত করিয়াছেন, তখনই বুঝিয়াছি, যে তিনি হৃদয়শূন্য হইয়াছেন। তিনি যখন রতিকান্ত রায়ের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও নিরস্ত হন নাই, আবার তাঁহার কন্যার জাতিকুল নষ্ট করিবার চেষ্টায় আছেন, তখনই বুঝিয়াছি যে আমাদের রসাতলে যাইবার পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছে।

কতবার ভাবিয়াছি চরণে ধরিয়া, পিতাকে নরকের পথ হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করি, কিন্তু সাহস হয় না।

যে পিতার কোমল ক্রোড়ে গিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতাম, প্রাণশীতল হইত, সেই পূজ্যপাদ পিতার মুখেরদিকে চাহিতে এখন ভ

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মৃগয়া।

যোদ্ধৃগণ রাজমহলের পথে ছুটিলেন। এই পথের উভয় পার্শ্ব নিবিড় অরণ্যে আচ্ছাদিত। সেই শ্বাপদসঙ্কুল বনপথে যাতায়াত করিতে হইলে, বিশেষ বল সংগ্রহের আবশ্যক। অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত এবং দলবদ্ধ না হইলে, এ পথে যাইবার উপায় নাই। কিন্তু বীরেন্দ্রনারায়ণ ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। ভয়ের স্থানে তাঁহার উল্লাস দৃষ্ট হইত। তাঁহার এবং তাঁহার পার্শ্বদগণের কটিবিলম্বিত কৃপাণের ঝনঝনা এবং অশ্বপদশব্দে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাজপথ নির্জ্জন, বনভূমি নীরব নিস্তব্ধ। একটী মৃগ অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া রাজপথে দাঁড়াইল; মুহূর্ত্তে বীরেন্দ্রের শর ধনুকে যোজিত হইল; হরিণ কাতর নেত্রে ধনুকধারীর প্রতি চাহিয়া রহিল। শর ছুটিল না; ধনুকে সংযোজিত হইয়াই রহিল; পরক্ষণেই প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র হরিণের অভিমুখে ধাবিত হইল; হরিণ আর একবার বীরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অপর পার্শ্বের ঘোর বনে প্রবেশ করিল। এইবার বীরেন্দ্রের বাণ ছুটিল; হরিণের প্রতি নহে—মৃগলোলুপ ব্যাঘ্রহৃদয়ে অব্যর্থ বাণ আমূল বিদ্ধ হইল। বনমধ্যে নাকাড়া এবং বংশীরব শ্রুত হইল। কিসের শব্দ? ক্রমশঃ অশ্ব, গজ, সিপাহী এবং আসবাব পূর্ণ শিবির সকল দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। বঙ্গাধিপ শিকারে বাহির হইয়াছেন। কৌতূহলের বোঝা মাথায় লইয়া বীরেন্দ্র বনে প্রবেশ করিলেন। উদ্দেশ্য, বলবীর্য্যহীন বঙ্গাধিপের বিক্রম পরিদর্শন।

বীরেন্দ্র, অনুচরগণসহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কেহ নিবারণ করিল না; ত্বরিতগামী অশ্ব ছুটিতে ছুটিতে ঘোর বনে প্রবিষ্ট হইল। জনমান-

বের সমাগম নাই, পশুপক্ষীর শব্দ নাই। ঘনঘোর পাদপচ্ছায়ায় আলোক-সঞ্চার অবরুদ্ধ হইয়াছে। এই নিবিড় অন্ধকারময়ী বনভূমি কি বিলাসীর আনন্দ নিকেতন? না। সে ভোগবিলাসের কৃতদাস কাপুরুষের এ স্থান নহে। সে মদিরামত্ত, বিলাসিনীর ক্রোড়গত নবাব, কেলিকাননের অতুল সুখ উপভোগে ব্যাকুল। সে, কি, এই হিংস্রজন্তুসমাকুল ঘোর বনে পশু শিকার ক্লেশ সহ্য করিতে পারে? খেয়ালের বশে শিকারে আসিয়াছে, খেয়াল ছুটিলেই চলিয়া যাইবে। ও কি? ও, কে, আসিতেছে? মণি মুক্তা খচিত রাজবেশ খসিয়া পড়িতেছে; আরোহীর চেতনা আছে কিম্বা নাই। অশ্বের মুখে ফেনা নির্গত হইতেছে; অশ্বারূঢ় ব্যক্তির গাত্রে ঘর্ম্মের স্রোত বহিতেছে। বঙ্গাধিপ? এ আবার কি? প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র! ধরিল, ধরিল, বঙ্গাধিপের সব ফুরাইল। অত্যাচারীর অত্যাচারলীলা এইবার শেষ হইল; ধনী নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইবে; সতী নিরাপদে পতিপদ সেবা করিবে; ধার্ম্মিক ধর্ম্মচর্য্যা করিয়া, পরম সুখলাভ করিবে; হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা হইবে। এ কি, বীরেন্দ্র এ কি করিলে? ব্যাঘ্রের জীবন বিনষ্ট করিলে? তোমার ঐ অব্যর্থ শাণিত শর ব্যাঘ্রের পরিবর্ত্তে বঙ্গাধিপের বুকে বিদ্ধ করিলে না কেন? তুমি রাজার তনয়, রাজবংশে তোমার উদ্ভব। অতএব পাপীর পাপজীবন বিনষ্ট করিয়া প্রজা রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম। আজি তাহার অন্যথা করিলে কেন?

ব্যাঘ্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শাণিত শরে বিদ্ধ হইয়া তাহার জীবনের চিহ্ন মাত্র নাই। এদিকে বঙ্গাধিপও অচেতন। ব্যাঘ্রভয়ে ভীত সুবাদার আক্রমণের পূর্ব্বেই চৈতন্য হারাইয়াছেন। ধন্য তাঁহার সাহস ধন্য তাঁহার বিক্রম! এই ঘোর বিক্রমের প্রভাবেই তিনি মধ্যে মধ্যে বাদসাহের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হন। বর্ম্মাবৃত বীর অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, বঙ্গাধিপের চৈতন্য সম্পাদনে ব্যস্ত হইলেন। অনেকক্ষণ

শুশ্রূষার পর নবাবের জ্ঞানসঞ্চার হইল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন— সম্মুখে প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র পতিত রহিয়াছে। তখন শিকারবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত আন্দোলন করিতে করিতে, সকল কথা মনে পড়িল। মনে মনে লজ্জিত হইলেন। প্রকাশ্যে পরিত্রাণকারীকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র-নারায়ণ নবাবের চৈতন্য হইল দেখিয়া, নিজ অশ্বে আরোহণ করিলেন; বলিলেন—বিলাসী নবাব! মিত্রতার ভাণ করিতে চাহি না। আমরা তোমার মিত্র নহি। তবে যে ব্যাঘ্র হইতে তোমাকে রক্ষা করিলাম, ইহার কারণ, এই যে, এক দিন নিজ হস্তে তোমাকে বধ করিয়া শত্রুতার পরিশোধ লইব। তোমাকে অদ্য এই অসহায় অবস্থায় অনায়াসে বধ করিতে পারিতাম; কিন্তু হিন্দু সে প্রকার অধার্ম্মিক নহে। বীরেন্দ্র সে প্রকার কাপুরুষ নহে। বীরেন্দ্রের অশ্ব অদৃশ্য হইল। আর নবাব—হতবুদ্ধি হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অপহরণ।

শ্যামাসুন্দরী অপহৃতা হইয়াছে। হরসুন্দরীর কঠোর সাধনা, বিজয়ের যথাসাধ্য চেষ্টা, রতিকান্ত রায়ের প্রখর দৃষ্টি, কিছুতেই শ্যামার রক্ষা হইল না। উমাকান্তের কুটজাল, সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া, অভীষ্ট সাধন করিয়াছে। এমনি কৌশলে, এমনি সন্তর্পণে কার্য্য সাধিত হইয়াছে, যে কেহ বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারে নাই। ঘোর অন্ধকার রজনীতে, নিদ্রিতা শ্যামাসুন্দরীকে সুখাসনে শায়িত করিয়া নিস্তব্ধ বাহকগণ এমনি সাবধানে

লইয়া গিয়াছে যে গন্তব্য স্থানে পঁহুছিবার পূর্ব্বে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। সঙ্গে এক দল সেনা; রহমৎ খাঁ সেনাপতি।

প্রহরী বর্গের পরিচর্য্যা এবং রহমৎখাঁর আদর অভ্যর্থনার কোন ক্রটী হয় নাই। এ সকল উমাশঙ্কর অতি গোপনে সম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু তারার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। পিতার ভাব গতিক দেখিয়া তারা বুঝিয়াছিলেন যে, শ্যামার সর্ব্বনাশ সাধন জন্য আজিকার ষড়যন্ত্র। সে দিবস বিজয়কুমার হরসুন্দরীর কুটীরে গিয়াছিলেন। স্বামীর প্রতীক্ষায় তারাসুন্দরী যূথবিরহিত কুরঙ্গীর ন্যায় পথপানে চাহিয়া আছেন। বিজয় আসিলেন; যুক্তি হইল; মীমাংসা এই হইল যে, অদ্যই জীবন ও গৌরীকে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। জীবনের অনুগত বহুসংখ্যক লোক শ্যামার উদ্ধারে প্রাণ দিতে কাতর হইবে না। কিন্তু এপক্ষেরও সাজ সজ্জা সামান্য নহে। একদল শিক্ষিত সৈন্য টাণ্ডা হইতে প্রেরিত হইয়াছে। যুক্তি, কার্য্যে পরিণত হইল। জীবন সমস্তই অবগত হইল। প্রভুভক্ত জীবন এ সংবাদে ভীত হইল না। কিন্তু বড়ই চিন্তিত হইল। সময় অতি অল্প। রজনীর এক প্রহর অতীত হইয়াছে; সম্ভবতঃ পিশাচগণ দুই প্রহরের মধ্যে [illegible] দেশ ও উত্তেজনা দ্বারা লোক সকলকে বাহির করিতে [illegible]। জীবনের চিন্তার শেষ নাই।

জীবন মনুষ্যের যাহা সাধ্য তাহা করিয়াছে। রাত্রি দুই প্রহরের মধ্যে হরসুন্দরীর আবাসভূমি অসংখ্য লোকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। সকলেই সশস্ত্র; লাঠিয়ালের সংখ্যাই অধিক। সে লাঠির সম্মুখে শেল, শূল বর্শা, অসি কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। জীবন ইহা ভিন্ন আরও একটী সুবুদ্ধির কার্য্য করিয়াছে। রাজা রতিকান্ত রায় যে স্থানে সুশিক্ষিত সৈন্য প্রস্তুত করিতেছেন, বীরেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি যে স্থানে সেনাপতিত্ব গ্রহণ

করিয়া দারুণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন, জীবন সেস্থানেও এ সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে; রতিকান্ত রায় একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন; সেনাপতি বীরেন্দ্র নারায়ণ। শ্যামার আর আশঙ্কা নাই। যাহারা মৃত্যুভয় করে না তাহাদের নিকট যবনের বেতনভুক বিলাসী সৈন্য কতক্ষণ যুদ্ধ করিবে? কিন্তু অষ্টবজ্র একত্র হইবার কিছু পূর্ব্বে পৈশাচিক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। শ্যামাসুন্দরীকে অপহরণ করিয়া, সুবাদারসৈন্য টাণ্ডা অভিমুখে চলিয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

সিরাজুল্ নিশা।

শ্যামাসুন্দরী টাণ্ডায় আনীতা হইয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার তেজঃ, দর্প এবং স্বর্গীয় জ্যোতিঃদর্শনে দায়ুদখাঁ [illegible] সাহস ক[illegible] আ[illegible]জেও শ্যামাকে আয়ত্ত করিতে পারিবে ভাবিয়া, মনে মনে আকাশকুসুমের কল্পনা করিতেছিল; [illegible]পবর্ত বুঝিয়া হতাশ হইল। তথাচ একবারে হাল ছাড়িল না। মনে করিল কিছুদিন গত হইলে, এই উগ্রভাব প্রশমিত হইয়া যাইবে। এই ভাবিয়া—সিরাজুবেগমের নিকট তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিল। প্রথম দর্শনেই শ্যামার প্রতি সিরাজুর হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছে। শ্যামা তাঁহার কে? শ্যামার উদ্ধার জন্য তাঁহার এত চেষ্টা কেন? শ্যামার জাতি, কুল রক্ষার জন্য চেষ্টা করিলে, তাঁহাকে পিতৃকোপানলে পড়িতে হইবে ইহা জানিয়াও তিনি শ্যামার প্রতি এত অনুরাগিনী কেন?

শ্যামা হিন্দু, তিনি মুসলমান ; শ্যামা একজন জমিদারের দুহিতা, আর তিনি, বঙ্গ বিহার, উড়িষ্যার সর্ব্বেশ্বরের তনয়া ; তাঁহার সখীস্থান অধিকার করিবার তাহার অবস্থা নহে। ইহা ভিন্ন শ্যামার পিতা রতিকান্ত রায় বঙ্গাধিপকে বঙ্গের মসনদ হইতে অপসারিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, ইহাও সিরাজুর অজ্ঞাত নহে। যাহাহউক আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই শ্যামা সিরাজুর সৌহার্দ্দ সম্বন্ধীয় কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি নাই। তবে ইহার মধ্যে যে একটা অজ্ঞাত এবং অতি নিগূঢ় রহস্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে নিগূঢ় রহস্য কি ? সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনকারের মতে, ইহা পূর্ব্বজন্মজাত প্রিয় সম্বন্ধ সে যাহাই হউক, শ্যামা এই ঘোর বিপত্তির সময়ে সিরাজুর ন্যায় মহোপকারিণী মহিলার আশ্রয়লাভ করিয়া, অপার বালুকারাশি পরিপূর্ণ মরুভূমি মধ্যে, ওয়েসিস্ দেখিলে পথিক যেরূপ আশ্বস্ত হয়, নিদাঘের প্রচণ্ড উত্তাপতাপিত তৃষ্ণাতুর, জল পাইলে যেরূপ পরিতৃপ্ত হয়, কাণ্ডারীবিহীন তরণী কূলে আসিলে আরোহী যেরূপ প্রাণের আশায় আনন্দিত হয় ; এই জাতিমানসংকটাকুল যবন [illegible]বাতে সিরাজুকে পাইয়া শ্যামা সেই প্রকার আশ্বস্তা হইয়াছেন। সিরাজুর [illegible] এবং আদর [illegible] শেষ নাই ; কিন্তু শ্যামার যেন একটু সংকোচ ভাব। উপকারিণীর এই অযাচিত মহোপকারে কৃতজ্ঞতাপরিপূর্ণা শ্যামাসুন্দরী সিরাজুকে দেখিলে কি [illegible] কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন না।

মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে। সূর্য্যদেব পূর্ণ প্রতাপে প্রখর কর জাল বিস্তার করিয়া যেন একটু বিশ্রামের নিমিত্ত, মধ্য গগনে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন ; আমীর ওমরা হইতে, দীন দুঃখী প্রভৃতি সকলেই যথাসাধ্য ক্ষুধা নিবারণ করিয়া বিশ্রামসুখ সেবা করিতেছে ; পশু পক্ষী পর্য্যন্ত এসময়ে পরিশ্রম বিমুখ হইয়াছে।

শ্যামাসুন্দরী এখনও পর্য্যন্ত জলবিন্দু স্পর্শ করেন নাই। চিন্তামগ্না শ্যাম যতক্ষণ সিরাজুর নিকট থাকেন, ততক্ষণ ভাল থাকেন; সিরাজু চলিয়া গেলে, অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্না হন; আহার, নিদ্রা মনে থাকে না। তিনি টাণ্ডা নগরে আগমনাবধি অন্ন আহার করেন নাই। সিরাজুর নিতান্ত নির্ব্বন্ধে কয়েক দিন ফল মূলাদি আহার করিয়াছেন। সখী শ্যামাসুন্দরি! এরূপ করিলে এ শীর্ণ দেহ কত দিন থাকিবে? আমি ব্রাহ্মণ পাচিকা এবং হিন্দু পরিচারিকা দ্বারা তোমার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি; লক্ষ্মণাবতী হইতে ভাগীরথীর জল আনয়ন করাইয়াছি; তথাপি তুমি অন্ন জল স্পর্শ করিতেছ না কেন?" বলিয়া—সিরাজু শ্যামার হস্ত ধারণ করিয়া, সাদর অনুযোগ করিতে লাগিলেন। শ্যামা লজ্জিতা হইয়া কহিলেন—নবাবনন্দিনি! তোমার দয়া অসীম। আমি তোমার ঋণ এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না।

সিরাজু—

তাই বুঝি অন্ন জল স্পর্শ না করিয়া আমার মনে ব্যথা দিতেছ?

শ্যামা—

নবাবনন্দিনি! তুমি জান না। তোমার নিকটে থাকিলে চিন্তা ভুলিয়া যাই; কিন্তু তোমার অনুপস্থিতিতে ঘোর দুশ্চিন্তা আসিয়া আমাকে আহার নিদ্রা ভুলাইয়া দেয়।

"আমি এখনি আহার করিতেছি;" বলিয়া—শ্যামা আহার উদ্দেশে চলিলেন। সিরাজু আবার শ্যামার কর ধারণ করিয়া কহিলেন—সখি! আর একটী অনুরোধ রাখিবে? আমায় নবাবনন্দিনী না বলিয়া, সখী বলিয়া সম্বোধন করিবে? তাহাতে আমি বড় আনন্দ পাইব। শ্যামা বলিলেন,—"করিব"।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পাগলিনী পুনর্ব্বার।

টাওয়ার পরিখা বেষ্টিত, প্রাচীর বেষ্টিত এবং শত শত প্রহরী বেষ্টিত রাজপুরীতে পাগলিনী মধুর কণ্ঠে গান গাহিতে গাহিতে বেগম মহল অভিমুখে যাইতেছে।

কি করিয়া এ দুর্গম পুরী প্রবেশ করিলে পাগলিনি! কি অদ্ভুত ক্ষমতা বলে, শতশত রক্ষকের চক্ষে ধূলী নিক্ষেপ করিয়াছ? তোমার কল-নিনাদিনী মধুর ধ্বনি শুনিয়া কি কাহারও চৈতন্য ছিল না? অথবা সদাগতি তুমি, তোমার গতি প্রতিরোধ করে কাহার সাধ্য? যাহা হউক তুমি মনুষ্যজীবনের উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছ। লোকসাধারণকে অন্ধকারে রাখিবার উদ্দেশে পাগলের ভাণ করিতেছ।

পাগলিনী গাহিল—

ওহে পশুপতি, কর অনুমতি যাব হিমালয়।
জননী তাপিনী বড় নাদেখি আমায়।
গত নিশি আসি, শিয়রেতে বসি,
আঁখিনীরে ভাসি, স্বপনে জননী কয়।
(মায়ের) আলু থালু কেশ, ছিন্নভিন্ন বেশ,
যে দুঃখ অশেষ সে কথা কহিব কায়॥
(কেবল) উমাউমা বাণী শিরে কর হানি,
কহেন জননী, কেনমা এমনি কঠিনা হায়?
(মাগো) মায়ে ফাঁকি দিয়ে, নিদয়া হইয়ে,
থাকিলে ভুলিয়ে জননীর কি প্রাণে সয়?

মহলে মহলে সে গীতের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। সে স্বরলহরী সুবাদারের অন্তঃপুরের প্রত্যেক বেগমের হৃদয়তন্ত্রী ভেদ করিয়া করুণরসের তরঙ্গ তুলিয়া দিল। পাগলিনীর সেই স্বর ঊর্দ্ধ আকাশ ভেদ করিয়া, দ্বিতল, ত্রিতলের সৌধরাজি কাঁপাইয়া, নবাবজাদীর গৃহে প্রবেশ করিল। নবাবকুমারী সিরাজুল্‌নিসা নিজপ্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া, শ্যামাসুন্দরীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, সহসা পাগলিনীর মধুরস্বর তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। সে স্বর শ্যামাসুন্দরীর অপরিচিত নহে। শ্যামা অচেতনা। সিরাজুর যত্নে শ্যামার চৈতন্য হইল বটে; কিন্তু সে চৈতন্য না হইলে ভাল হইত। পাগলিনীর প্রাণাকর্ষণী, মাতৃপ্রেমের মধুর গানে জননীর প্রেমমূর্ত্তি মনে পড়িল। অমনি দর দর ধারায় শ্যামার দুই চক্ষে বারিধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

"নবাবনন্দিনি! একবার পাগলিনীকে ডাকিয়া পাঠাও, আমি দুঃখিনী জননীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিব।" বলিয়া—শ্যামাসুন্দরী সিরাজুকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সিরাজুবিবি তৎক্ষণাৎ পরিচারিকাকে, পাগলিনীকে আনয়ন করিতে অনুমতি করিলেন।

পাগলিনী গাহিতে গাহিতে সিরাজুর গৃহে আগমন করিল।

ঐ তোমার আসিছে গৌরী গিরিরাণি দেখ চেয়ে।
বিদ্যুৎবরণী উমা ঈশান আলো করিয়ে॥
সজল নয়নে উমা,
কেবল বলে মা, মা, মা,
আঁখিজলে চন্দ্রবদন যেতেছে ভাসিয়ে।
(সে যে) পাগলিনী প্রায় এসে,
আলু থালু কেশ পাশে,
কইমা কইমা বলি আসিতেছে ধেয়ে।

গুহ গজানন ডাকে,
ত্রৈলোক্যতারিণী মাকে,
মাযের মায়ায় মেয়ে না চাহে ফিবিয়ে।

শ্যামার নয়নে আর জল ধবেনা। কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জ্জন কবিয়া মা, মা, বলিয়া, শ্যামা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। নবাবনন্দিনীব নযন সজল। পাগলিনী, নবাবজাদিকে কুর্ণিস করিয়া নীববে দণ্ডায়মান্ হইল। সিরাজ্‌লন্‌সা অবনত মস্তকে সে কুর্ণিস প্রতিদান করিয়া কহিলেন—শশীমুখি! তুমি সুকণ্ঠি; তোমার সঙ্গীত মনোহব।

শশী—

নবাবনন্দিনি! পাগলের আবাব কণ্ঠ, তাহার আবার গান। খেয়ালে যাহা মুখে হয় বলিয়া যায়।

সিবাজু—

শশীমুখি! আমি যদি তোমাকে না জানিতাম এবং না চিনিতাম, তবে যা, তা, বলিয়া আমাকে বুঝাইতে পারিতে; তোমাকে যাহাবা পাগল বলে, তাহারাই পাগল। তুমি ধর্ম্ম-পথের অনেক উচ্চে আরোহণ কবিয়াছ। স্বার্থত্যাগ করিয়াছ? অথচ পরহিতে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছ। ইহা অপেক্ষা উচ্চতা লাভেব আর কি উপায় আছে? তুমি উচ্চাদপি উচ্চ হইয়া পাগলিনী সাজিয়াছ। পাগল বলিবাই এত উচ্চ হইয়াছ।

শশী—

নবাবনন্দিনি! ঐশ্বর্য্যেব সহিত ধর্ম্মেব বড়ই বিরুদ্ধ সম্বন্ধ বলিয়া, আমাব চিরদিনই ধাবণা ছিল; কিন্তু আজ আমার সে ধারণা দূর হইল। দেখিতেছি—অগ্নি এবং জলেব একত্র সমাবেশ হইয়াছে; অথচ কেহ কাহাকে দহন বা শোষণ কবে না। আমরা নির্লিপ্ত হইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছি; প্রলোভন হইতে দূরে পালায়ন করিতেছি; কিন্তু তুমি

রাজরাজেশ্বরের দুহিতা হইয়াছ, ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিতা হইয়াছ এব ঐশ্বর্য্য মধ্যে বসিয়া আছ; অথচ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছ ও ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য অধগত হইয়াছ। ইহাতে বোধ হয় তুমি শাপভ্রষ্টা দেবী। দেবী বলিযাই তোমার এত দয়া, দেবী বলিযাই সতীত্ব রক্ষাভিলাবিণী কুলবতীর সতীত্বরক্ষা ব্রতধারণ করিযাছ। আমি যাহাই হই, তোমার দর্শনে ধন্য হইলাম। শ্যামাসুন্দরীর বড় শুভাদৃষ্ট তাই, নরকের পথে অবতরণ করিতে করিতে, তোমার ন্যায় দেবীরূপিণী হিতৈষিণী সখীরত্ন লাভ করিয়া ন। আমার উদেশ্য সুসিদ্ধ এবং আগমন সফল হইয়াছে। শ্যামাসুন্দরীকে বিপদ্-মুক্তা দেখিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারিব।

সিবাজু —

শশীমুখি! যত দিন পর্য্যন্ত শ্যামার উদ্ধার সাধন না হয়, তত্দিনের জন্য তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিও। শ্যামার একটী কেশও কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

যদি শ্যামাসুন্দরী বিলাসবাসনাপরায়ণা হইত, তাহা হইলে আমি উহার কোন সাহায্যই করিতাম না। কিন্তু শ্যামা রূপবতী, গুণবতী এবং ধর্ম্মশীলা। এ স্বর্গীয় প্রতিমা পাপের অনলে দগ্ধ হইবে? না। কখনই না। শশীমুখী এপ্রস্তাব আর না গাহিয়া থাকিতে পারিল না।

মানবী কি দেবী এই নবাব ভবনে।
মানবী কখন নহে এই লয় মনে॥
বিদ্যা ... বালা, ফুটিছে কিরণ মালা,
আহা মরি হেন শোভা দেখি নাহি নয়নে॥

সিবাজু হাসিতে হাসিতে গৃহান্তরে গমন করিলেন। তখন শশীমুখী শ্যামার নিকট আসিয়া অপহরণ বৃত্তান্ত সবিস্তার শ্রবণ করিলেন। শ্যামার নিকট

সকল কথা শুনিয়া, শশী বীরেন্দ্রের বীরত্ব সূচক প্রতিজ্ঞা, রায় মহাশয়ের অদ্ভুত ধীরতা, জীবন ও গৌরীর মুক্তি, শ্যামার রক্ষায় জীবনের প্রাণান্তচেষ্টা, বিজয় এবং তারার হিতৈষীতা ইত্যাদি, একে একে বর্ণনা করিলেন। কেবল হরসুন্দরীর কোন কথা বলিলেন না। শ্যামার উদ্বেগের সীমা নাই। "বল [illegible] আমার কেমন আছেন? মা আমার এই দারুণ দুর্দ্দশায় [illegible]হইত?" বলিয়া—শ্যামা কাঁদিতে লাগিলেন।

[illegible] আঘাত করে পার্থিব বিষয়ের এমন ক্ষমতা নাই, তিনি সেইমত সমাধিমগ্না আছেন। মধ্যে মধ্যে এক এক বার যোগ ভঙ্গ হয়, কিন্তু চাঞ্চল্যের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্যামা—

দিদি এক্ষণে উপায়?

শশী—

কেন নবাবনন্দিনী যখন সহায়, তখন তোমার চিন্তার বিষয় কি আছে?

শ্যামা—

কি বুঝিলে?

শশী—

দিদি! দেবতাকে চিনিতে কতক্ষণ লাগে? চিনিয়াছি; সিরাজুল্‌নিসা মানবীরূপিণী দেবী।

আরও শুন বলিয়া, গাহিল—

তোমার বীরেন্দ্র বীর সত্য পরায়ণ।
উদ্ধার প্রতিজ্ঞা তাঁর হইয়াছে পণ।
যে প্রতিজ্ঞা সেই কাজ, কি আর বলিব আজ,

দেখিবে প্রতিজ্ঞা যবে হইবে পূরণ।
একাকী সাধিবে এই অসাধ্য সাধন।

আবার গাহিল—

চর রূপে চর্চ্চা করি যবনের পুরী
পথ ঘাট দেখি তাই তন্ন তন্ন করি।
তাই পাগলিনী সাজে,
ভ্রমি এ নগর মাঝে;
একাকী আসিবে হেথা বিক্রম কেশরী।

শশিমুখী শ্যামাসুন্দরীর উদ্ধারসাধনের জন্য বীরেন্দ্রনারায়ণ অতি সত্বর আসিবেন, এই সম্বাদ প্রদান করিয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন। আসিবার সময় অন্যান্য বেগমদিগের দর্শনলালসা সম্বরণ করিতে না পারিয়া, গাহিতে গাহিতে জিহানা বেগমের মহল উদ্দেশে গমন করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

জিহানা বেগম।

শশিমুখী গাহিলেন—

চিরদিন না রহিবে জীবন যৌবন।
নিশির স্বপন মত করিবে গমন॥

তবে কেন বৃথা সই,
পরাণে যাতনা সই,
কাঞ্চন ত্যজিয়ে কেন কাচে দেই মন।
আপনি তুনিয়া চলে নাহি অন্য জন॥
দাঁড়ী মাঝী নাহি আর,
ফিরাইতে কর্ণধার,
কার লাগি আত্মসুখ করি বিসর্জ্জন?

গীতপ্রিয়া জিহানা পাগলিনীর গান শুনিয়া, প্রকোষ্ঠ বাহিরে আসিয়া বলিয়া উঠিলেন—

মনের মতন কথা কহে পাগলিনী।
এ কভু পাগল নহে, নহে ভিখারিণী॥
ভেঙ্গেছে সুখের আশা,
তাই গো এমন দশা,
আপনি আপনা হারা হয়েছে দুঃখিনী॥

পশি আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন; কিন্তু গর্ব্বিতা জিহানা সিরাজুর ন্যায় কুর্ণিশ প্রতিদান করিলেন না।

জিহানা পরমা সুন্দরী। এখনও অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করেন নাই। পূর্ব্বে সেনপুরের জমীদার কমলনারায়ণ মজুমদারের গৃহিণী ছিলে বঙ্গাধিপ এই অপূর্ব্ব সুন্দরীকে আনয়ন করিয়া মুসলমান ধর্ম্মানুস বিবাহ করিয়াছেন। কমলনারায়ণ আর একখানি তালুকের তালুকদ স্বত্ব পাইয়া পরম আনন্দপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

বঙ্গাধিপ জিহানাকে রত্নালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, প্রধানা বেগমের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জিহানা যাহা চাহেন, তাহাই পাইয়াছেন। চাহেন সুখ, অবিচ্ছিন্ন সুখ; চাহেন বিলাসিতা—বিলাসিতার সা

ডুবিয়া থাকিতে। পাইয়াছেনও তাহাই। ঘোরবিলাসী নবাবের অনুগ্রহে বিলাস-সমুদ্রে জিহানা বেগম ডুবিয়াছেন; গীত, বাদ্য মদিরায় উন্মত্তা আছেন।

পাগলিনী আবার গাহিল—

বিফলে জীবন গেল পূরিল না বাসনা।
সকলি হইল শেষ, অবশেষ যাতনা।
বিড়ম্বনা বিফলতা সকলি রহিল গাঁথা।
এসেছিনু কিবা কাজে কি করিনু সাধনা।

জিহানা কহিলেন—পাগলিনি! তুমি কি প্রকৃত পা আশাভঙ্গে বিষাদসাগরে মগ্না হইয়া এইরূপ হইয়াছ?

পাগলিনী—

আশাভঙ্গ মনোভঙ্গ খেলা দুনিয়ায়।
কে কোথায় পায় বল যে যাহারে চায়?
তবে সে সৌভাগ্য তার,
সফলতা ঘটে যার,
সুখের সাগরে তরী সেই সে ভাসায়।

জিহানা—

আহা পাগলিনি! তোমার গানগুলি বড় মধুর, আমার মনের মতন।

পাগলিনী—

কত না সুরভি ফুল ফুটে বৃক্ষ ডালে।
কেহ বা শুকায়ে [illegible] কেহ পড়ে তলে॥
কেহ বা সুকৃতি বলে,
মালা হয়ে দোলে গলে,
কেহ বা সাদরে যায় আরাধনা স্থলে।

তুমি সেই ভাগ্যগুণে,
বসিয়াছ সিংহাসনে,
বঙ্গাধিপ কৃপা মাগে তব পদতলে॥

গানের মর্ম্মার্থ জিহানার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল। জিহানার আনন্দের সীমা নাই। আনন্দে অধীরা হইয়া জিহানা বেগম একটী মোহর লইয়া পাগলিনীর সম্মুখে ধারণ করিলেন।

পাগলিনী মোহর দেখিয়া কম্পিতকলেবরে কহিল—বেগম সাহেবা! অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি মোহর লইতে পারিব না। আমি পাগলিনী, আমার অর্থের প্রয়োজন কি? জিহানা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—পাগলিনি! তোমার অর্থের আকাঙ্ক্ষা নাই দেখিয়া বড় খুসি হইলাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

তুলনায় সমালোচনা।

পাঠক! আমরা ইতিপূর্ব্বে নবাবনন্দিনী সিরাজুন্নিশার রূপলাবণ্যের কোন্ আভাস দিই নাই। তাহা না দিয়া সে সুরসুন্দরীর লাবণ্যের যে কোন হানি করিয়াছি, এমন বোধ হয় না। সে আত্মগোপনাভিলাষিণীর স্নিগ্ধ এবং সলজ্জ মূর্ত্তি, লোকনয়নের অন্তরালে রাখাই ভাল। কিন্তু আত্মপ্রকাশলোলুপা হাবভাবকটাক্ষশালিনী জিহানার রূপচ্ছবি উজ্জ্বল আলোকে না দেখাই কিরূপে? যে প্রকাশ হইতে চাহে, যে আপনার উজ্জ্বল জ্যোতিতে অন্যের মন ভুলাইতে চাহে, তাহাকে না দেখাইব কেন?

জিহানা পুষ্প হিরাবতী নামে বাঙ্গালার একটি সুদূর নির্জ্জন পল্লীতে ফুটিয়াছিল; ফুটিয়াছিল বটে; কিন্তু সে প্রাণমাতান, মনভুলান ফুলে মোহিত হয়, এমন কেহ সেখানে ছিল না। কুমুদ, কহ্লার, শতদল, গোলাপ প্রভৃতি ফুটিয়া ফুটিয়া সৌরভ বিস্তার করে, কেহ আদর করুক না করুক আপনি ঝরিয়া পড়ে। জিহানা সে পুষ্প নহে। সে ফুটিয়া ফুটিয়া শুকাইতে চাহে না; জগৎ মাতাইতে চাহে। সে চাহে ভাব মাতাইতে; সে আদর, সোহাগ, যত্ন চাহে; আর চাহে প্রশংসা। তাহাই হইল। জিহানার প্রবল বাসনা, তাহার করিয়াছে। সে আর নির্জ্জনে নাই। বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সে শ্রেষ্ঠাদপি শ্রেষ্ঠ: বঙ্গ সিংহাসন তাহার পদতলে। আর পরদুঃখকাতরা ব্রীড়াবিনতা সিরাজু? সিরাজু ফুটিতে চাহে না; ছুটাইতে ইচ্ছা করে না; তাহার ফুটন্তভাব কেহ দেখিলে সে মুদ্রিত করে। আগরার বাদসাহ জাদা সিরাজুর সৌরভে বিবাহ করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন; সিরাজু রাজি সিরাজু বড় লাজুক; আবার যেমন লাজুক, তেমনি আত্মব বেশ ভূষা ভাল বাসে না।

আমরা এই উভয় ললনার একটু তুলনায় সমালোচনা করিয়া, পাঠকের নিকট ধারণ করিব। উভয় ললনার তুলনায়, সিরাজু নিরাভরণা, শুক্লবসনা সতী; আর জিহানা হাবভাবলাবণ্যশালিনী মণিকাঞ্চনখচিতা বারবিলাসিনী। একটীতে মৃদুতা, মধুরতা; অপরটীতে চটুলতা, চমৎকারীতা; একটীর বিষণ্ণতা, মলিনতা; অপরটীর প্রখরতা, প্রফুল্লতা; ...ম্মাচিত সুমধুর সলজ্জভাব; অপরটীর সর্ব্বাঙ্গ প্রকাশ; ...ত সুমধুর সুরভি কুসুম; অপরটী যত্নপোষিত লীলায়িত ... একজনের ভাবুকতা প্রেমিকতা এবং ভক্তির মাধুর্য্য;

অপরের চটুলতা, চঞ্চলতা এবং রসিকতার একশেষ। একজনের শান্তি-দায়িনী মধুর মূর্ত্তি দর্শনে, চঞ্চলের চাঞ্চল্য দূর হয়; আর একজনের হাবভাব-লাবণ্যে প্রবীণের চাঞ্চল্য হয়; একজনের অমানুষ রূপলাবণ্যের ভাবলহরী ছুটিতেছে; ভক্তির ফোয়ারা ফুটিতেছে; অপরের লাবণ্যলীলার উজ্জ্বল চিত্র কেবল লালসার বৃদ্ধি করিতেছে; একটীর জ্যোতিঃ মুগ্ধকর, স্নিগ্ধকর দেখিলে বার বার দেখিতে ইচ্ছা হয়; অন্যের অতি সৌন্দর্য্যে নয়ন ঝল-সিয়া উঠে, দেখিলে আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু দেখিতে পারা যায় না। একটী শীতরশ্মি শশধর; অপরটী প্রখর জ্যোতিঃ তরিড়্জোনের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড; একটী জলদনিষ্কাশিত কৌমুদী; অপরটী নেত্রজ্বালাকর সৌদামিনী; একটী অর্দ্ধস্ফুরিত রূপের আভা, অপরটী বিদ্যুদ্দাম বিস্ফারিত লাবণ্য রাশি; একজনের মৃদুমধুর মিষ্টরস; অপরের অম্লমধুবিমিশ্রিত কটু-তিক্তময় রস। সিরাজু বিলাসিতাবিবর্জ্জিতা পবিত্রভূষণা দেবী; আর জিহান সুচারু কারুকার্য্যখচিত কৃত্রিম কাচমূর্ত্তি।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

— * —

উদ্ধার।

কৃষ্ণপক্ষীয় রজনী, ঘনঘোর অন্ধকারময়। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। রাত্রি যত অধিক হইতেছে, অন্ধকারের মাত্রা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। একখানি কাল মেঘ বাঘমতী নদীর উপরে উঠিয়া টাণ্ডা নগরী আবৃত করিয়া ফেলিল। এতক্ষণ যাহা কিছু দেখা যাইতেছিল,

এইবার সব ঢাকিয়া গেল। মেঘমণ্ডিত টাণ্ডাকে আর মেঘ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় রহিল না। থাকিয়া থাকিয়া এক একবার বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দ। এই নিবিড় অন্ধকার রজনীতে এক ব্যক্তি বাঘমতীর তীর বাহিয়া চলিয়াছে।

পথিক রাত্রিকালে রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া নদীতীর ধরিয়া আসিতেছে কেন? উহার কি প্রাণের ভয় নাই? বাঘমতী বাহিয়া টাণ্ডার মধ্যস্থানে নবাববাটীর সম্মুখে পাতে আসিয়া সে নদীতী ... উঠিল। ক্রমে রাজপথ ধরিয়া পরিখার নিকট দাঁড়াইল। সেতুর তোরণদ্বারে চাহিয়া দেখিল,—সেতুর উপর উজ্জ্বল জ্বলিতেছে আর বন ঘন পাহারার বন্দোবস্ত আছে। এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া পথিক সেস্থান ত্যাগ করিল। আরও হটিয়া আসিল। পরে ধীরে ধীরে পরিখার জলে অবতরণ পথিক সন্তরণ দিতে দিতে, পরপারের কোন্ স্থানে উঠিবে লাগিল। কিন্তু স্থান আর নির্ণয় হয় না। সে পারের আ পাহারার শৃঙ্খলা দেখিয়া, সে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল। তত্রাচ একবারে হতাশ না হইয়া, সন্তরণ দিয়া পরপারে উপনীত হইল। অজ্ঞাত লোক দেখিয়া সিপাহী হুঙ্কার করিয়া উঠিল। আগন্তুক ত্বরিতপদে জল হইতে উঠিয়া সিপাহীর মুখ চাপিয়া ধরিল এবং অঙ্গবস্ত্র হইতে একটী কৌটা বাহির করিয়া, তাহা হইতে একটু চূর্ণ পদার্থ লইয়া, সিপাহীর নাসিকায় আঘ্রাণ করাইল। প্রহরী অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। পথিক তাহার সহিত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া সিপাহীবেশ ধারণ করিল। এইবার সশস্ত্রসিপাহীবেশে নবাববাটী প্রবেশ করিবার নিমিত্ত লাগিল।

যে সকল প্রহরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাদিগকে

বলিল—"নবাবনন্দিনী তলব করিয়াছেন।" দয়াশীলা নবাবনন্দিনী অত্যাচারগ্রস্তা বন্দীরমণীগণের সাহায্যার্থ রাত্রিকালে কখন কখন সিপাহী-দিগকে তলব করিতেন; সেই জন্য সকলেই তাহার কথায় বিশ্বাস করিল।

অসমসাহসী পথিক এইরূপে প্রহরীবর্গের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া, বঙ্গাধিপের দৌলতখানায় প্রবেশ করিল। এইবার ঘন ঘন প্রহরী। সকলেরই নিকট একই কথা—"নবাবজাদীর তলব"।

দ্বার অবারিত। কিন্তু কোন্ গৃহে নবাবনন্দিনী অবস্থিতি করেন, স্থির করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। এইবার বুদ্ধির আশ্রয় লইতে হইল। সে দেখিল অধিকাংশ গৃহ সমুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত এবং গীতবাদ্যে মুখরিত। সুসজ্জিত দাস দাসী ছুটাছুটি করিতেছে; আনন্দের লহরী খেলিতেছে; হাস্যের তরঙ্গ উঠিয়াছে। কেবল একটী গৃহের বাতায়ন অর্দ্ধোন্মোচিত। সে গৃহে আলোকের ঔজ্জ্বল্য নাই; তান, লয়, স্বরের নাম গন্ধ নাই; দ্বারদেশে দাস দাসীর ও কোন সাড়া শব্দ নাই। ইহাই নবাব-নন্দিনীর গৃহ মনে করিয়া, পথিক নিঃসঙ্কোচে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সিরাজু শ্যামার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, সহসা সিপাহীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সামান্য সিপাহীর এত সাহস! এত গোস্তাকি! সিরাজুর বিস্ময়ের শেষ নাই। সিপাহী বিনীতস্বরে কহিল—"বাদসাহজাদি! গোলামের গোস্তাকি মাপ করিতে আজ্ঞা হয়। নফর নিতান্ত অনুপায় হইয়া এই অন্যায় কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছে।" সিরাজু সিপাহীর কথার মাধুর্য্য শুনিয়া এবং মুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, যে আগন্তুক সামান্য সিপাহী নহে। এই সময়ে শ্যামাসুন্দরী অবগুণ্ঠনে আবৃতা হইয়া, সিরাজুর পার্শ্বে আসিয়া বলিতে লাগিলেন—নবাবনন্দিনি ক্ষমা—'সিপাহী

আমার—আর বলিতে পারিলেন না। বুদ্ধিমতী সিরাজু বুঝিলেন, আগন্তুক আর কেহ নহে, শ্যামাসুন্দরীর স্বামী, বীর বীরেন্দ্র নারায়ণ। তখন ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন—এ গৃহে যখন সখী শ্যামাসুন্দরীর সম্পূর্ণ অধিকার, তখন ক্ষমা করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না; বরং আপনার সহিত অভদ্র ব্যবহার জন্য আমিই ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। বীরেন্দ্র কহিলেন—নবাবনন্দিনি! তোমার দয়া এবং উপকারে আমরা চিরজীবন আবদ্ধ থাকিব। শশিমুখী যাহা বলিয়াছে, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। তুমি মানবী নহ; দেবী। সিরাজু কহিলেন—কুমার আপনার বীরত্বের কথা শুনিয়াছি; আজ সাহস দেখিয়া হইলাম। আপনি আমার পিতার জীবন রক্ষা করিয়া, আম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমি যত কিছু করি ত উপকারের পরিশোধ হইবে না।

এই বলিয়া, সিরাজু বীরেন্দ্র নারায়ণকে বসিবার আসন প্রদান করিলেন।

বীরেন্দ্র—

নবাবনন্দিনি! এক্ষণে শ্যামার উদ্ধারের উপায় কি? আমি শুদ্ধ তোমার কৃপার প্রতি নির্ভর করিয়া একাকী আগমন করিয়াছি।

সিরাজু—

কুমার! আমি আপনার পত্নীর সখী; আমাকে সখী বলিয়া সম্বোধন করিলে বড় সুখ পাইব। আর শ্যামার উদ্ধারের জন্য কিছুমাত্র চিন্তার কারণ নাই। আমি এই মুহূর্ত্তেই তাহার উপায় করিয়া দিতেছি।

সিরাজুলনিসা বিশ্বাসী ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া, বাহক, অশ্বের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন। বীরেন্দ্রকে

কহিলেন—আপনি এই সিপাহীবেশেই অশ্বারোহণে বাহকদিগের পশ্চাতে গমন করিবেন; আর আমি উপযুক্ত রক্ষী সেনারও ব্যবস্থা করিতেছি। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন,—"কেশবপুরে উমাশঙ্কর রায়ের বাটী যাইতেছি।" তাহা হইলে আর কেহ কোন প্রকার সন্দেহ করিবে না। সুখাসনে আমার কোন সহচরী যাইতেছে, এই কথা রাষ্ট্র করিয়া দিব; আপনিও এই কথার প্রতিধ্বনি করিবেন। আপনাকে বঙ্গাধিপের সিপাহী বলিয়া সকলেই বুঝিবে; অতএব কোন বিষয়ে কোন গোলযোগ হইবে না। নবাবনন্দিনীর আদেশ অনুসারে সমস্ত প্রস্তুত হইল। কুমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে নবাবনন্দিনীকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। শ্যামাসুন্দরী আকুলক্রন্দনে সিরাজের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া রহিলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী পিঞ্জর ছাড়িতে চাহিতেছে না; স্বাধীনা বন্দিনীর কারাগৃহ ছাড়িবার ইচ্ছা হইতেছে না; সিরাজের এমনি মোহিনী শক্তি!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পিতা পুত্রী।

দরবার গৃহে অপমানিত হইবার পর হইতে, দায়ুদ খাঁ মনের শান্তি হারাইয়াছেন। সেই দিন হইতেই যেন ভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতি অপ্রসন্না; পদে পদে আশাভঙ্গ, পদে পদে লাঞ্ছনা। তিনি বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে, দেশের প্রধান প্রধান প্রজাগণের মধ্যে একটা ঘোর ষড়যন্ত্র

চলিতেছে। সেদিনকার শিকার যাত্রায়, বীরেন্দ্রনারায়ণের তেজোগর্ভ বাক্যেই তাহার আভাস পাইয়াছেন। এদিকে মোগল বাদসাহের প্রাধান্যও তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং এই ঘোর বিপদসঙ্কুল অবস্থায় বিলাসী দায়ুদ খাঁ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন। কিসে এ ব্যাকুলতার শান্তি হইবে? জিহানা ভিন্ন এ দুর্দ্দিনে আর কোন ঔষধি নাই। উৎফুল্ল এবং আশাপূর্ণহৃদয়ে, দায়ুদ জিহানার মহলে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অন্তরের অনল নির্ব্বাপিত হইল না; শান্তি পাইলেন না; সহানুভূতি মিলিল না; সুপরামর্শ শুনিতে পাইলেন না। এ সকল কি হৃদয়হীনা বিলাসিনীর নিকট পাইবার সম্ভাবনা আছে? যাহার বিবেক নাই, বিশু কেবল বিষয় বাসনা জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ধূ ধূ জ্বলিতেছে, তাঃ শান্তি পাইবেন কিরূপে? চিন্তাবিমলিন বঙ্গাধিপ এই অশান্তি নিমিত্ত বিলাসসাগরে ডুবিয়া দেখিয়াছেন, অশান্তি নিবারণ ক্ষণকালের জন্য নিবৃত্তি হইয়াছে মাত্র। ঘৃণা ও বিরক্তির সহি প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিলেন। তোষামোদকারিগণ নিকট সাহসী হইল না। আর স্থান নাই। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা দায়ুদখাঁ আজি প্রকৃত বন্ধু খুঁজিয়া পাইতেছেন না। বঙ্গাধিপ! তুমি চক্ষুঃ থাকিতে অন্ধ; তাই প্রকৃত বন্ধু চিনিতে পারিতেছ না; তুমি বাসনার প্রবল স্রোতে আত্ম সমর্পণ করিয়া, তীরবেগে ভাসিয়া যাইতেছ; এই প্রবল স্রোতোবেগ হইতে যদি কেহ ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে, তবে তাহাকেই প্রকৃত বন্ধু বলিয়া জানিবে। যাহারা তোমাকে মনে মনে ঘৃণা করে, তাহারা তোমাকে তুলিবে না; বরং দূর হইতে তোমার অধঃপতন দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইবে। তাহারা তোমার মিত্র নহে। ...াকে ভালবাসে বলিয়া ভাণ করে, তাহারাও তোমাকে ...ননা তাহাতে তাহাদের স্বার্থের হানি হইবে। তাহারাও

তোমার বন্ধু নহে। তবে কি এ সংসারে তোমার কেহ মিত্র নাই? তোমার পাপতাপদগ্ধহৃদয়ে সান্ত্বনা দিবার কি কেহ নাই? আছে; একটী মাত্র বালিকা, তোমার এই অপরিহার্য্য অধঃপতনে, নীরবে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতেছে; আর নতজানু হইয়া, ভগবানের নিকট তোমার পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করিতেছে। সে, কে, বুঝিতে পারিয়াছ কি? তোমার আপন দুহিতা সিরাজু। সেই অভিন্নদেবীকন্যারত্নকে তুমি চিনিতে পার নাই। তুমি অসংখ্য মণিরত্নের ক্রেতা হইয়া, কাচ কাঞ্চনের প্রভেদ বুঝিতে অক্ষম; নতুবা সেই স্বর্গীয়াপ্রভাশালিনী দিব্য-দ্যুতি তনয়াকে শত্রু বিবেচনা করিবে কেন?

আজ একবার পিতৃস্নেহপরিপূর্ণ হৃদয়ে, সেই পিতৃভক্তিপরায়ণা কন্যার নিকট যাও; দেখিবে—সেই স্বার্থশূন্যা দেবী তোমার জন্য, প্রাণ দিতে কাতরা নহে। আর জুড়াইবার স্থান নাই দেখিয়া, দায়ুদ সিরাজুর গৃহের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। প্রাণসমাতনয়া, যাহার প্রাণভুলান হাস্যরাশি-সমন্বিতমুখশশধর সন্দর্শন করিয়া, কতদিন কত দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছেন, আজ এই দুর্দ্দমনীয় দুঃখের বোঝা মাথায় করিয়া, সেই প্রাণাধিকা দুহিতার নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন—সিরাজুল্‌নিশা নতজানু এবং ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া, ভগবানের আরাধনায় নিযুক্তা আছেন। দুই চক্ষে অবিরল ধারা নির্গত হইতেছে। এ পবিত্র দৃশ্য বহু দিবস দায়ুদের নয়নে পতিত হয় নাই; পাপসংস্পর্শে এবং পাপিনীগণের সংসর্গে, তিনি ভগবানের পবিত্র নাম এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছেন। আজি তনয়ার এই স্বর্গীয় শোভা দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে পুণ্যালোকের পবিত্র আভা প্রবেশ করিল। বঙ্গাধিপের হৃদয়ে ঘোর তুফান। দায়ুদ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া অনিমিষ লোচনে, কন্যার এই স্বর্গীয়জ্যোতিঃবিস্ফারিত রূপরাশি দর্শন করিতে লাগিলেন।

সিরাজুর আবাধনা সমাপ্ত হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন—স্নেহময় পিতা বাহু প্রসারণ কবিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান্। তখন দুই হস্তে পিতাব কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া, ক্রোড়ে মুখ লুকাইলেন। দায়ুদও আবেগভরে কন্যারত্নকে বক্ষে ধাবণ কবিলেন। উভয়েরই দুই চক্ষে অবিরল ধাবা নির্গত হইতে লাগিল। আহা কি সুন্দব স্বর্গীয় শোভা! কি অনুপম সুখ! পবিত্র বাৎসল্যবসেব সুখসংমিলনে দায়ুদ আজ যে সুখ পাইয়াছেন, বহুদিবস এমন সুখ পান নাই।

পাঠক! এই পবিত্র সুখসংমিলনে একবাব দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। এ পবিত্র সুখসংমিলনে স্বার্থপবতাব সন্নিবেশ নাই; আকাঙ্ক্ষা আবেগ নাই; কেবল পবিত্রতা, পবার্থপবতা।

Marvellous

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণাগৃহ।

বঙ্গাধিপ মন্ত্রণাগৃহে উপবিষ্ট হইয়া অধীন পাঠান জায়গিরদারগণকে আহ্বান করিলেন। এই জায়গিবদাবগণেব মধ্যে দুই চারিজন যে হিন্দু না ছিলেন, এমন নহে। সকলেই বঙ্গেশ্বরেব বৃত্তিভোগী ও অনুগত। মন্ত্রণাগৃহের অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, বাদসাহের হুকুমনামা অগ্রাহ্য করিতে হইবে, মোগল-প্রাধান্য স্বীকাব করা হইবে না; বিদ্রোহী প্রজাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে; প্রাণান্ত পণ করিয়া মোগল বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইবে; এবং যুদ্ধ যাত্রার উপযোগী সেনাবল বৃদ্ধি ও যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করা হইবে।

সভার কার্য্য শেষ হইলে উমাশঙ্কর রায়চৌধুরীর তলব হইল। উমাশঙ্কর কুর্ণিস করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, দাযুদখাঁ কঠোর স্বরে কহিলেন—উমাশঙ্কর! তোমার প্রত্যেক কার্য্যেই রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ কি?

উমাশঙ্কর কম্পিত কলেবরে কহিলেন—"জাহাপনা! গোলামের প্রতি অন্যায় সন্দেহ হইতেছে। নফর চিরদিনই রাজভক্ত; বঙ্গেশ্বরের কার্য্যে শির দিতে গোলাম কুণ্ঠিত নহে।" দাযুদ গম্ভীর স্বরে কহিলেন—কাফের! তোমার রসনা যেরূপ মিষ্ট, হৃদয় সেরূপ নহে। উমাশঙ্কর ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না। বঙ্গাধিপ বলিলেন—দেখ উমাশঙ্কর! এ পর্য্যন্ত তুমি মিথ্যা প্ররোচনা দ্বারা আমার নিকট হইতে স্বকার্য্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছ। তুমি বলিয়াছ—"শ্যামাসুন্দরী আমার প্রতি অনুরক্তা;" কিন্তু সে আমার অঙ্কলক্ষ্মী হইবার পরিবর্ত্তে প্রাণ পরিত্যাগ শ্রেয়ঃজ্ঞান করিয়াছিল। তুমি বুঝাইয়াছ যে, শ্যামার স্বামী বীরেন্দ্রনারায়ণ মূর্খ, বর্ব্বর এবং কাপুরুষ, কিন্তু সে অগণ্য প্রহরীবেষ্টিত টাণ্ডানগরে প্রবেশ করিয়া, একাকী শ্যামাসুন্দরীকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং সে দিবস শিকারের সময় প্রচণ্ড ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

এ সকল কি কাপুরুষ এবং ভীরুর কার্য্য? আর শুনিলাম—তোমার তারাসুন্দরীনাম্নী পরমাসুন্দরী দুহিতা আছে; সে শ্যামাসুন্দরী অপেক্ষা রূপবতী। কিন্তু একথাও তুমি আমার নিকট গোপন করিয়া, তাহার বিবাহ দিয়াছ। উমাশঙ্কর বিনীতভাবে কহিলেন—'জাহাপনা! আমার কন্যা বালিকা।" দাযুদ কহিলেন—হইতে পারে যে, সে, বালিকা, কিন্তু হিন্দু মুসলমানের কোন শাস্ত্রেই বালিকা বিবাহের নিষেধ নাই। তুমি আমাকে কন্যা প্রদান করিলে, আমি উপযুক্ত জায়গির দিয়া তোমাকে প্রধান ওমরাহ পদে প্রতিষ্ঠিত করিতাম, আর তোমার কন্যাও সুন্দরী হইলে বঙ্গের সিংহাসনে

বসিতে পারিত। যাহা হউক আমি আদেশ করিতেছি, যে অদ্য হইতে একমাস সময়ের মধ্যে তোমার কন্যাকে সম্মত করিয়া আমার সহিত বিবাহ দিবে। নতুবা সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তোমাকে কারাগৃহে আবদ্ধ করিব। তোমার প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিতাম; কিন্তু তুমি ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সবকারা অনেকগুলি হিতকর কার্য্য করিয়াছ; সেইজন্য প্রাণদণ্ড রহিত করিলাম। একমাস সময় যথেষ্ট; ইহার মধ্যে তুমি অনায়াসে কন্যার সম্মতি করাইতে পারিবে। আমি আমার ধর্ম্মশীলা কন্যা সিবাজুর নিকট স্বীকার করিয়াছি যে, আর কখন স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিব না। সেই জন্য একমাস সময় দেওয়া গেল। আমি এখনও বলিতেছি বিবাহে তুমি যথেষ্ট লাভবান্ হইবে।" উমাশঙ্করের মস্তকে বজ্রাঘাত কি করিয়া নিজ দুহিতাকে যবন করে সমর্পণ করিবেন,— ভাবিতে লাগিলেন। কূটবুদ্ধি উমাশঙ্কর এইবার আপনার জালে জড়িত।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পাপের পরিণাম।

"পাপের জয় এবং পুণ্যের ক্ষয়", এই প্রবাদ বচনটী অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। বাস্তবিক কি পাপীর উন্নতি এবং পুণ্যাত্মার অমঙ্গল হয়? সামান্য বুদ্ধি মানব আমরা, ভগবানের লীলা কি বুঝিব? তবে সহজ জ্ঞানে যতদূর উপলব্ধি হয়, তাহাতে এই বুঝিতে পারি, যে কিছু পাপীকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

লঙ্কাপতি রাবণ পাপের পরাকাষ্ঠা

প্রদর্শন করিয়াছিল; কুরুকুল যথেচ্ছাচারী হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের পরিণাম ফল কি হইল? সবংশে ধ্বংস। পাপাচারীর উন্নতি কয়দিনের জন্য? নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা যেমন এককালে নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠে, পাপাচারীর শ্রীবৃদ্ধিও সেইরূপ প্রবলভাবে পরিদৃশ্যমান্ হয়। পাপের ভরা পূর্ণ হইলেই, অতল জলে নিমজ্জন। উমাশঙ্করেরও সেইরূপ পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে। পাপপরায়ণ পাঠানের যোগে সে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অনেক পাপকার্য্য সাধন করিয়াছে। সে যত পাপকার্য্য করে, ধনধান্য ঐশ্বর্য্যে ততই তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়; সুতরাং পাপকার্য্যে উমাশঙ্করের বড়ই আনন্দ, বড়ই উৎসাহ। উমাশঙ্কর, রতিকান্ত রায়ের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে; বীরেন্দ্রনারায়নের পিতার জমীদারী লইয়াছে; শ্যামাসুন্দরীর অপহরণে সহায়তা করিয়াছে। ইহা ভিন্ন লুণ্ঠন দস্যুতা, পরস্বাপহরণ যে কত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সে পুণ্যাত্মার পীড়ন করিয়াছে; ধর্ম্মশীলের ধর্ম্মে ব্যাঘাত দিয়াছে; মানীর মান হরণ করিয়াছে; জ্ঞানীর অপমান করিয়াছে। উমাশঙ্করের ষোল কলা পূর্ণ হইয়াছে। ভগবান্ আর কত সহ্য করিবেন? এইবার তাহার পতন। টাণ্ডা হইতে প্রত্যাগমনের পর, উমাশঙ্করের মস্তিষ্ক বিকার হইয়াছে। কখন কি বলে, কি করে, কিছুই স্থির থাকে না। দাসদাসীর প্রতি এই এক প্রকার আদেশ, পরক্ষণেই আবার অন্য আজ্ঞা। ক্রমে স্মরণশক্তির হ্রাস হইয়া আসিল। আর লোক চিনিতে পারে না। কখন হাসিয়া অস্থির; কখন কাঁদিয়া আকুল। তারাসুন্দরী নিকটে আসিলে, "তারা! ঝড় এল ঝড় এল, পালাও পালাও" বলিয়া, ছুটিয়া পলায়ন করে। প্রজাগণ রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। তলপ তাগাদা করিলে বলে, রায়মহাশয়ের নিকট দিয়া আসিয়াছি। রায় মহাশয়ের স্মৃতিশক্তি লোপ হইয়াছে। পিতার এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তারাসুন্দরী কিংকর্ত্তব্য

বিমূঢ়া হইয়াছেন। বিজয়কুমার কেশবপুর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; জননী শৈলজাদেবী বিজয়ের গমনে ম্রিয়মাণা হইয়াছিলেন; তদুপরি স্বামীর এই চিত্তবিকারে নিতান্ত বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছেন। স্বামীবিয়োগবিধুরা তারা একাকিনী কি করিবেন? তিনি মাতৃশুশ্রূষা করিতেছেন; পিতার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন; খাজনা আদায়ের বন্দোবস্ত করিতেছেন; আয় ব্যয়ের হিসাব পরিদর্শন করিতেছেন। এখন সকল কার্য্যই তারার আদেশে সম্পাদিত হইতেছে। তারা সকল কার্য্য করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রাণহীন পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার অবস্থা।

তাঁহার সে সজীবতা নাই, সে চাঞ্চল্য নাই; সে আনন্দ নাই। প্রাণপ্রতিম পতির সঙ্গে সে সকল চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার সে বাল্য-কালের খেলিবার সাথী, যৌবনের আনন্দদাতা, প্রাণাধিক পতি, প্রাণ মন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। অভাগিনী তারা পতির যে এত ব্যথা পাইবেন তাহা বুঝিতে পারেন নাই; বুঝিতে পারিলে, গমনে কোনমতে অনুমোদন করিতেন না। কিন্তু তারা স্বার্থপরা স্বামী নিকটে থাকিলে সুখিনী হইবেন বলিয়া, স্বামীর মনোবেদন। তিনি দেখিতে পারেন না। উমাশঙ্করের ব্যবহারে বিজয়ের গৃহ পরিত্যাগ অনি-বার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে সময়ে বাধা দিলে নিতান্ত স্বার্থপরের কার্য্য হয় তাই তারা বাধা দেন নাই। পিতৃপরায়ণা অথচ পতিগতা তারা বিষম সমস্যায় পড়িয়াই পতির গমনে সম্মতিদান করিয়াছেন।

তারার যেমন পিতৃভক্তি, তেমনি পতির প্রতি ভালবাসা। পিতার অন্যায় ব্যবহারে পতি দেশত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া, তিনি হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইয়াছেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার পিতৃভক্তির ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার পিতা সর্ব্বদোষে দোষী, মহাপাপে পাপী; তত্রাচ তিনি পিতাকে ভাল না বাসিয়া থা   না। তবে পিতার জন্য তাঁহার বড় দুঃখ।

আহা! ভারতের এই অতুল্য রমণীরত্ন বিধাতার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। রত্ন প্রসাবনী ভারতভূমির প্রায় সমস্ত রত্নই একে একে অন্তর্হিত হইয়াছে। ভারতের অপূর্ব্ব বীরত্ব বিস্মৃতির অতল তলে; ব্যাস বাল্মীকির প্রতিভ অন্তর্হিত হইয়াছে; বুদ্ধ চৈতন্যের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ নিভিয়া গিয়াছে। দরিদ্র ভারত অনেক আঘাত বক্ষঃ পাতিয়া লইয়াছে; অনেক বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়াছে; এক একটী আঘাতে এক একটী অঙ্গ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়, অঙ্গারদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায়, যে একটী অমূল্য রত্ন ভারত মাতার কোমল বক্ষঃ নিভৃতে লুকান আছে তাহা এত আঘাতে, এত প্রবল ঝটিকায় বিচ্ছিন্ন, বিবর্ণ, বিমলিন হইয়া যায় নাই। সে অমূল্য দেবদুর্ল্লভ মহার্হ মণি, অন্যদেশের লক্ষপতির গৃহে নাই, রাজাধিরাজ মহারাজার রাজপ্রাসাদে নাই। আছে কেবল ভারতে; দরিদ্র ভারতের ধনী দরিদ্র সকল গৃহে। অভিন্ন-দেবতা ভারত রমণীর পবিত্রতার স্পর্শে, ভারত পবিত্র হইতে পবিত্রতর; শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর। কে বলে ভারত অধঃপাতিত হইয়াছে? কে বলে ভারতের উন্নতি অতল জলে নিমগ্ন হইয়াছে? যে বলে সে ভ্রান্ত! যে বলে সে দেখুক; বিজ্ঞান চক্ষু অপসারিত করিয়া দেখুক; একদেশদর্শিতা পরিত্যাগ করিয়া দেখুক, কঠোর সমালোচকের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির শমতা করিয়া দেখুক, ভারত রমণীর পবিত্রতা, পতিপরায়ণতা এবং স্নেহ-ভক্তির পরিমাণ কত! ত্যাগশীলতা কত উচ্চ! এই সরলা কোমলা এবং মূর্ত্তিমতী করুণার আধার রমণীকুলের আবির্ভাবেই ভারত জননী এক ঐশ্বর্য্যশালিনী। এই দেবদুর্ল্লভা ললনাগণের অস্তিত্বে ভারতের অমু[illegible] শোভার সমাবেশ। যাহারা পরনিন্দা এবং পরকুৎসা লইয়াই ব্য[illegible] তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছি, আর যাহারা পরগুণ কার্ত্তনে কাতরতা প্রকাশ করে তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছি যে, যদি আধ্যাত্মি

তত্ত্বে অধিকার থাকে, তবে দেখুক, পরার্থপরা, স্নেহ মমতার অনন্ত খনি ভারতরমণী প্রকৃতির কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এ রত্নের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে পারিলে, ভারত কোনকালে দরিদ্র হইবে না। এ মহামূল্য রত্নের সুখস্পর্শে ভারতবাসী কাঙ্গাল হইয়াও কোটীপতি, প্রজা হইয়াও রাজাধিরাজ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

পূর্ব্বস্মৃতি।

উমাশঙ্করের এখন ঘোর উন্মাদ অবস্থা। তারাসুন্দরী ঔষধি সেবনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঔষধি সেবনে উমাশঙ্করের বড় আপত্তি। বল প্রকাশ না করিলে ঔষধি সেবন করেন না; স্নান আহার করিতেও চাহেন না। তারা পিতার প্রতি বলপ্রকাশের পক্ষপাতিনী নহেন। তিনি স্তুতি বিনতি করিয়া রোগীর সেবা করিতে চাহেন। উমাশঙ্কর তারার কথা ভিন্ন আর কাহারও কথা শুনেন না। আজ উমাশঙ্কর কিছুতেই ঔষধি সেবন করিতেছেন না। তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন; শিশুকে যে প্রকারে ভুলাইতে হয়, সেই প্রকারে পিতাকে ভুলাইতেছেন। উমাশঙ্কর আজ শিশুর ন্যায় তারার প্রলোভনে ভুলিয়াছেন। শিশুর ন্যায় আবদার করিতেছেন। আহা! উমাশঙ্কর তুমি ভগবানের কৃপালাভ করিয়াছ। তোমার পূর্ব্বকার নারকীয় অবস্থা হইতে এ স্মৃতিহীন অবস্থা শত গুণে লোভনীয়। যতদিন তোমার বিচার আরম্ভ না হইয়াছিল, ততদিন তোমার আপাতরম্য সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল; তুমি তাহাতে উৎসাহিত

হইয়া পাপের ভরা বোঝাই করিতেছিলে। সৌভাগ্যবলে সে হইতে তুমি পরিত্রাণ পাইয়াছ। এখন তোমার প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। এইবার রক্ষা পাইবে। সহসা পদশব্দ হইল। শ গাহিতে গাহিতে ভিতর বাটী প্রবেশ করিলেন।

ঐদেখ কাল মেঘে ঢেকেছে গগন।
প্রবল ঝটিকা বায়ু উঠিবে এখন॥
পালাও পালাও সখি!
আর না উপায় দেখি,
ঘর বাড়ী ভেঙ্গে চুরে হইবে পতন।
আঁধার আঁধার সই ' ঢাকিবে তপন॥

উমাশঙ্কর শুষ্কমুখে ভয়বিহ্বল হইয়া একবার শশিমুখীর চাহিলেন; পুনর্ব্বার তারার দিকে দৃষ্টি করিয়া যেন কিছু স্মরণ ক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া বলিয়া উ ঠিক বলেছে—প্রবল ঝড়, তারা ' মা! পালাও পালাও। ঝড়, বৃষ্টি এলো—এলো,—এখনি এলো—পালাও পালাও। বলিয়া—তারার ধরিয়া টানিতে লাগিলেন।

তারাসুন্দরী পিতার ব্যাকুলতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। হইবার পর হইতে পিতার এরূপ তৎপরতা, এমন ব্যাকুলতা এক জন্যও দেখেন নাই; দেখিতেন—কেবল জড়তা ও জীবনশূন্যতা। ত আবার কি হইল? তারা বড়ই চিন্তাকুল হইলেন। পাগল নহি, পালাও—পালাও—সর্ব্বনাশ উপস্থিত; আর বিলম্ব করিও না; পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে; পিতার কথা শুন। আমার দিব্য বলিতেছি, পালাও পালাও। বলিয়া—উমাশঙ্কর বড়ই কাতরতা, ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

শশিমুখী গাহিলেন—

নগর ছাড়িয়া সখি ! চল যাই বনে।
পাইবে পরম সুখ থাকিলে নির্জ্জনে ॥
অবিচার অত্যাচারে,
দগ্ধ হলে এসংসারে,
তাই বলি চল যাই গহন কাননে।

মাশঙ্করের আর উন্মত্ততা নাই। তিনি ধীর, স্থির এবং সৌম্যমূর্ত্তি করিয়াছেন। কেবল শশিমুখীর গান শুনিয়া এক একবার .উচ্চকণ্ঠে ছন ; হিতৈষিণি দেবীরূপিণি ; কোন্ পরমোপকারী বন্ধুর নিকট এই ঘোর দুর্দ্দিনে আমাদিগকে সাবধান করিতে আসিয়াছ ? বল সে বন্ধু কে ? ।

ী গাহিলেন—

মনে মনে শত্রু ভাবে ভাব তুমি যারে,
সে মহাপুরুষ রত পর উপকারে।
করিয়াছ সর্ব্বস্বান্ত,
কিছুই না আছে অন্ত,
তবু রাজা রতিকান্ত পাঠাইলা মোরে।
আসন্ন বিপদ্ বার্ত্তা জানাবার তরে ॥

শশিমুখী কথা কহিয়া, তারাসুন্দরীকে সমস্ত বৃত্তান্ত অ৲ ন। এখন অন্য কোন স্থানে গমন করিলে, বিপদ আরও ঘনীভূ৲ কথাও বলিলেন ; আরও বলিলেন যে, এঘোর বিপদের সময় রাজা রায়ের গড়খাই দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলে বিপদের সম্ভাবনা নাই।

রাজা অগণ্য সৈন্য সমাবেশ করিয়া দুর্গ রক্ষা করিতেছেন। তিনি রায়জির রক্ষায় প্রাণান্ত স্বীকার করিয়াছেন এবং আমাকে তোমাদে· সকলকে সঙ্গে লইয়া যাইতে বলিয়া দিয়াছেন।

উমাশঙ্কর উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শ্রবণ করিলেন, শশিমুখীর কথা সাঙ্গ হইলে, তারাকে বক্ষে টানিয়া আবেগভরে শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—তারা কি সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছিল! পাষণ্ড আমাকে একমাস মাত্র সম দিয়াছিল; সে সময় যে গত প্রায়! মা! আমার ধন প্রাণ ঐশ্বর্য সব যাক্‌, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ করি না; কিন্তু তোমাকে আমার ক্রো· হইতে লইয়া যাইবে, এ যাতনা কি প্রকারে সহ্য করিব? আমি মহাপাপী· তাই এই ঘোর উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়া স্মৃতিশক্তি হারাইয়াছিলা·তী- বুদ্ধিস্মৃতি না হারাইলে এতদিন ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করি পারিতাম। কিন্তু আর সময় নাই। পাষণ্ড-যবন আগত প্রায়। ·বারে মহাপুরুষের আশ্রয় লওয়াই শ্রেয়ঃ। উমাশঙ্কর অবিশ্রান্ত ·তেছে, ·তেছেন। পিতাপুত্রী উভয়ে উভয়ের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া অ·ক্রমে রোদন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অশ্রু বর্ষণ ক·হইয়া হৃদয় আশ্বস্ত হইল। মহাপাপী উমাশঙ্করের প হই- বং ভয়ের মাত্রা যেন একটু লঘু হইয়া গেল। হে ত্রিদিবধ·ছে। অশ্রু! সংসারে তোমার ন্যায় উপকারী বন্ধু অতি বিরল ·র ·ঐ পবিত্রতার আবাসভূমি, সুনির্ম্মল স্ফটিক বিন্দুর প্রত্যে ·মাণু স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত; সমগ্র পৃথিবীর সাম্রাজ্য দান করি· ন যাহার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারা যায় না, তোমার এক ফোটায় অদ্ভু· ইন্দ্রজালের ন্যায় সে হৃদয় নিমেষ মধ্যে, পদতলে লুটাইবে। মহাকবি· র কাব্যসুধা পান করিয়া, যে হৃদয়ের কঠোরতা অপনীত হয় না, তোম· ন

হইতে, হরসুন্দরীদেবী সমাধিমগ্না হইয়াছেন; এপর্য্যন্ত তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয় নাই। ইহাতে জীবন বড় সুখী। শ্যামাহরণের শোচনীয় সংবাদ যতক্ষণ তাঁহার অজ্ঞাত থাকে, ততক্ষণ তাহার সুখ। সে গৌরীকে তাঁহার রক্ষার্থ নিযুক্ত রাখিয়াছে; এবং আপনি এক একবার সংবাদ লইতেছে।

অদ্য জীবন অতি প্রত্যুষেই চলিয়াছে। পল্লীবাসীর নিকট জীবনের বড আদর। কেহ ডাকিতেছে, জীবন দাদা তামাক খাইয়া যাও। কেহ বলিতেছে, জীবন ভায়া! কেমন আছ? কোন বুর্ষিয়সী অস্ফুটস্বরে বলিতেছে,—আহা! জীবন ঘোষ কি পুণ্যসঞ্চয়ই করিতেছে। প্রভুভক্তি যাহাকে বলে তাহা দেখাইল; পরের কার্য্য যেমন করিয়া করিতে হয় তাহা করিল। জীবন নিরক্ষর কৃষক শ্রেণীর লোক বটে; কিন্তু মহাপুরুষ রতিকান্ত রায়ের সংস্রবে যাহারা আসিয়াছে, তাহারাই কিছু না কিছু জ্ঞানলাভ করিয়াছে। জীবন আত্মপ্রশংসা শুনিয়া সকাতরে বিপদ্—নাশন মধুসূদন নাম স্মরণ করিতেছে, আর বলিতেছে,—ঠাকুর! এ আবার কি খেলা! এ বিষম পরীক্ষা কেন? এ যে জীবনের সর্ব্বনাশের লক্ষণ। অধম জীবন, মূর্খ জীবন অহংকারে ফাটিয়া মরিবে যে। জীবনের প্রার্থনার ফল ফলিল না। চারিদিকেই প্রশংসা স্রোতঃ।

জীবন কাহারও কথা শুনিল না; কাহারও নিকট গেল না। দ্রুতপদে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল। মাঠে পড়িল। সেখানেও রক্ষা নাই। রাখাল বালকগণ জীবনকে দেখিয়া সমস্বরে গান ধরিল।

ধন্য ধন্য জীবন ঘোষ ধন্য এ সংসারে।
তোমার মহৎ জীবন মহাধন্য কেবা এমন কর্ম্ম করে?
দেখাইলে প্রভুভক্তি,
প্রাণপণ আনুরক্তি,
পর উপকার তব মুক্তির উপায়।

চারু জানুযুগং চারুজঙ্ঘাযুগল সংযুতম্ ॥
তুঙ্গগুল্‌ফারুণ নখ ব্রাত দীধিতিভি র্বৃতম্।
নবাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠদলৈর্বিলসৎপাদপঙ্কজম্ ॥
সুমহার্হ মণিব্রাত কিরীট কটকাঙ্গদৈঃ।
কোটিসূত্র ব্রহ্মসূত্র হার নূপুব কুণ্ডলৈঃ ॥
ভ্রাজমানং পদ্মকবং শঙ্খচক্রগদাধরম।
শ্রীবৎস বক্ষসংভ্রাজৎ কৌস্তুভং বনমালিম্ ॥
প্রহ্লাদ নারদ বসু প্রমুখৈর্ভাগবতোত্তমৈঃ।
স্তূয়মানং পৃথগভাবৈর্বচোভি রমলাত্মভিঃ ॥
ওঁ নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

ইত্যাদি স্তোত্র প্রণামাদি দেবীর মুখ হইতে অনবরত নির্গত হই-তেছে। সে সুমধুর স্তোত্রের স্বরলহরীতে সকলে আত্মহারা। দেবীর তখন জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি।

হরসুন্দরী ভাবগদ্‌গদ্‌স্বরে বলিতে লাগিলেন—দয়াময়! এত দিনে কি আমার প্রতি দয়া হইল। অথবা আমার পার্থিব প্রার্থনায় রুষ্ট হইয়া কি ছলনা করিতে আসিয়াছ? ভগবন্! আমিত পার্থিব বিপদে অভিভূত হই নাই; ৺বে জীবন ও গৌবীর জন্য যে প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা হৃদয়ের অনিবার্য্য বেগ। আমি সে বেগ সম্বরণ করিতে পারি নাই। তাহাও তোমার কার্য্য প্রভো! যে রূপেই হউক আজি যখন স্বচক্ষে তোমার দর্শন পাইয়াছি, তখন আমি ধন্য। নাথ ঐ মোহন বেশে আর কিছুক্ষণ দাঁড়াও। আমি তোমার মধুরমূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয় শীতল করি। কে বলে তুমি নিরাকার? এই যে আমার সম্মুখে সুমধুর সাকার মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া, আমাকে জন্মজন্মান্তরের তপস্যার ফল প্রদান

করিতেছ। দয়াল প্রভো! তোমার সে নিরাকার মূর্ত্তি আমি চাহি না। আমি তোমার ঐ মোহন মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া স্বর্গীয় সুখলাভ করিব এই আমার বাঞ্ছা। হরসুন্দরীর আনন্দ ধরে না। দুই চক্ষে আনন্দাশ্রু বহিতেছে; হরসুন্দরী তন্ময়া। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া দেবীর চৈতন্য হইল।

রতিকান্ত রায়—

দেবী হরসুন্দরি! আমি তোমার চরম উন্নতি দেখিয়া যারপরনাই আনন্দলাভ করিয়াছি। তোমাকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমি তোমাদিগের নিকট হইতে পৃথক্ ছিলাম। ঘোর বিপদে পড়িয়া তুমি আমার উপদেশ মতে চলিতে পার, কি বিহ্বলা হইয়া যাও, দেখিবার জন্য আমি দূর হইতে উৎসুক নেত্রে চাহিয়া আছি। কিন্তু তুমি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছ। এ বিষম বিপদে যে চিত্ত স্থির রাখিতে পারে, সে সামান্যা রমণী নহে। গুরুদেব পরমানন্দস্বামীর নির্দেশও স্বতন্ত্র থাকিবার অন্য-তর কারণ। যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তাহা প্রকাশ হইলে প্রাণদণ্ডই আমাদের শাস্তি; এই নিমিত্ত ঐ গূঢ় রহস্য গোপন রাখা গুরুদেবের আদেশ। ফলকথা আমরা সর্ব্বদাই তোমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতাম। তত্রাচ শ্যামা অপহৃতা হইল। ইহা ভবিতব্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। নতুবা জীবন যে প্রকার আয়োজন করিয়াছিল, তাহাতে শ্যামাকে অপহরণ করা যবনের সাধ্য ছিল না। কিন্তু অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে কষিত কাঞ্চন শ্যামার শেষ পরীক্ষা হইয়াছে, এবং বীরেন্দ্রনারায়ণের বলবীর্য্যের ও পুরুষার্থেরও প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

যাহাহউক জীবনের নিঃস্বার্থ উপকারের এবং গৌরীর গুণের পুরস্কার না দিতে পারিলে আমার মনের শান্তি হইতেছে না। রাজার দুই চক্ষু ছল ছল হইয়া উঠিল। বাপ্ জীবন! তুমি অসময়ে আমার যে উপকার

করিয়াছ, এজীবনে তাহার প্রতিদান করিতে পারিব না; তবে সময় উপস্থিত হইলে, তোমাকে একখানি গ্রাম দান করিব, আর উপযুক্তা পাত্রী আনিয়া তোমার বিবাহ দিব মানস করিয়াছি। ভগবান্ কি আমার বাসনা পূর্ণ করিবেন? বলিয়া—রতিকান্ত রায় মহাশয় দুই বাহু প্রসারিত করিয়া, জীবনকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন। জীবন কাঁদিতে কাঁদিতে রাজপদে পতিত হইল। রাজা দেখিলেন, জীবন মূর্চ্ছিত হইয়াছে।

হরসুন্দরী শীতল বারি আনিয়া জীবনের চক্ষুতে ও মস্তকে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। জীবনের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে। সে নতজানু হইয়া করযোড়ে কহিল; মহারাজ, দেব, প্রভো! আমায় গ্রামের আধিপত্য দিবেন না; নফরজীবনকে ঐশ্বর্য্য দিয়া ভুলাইবেন না। আমি চরণ-সেবার অধিকারী। কি করিয়া গ্রামের ভার লইব প্রভো!

আপনি ভূস্বামী, রাজা, ব্রাহ্মণ এবং প্রভু। আপনার সেবা করিতে পারিলে আমার ঐহিক, পারত্রিক সকল মঙ্গল হইবে। আমি চরণ সেবা ভিন্ন আর কিছু প্রার্থনা করি না।

রাজা সহাস্য মুখে পদধূলি দিয়া জীবনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। হর-সুন্দরীও জীবনকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

এইবার গৌরীর পালা। সেও কোন মতে পুরস্কার লইতে স্বীকৃতা নহে। বলিল—"তাহাহইলে সে পর হইয়া যাইবে"; সে শ্যামা দিদিকে চাহে। রায় মহাশয় কহিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে। তুমি শ্যামার সহচরী থাকিবে।

রায় মহাশয় হরসুন্দরীকে কহিলেন, দেবি! সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সকলগুলিই উন্নতির দিকে অগ্রসর। কেবল দেবকান্ত সকলের উপর গিয়াছে। গুরু বলিয়াছেন—দেবকান্ত আর সংসারে ফিরিবে না। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, "উহাকে আর ঐশ্বর্য্যমদে নিক্ষেপ করিবার

চেষ্টা করিও না।” তোমারও যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে তুমি যে আর অধিক দিন সংসারে থাকিবে তাহা বোধ হয় না।

হরসুন্দরী কহিলেন—প্রভো! আমার কি হইয়াছে, না হইয়াছে, জানিনা! তবে যদি কিছু হইবার সম্ভাবনা থাকে, সে আপনার কৃপায়। আপনার চরণরেণুর প্রসাদে দাসীর দুরাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে; আপনার উপদেশের ফলে দাসীর যাহা কিছু চেষ্টা হইয়াছে।

রতিকান্ত—

আর শশীর কথা শুনিয়াছ কি? সেও বড় উন্নতি করিয়াছে। তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া বোধ হয় সে শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা। সে আমার প্রিয়-সুহৃদ্ নীলকণ্ঠ রায়ের দুহিতা। বালবিধবা শশিমুখী এতদিন পিতৃগৃহে ছিল। সম্প্রতি পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছে। পিতামাতার পরলোকের পর শশী আমার সংস্রবে আসিয়াছে। তাহার রূপলাবণ্য এবং বয়স্তারুণ্য দেখিয়া, আমার বড়ই আশঙ্কা হইয়াছিল। কিন্তু দেখিলাম সে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি। পাঠানদিগের এই উপস্থিত বিপ্লবে আমি সর্ব্বদা তাহার সংবাদ লইতে পারিতাম না। কিন্তু সে সময় পাইলেই আমার নিকট আসিত। আমার উপদেশের ফল যে এত শীঘ্র ফল প্রসব করিবে, ইহা আমি স্বপ্নেও [illegible]বতে পারি নাই। দেখিলাম, যে ধর্ম্মজীবনে উন্নত হইবার যাবতীয় উপাদানে তাহার হৃদয়ের গঠন। তাহাকে উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই। কেবল একটু সূত্র ধরাইয়া দিলেই হইল। তখন গুরুদেবের নিকট তাহাকে লইয়া গেলাম। গুরুদেব দেখিয়াই চিনিলেন। বলিলেন—“এ যে, মানবীরূপিণী দেবী।”

সহসা গান করিতে করিতে শশিমুখী কুটীর সন্নিকটে আগমন করিল।

(আমার) গণাদিন ফুরায়ে এল দীনবন্ধো রেখো পায়।
অজ্ঞানে আচ্ছন্ন আমি কি হবে আমার উপায়॥

গুরু আজ্ঞা ধরি শিরে,
ফিরি আমি ঘরে ঘরে,
অভাগিনী কর্ম্ম ফেরে ডেকে দেখা নাহি পায়।
কেঁদে পাগলিনী কয়,
এই বড় হ'তেছে ভয়,
(আমার) সুখ দুখ যাতায়াত এখনো হ'ল না ক্ষয়॥

রতিকান্ত—

মা! তোমার আবার ভয় কি মা! তুমিত স্বকার্য্য সাধন করিয়া বসিয়াছ মা!

শশী—

গুরুদেব! এখনও ত কার্য্য ফুবাইল না, তবে কি কবিয়া উন্নতি হইবে?

রতিকান্ত—

মা! তোমার নিজকার্য্য অনেক দিন ফুরাইয়াছে। ভগবান্ সে সম্বন্ধে বাল্যকাল হইতে তোমাকে সৌভাগ্যশালিনী করিয়াছেন। বাল-বৈধব্য দশা দিয়া, তোমার উন্নতির পথ পরম প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। এখন যে কার্য্য করিতেছ, ইহা তোমার নিজের কার্য্য নহে। ইহা পরের কার্য্য। পরের কার্য্যে আর ভগবানের কার্য্যে কোন প্রভেদ নাই। শশি-মুখী গুরুদেব এবং গুরুপত্নী চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিলেন। রায়মহাশয় হরসুন্দরীর দিকে চাহিয়া কহি-লেন—দেখিলে—আনন্দময়ীবনবিহঙ্গীর ভঙ্গি দেখিলে? ও এখন আত্মারাম। হরসুন্দরী কহিলেন—দেব! অনেক জন্মের সুকৃতিবলে এইরূপ উন্নতি হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ষড়যন্ত্র।

বঙ্গে পাঠান অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গাধিপ দায়ুদখাঁ বিলাসী, অকর্ম্মণ্য এবং স্বেচ্ছাচারী। এরূপ লোকেব পক্ষে শাসনদণ্ড পরিচালনা করা বিড়ম্বনার বিষয়। কর্ম্মচারীবর্গ দায়ুদের অকর্ম্মণ্যতায় আরও উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে। অত্যাচারেব শাসন নাই; দেশের মঙ্গলের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। দেশ এক প্রকার অরাজক। পাঠানের ভয়ে কাহারও নির্ব্বিঘ্নে বাস করিবার উপায় নাই।

পাঠান, ক্ষেত্রের শস্য লইয়া যাইতেছে, পশুশালা হইতে উৎকৃষ্ট পশু বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে; স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। তাহাদের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

দরিদ্রের অন্তর্যাতনা, কাতরের ক্রন্দন, সতীর অভিশাপ দেশ বিদেশ কম্পিত করিয়া অন্তরীক্ষে উঠিল। ভগবানের সিংহাসন টলিল। আর রক্ষা নাই। পাঠান এইবার মজিল। এইবার পাঠানের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। পাঠান! বীরদর্পে ন্যূনাধিক দুইশত ছত্রিশ বৎসর বঙ্গভূমি একচ্ছত্র শাসন করিয়া আজ তোমাদের অধঃপতন কেন হইল তাহা যদি তোমরা বুঝিতে পারিতে, তাহা হইলে এই অধঃপতনের পরিবর্ত্তে আরও বহুকাল পর্য্যন্ত

রাজদণ্ড পরিচালনা করিতে পারিতে। যদি একবার চিন্তা করিতে যে, দর্পহারী ভগবান্ তোমাদের প্রত্যেক কার্য্যে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, তাহাহইলে তোমাদের এ দশা হইত না। ভগবানের রাজ্যে অবিচার নাই, অবিবেচনা নাই; অত্যাচারের প্রশ্রয় নাই। সে পক্ষপাতহীন বাদসাহের বাদসাহার তুলাদণ্ডে একদিন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তোমাদের কৃত-কার্য্যের বিচার হইবে তাহা ভাবিয়াছ কি? তোমরা ভাবিয়াছিলে, প্রজার এই রূপ দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া অনন্তকাল রাজ্যশাসন করিবে, অনন্ত কাল এইরূপে নিরীহ প্রজার শোণিত শোষণ করিয়া আপনাদের উদর পুর্ণ করিবে; কিন্তু অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইবে? তোমাদের ন্যায় কোটি কোটি নরপতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বিস্তার করিয়া, ধূলিকণায় মিশিয়া গিয়াছে। অত্যাচারীর অস্তিত্ব অধিক দিনেব জন্য নহে; অধর্ম্মের পতন অনিবার্য্য। ঐ দেখ অত্যাচারক্লিষ্ট প্রজাগণ গাত্রোত্থান করিয়াছে; ঐ দেখ সমস্বরে সকল প্রজা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। এই বার তোমাদের দর্প চূর্ণ হইবে। বস্তুতঃ পাঠানের অসহ্য অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বাঙ্গালার জমীদার, তালুকদার, জোতদার, জ্ঞাতিদার এবং সামান্য প্রজাপর্য্যন্ত একত্র দলবদ্ধ হইয়া মন্ত্রণা আরম্ভ করিয়াছে। বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ এবং বিদ্যা বুদ্ধি ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ রাজা রতিকান্ত রায় নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে মোগলদিগের আশ্রয় লওয়াই সুপরামর্শ ধার্য্য হইয়াছে। রাজা তোডরমল্ল রাজপুত ও মোগল সৈন্য লইয়া ইতিপূর্ব্বে একবার দায়ুদখাঁকে পরাভূত করেন। সেই সময়ে মোগলগণের শৌর্য্য বীর্য্য ও পরাক্রম, লোকে অনুভব করিয়াছিল। মোগল কর্ত্তৃক পাঠান দূরীভূত হইবে। এক কণ্টক দ্বারা অপর কণ্টক বাহির করিতে হইবে। সে কণ্টকত আবার যন্ত্রণাদায়ক হইতে পারে? কিন্তু আর উপায় নাই।

মোনায়েমখাঁর নিকট গুপ্তচর প্রেরিত হইল। খাঁসাহেব সাহায্যদানে স্বীকৃত হইলেন; বলিয়া দিলেন—যে, দেশের প্রধান প্রধান কতিপয় ব্যক্তিকে বাদসাহ-দরবারে গমন কবিতে হইবে। তিনিও এই সম্বন্ধে দরবারের হুকুম প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। অনুমতি আসিল। খাঁসাহেবের সংবাদমতে রতিকান্ত অবগত হইলেন যে, সাহান্‌সাহা সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছেন। আগরা হইতে একখানি ছাড় পত্রও আসিয়াছে। ইহাতে বাদসাহের অধিকৃত সর্ব্বত্র রতিকান্ত প্রভৃতির অবাধ-প্রবেশের হুকুম হইয়াছে।

রতিকান্ত রায় আগরা গমনে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বীরেন্দ্র-নারায়ণকে নূতন দুর্গের ভার অর্পণ করিয়া, হরসুন্দরী, শ্যামা, তারা এবং জীবন ও গৌরীকে লইয়া রায় মহাশয় যাত্রা করিলেন। শশিমুখীও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। উমাশঙ্কর রায় এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন নাই; সুতরাং তিনি পত্নীর সহিত দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইলেন। তারা পিতৃসেবার জন্য দুর্গমধ্যে থাকিতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু উমাশঙ্কর তাহাতে সম্মত হইলেন না। বিজয়ের বিদেশ গমনে অভাগিনী তারা যে, নিদারুণ আঘাত পাইয়াছেন, উমাশঙ্কর তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি তনয়ার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, হৃদয়-যাতনার লাঘব হইবে এবং বিজয়কুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে ইত্যাদি মনে করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইতে রায় মহাশয়কে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রায় মহাশয় সম্মত হইলেন। কিন্তু দুইটী অনিন্দ্যসুন্দরী লইয়া মোগল দরবারে যাইতেছেন বলিয়া মনে মনে বিশেষ উৎকণ্ঠিতও হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আগ্রা যাত্রা।

সম্রাট্ দরবারে যাইবার সাজসজ্জা হইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ বজ্‌রা সৈন্য সামন্তে পরিপূর্ণ হইল। সম্রাটের ছাড়পত্র আছে, বলিয়া রায় মহাশয় অধিক সৈন্য সঙ্গে লইলেন না। দুইখানি বজ্‌রা বান্ধিয়া একত্র করা হইল। একখানিতে শ্যামা, তারা ও শশীর সহিত হরসুন্দরী ও রায়মহাশয় উঠিলেন। আর একখানিতে জীবনগৌরী আদি অনুচরবর্গ আরোহণ করিল। বজ্‌রা জাহ্নবী বাহিয়া রাজমহল অভিমুখে চলিল। দুই তিন দিন কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিল না। নৌকাযাত্রিগণ নদীর উভয় তীরের সুদৃশ্য স্বভাব শোভা দেখিতে দেখিতে, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চতুর্থ দিবস সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টির বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল; কিন্তু প্রবলবেগে ঝড় বহিতে লাগিল। আর কিছুদূর যাইতে পারিলে রাজমহলে উপস্থিত হওয়া যায়। "সেস্থানে পঁহুছিতে পারিলে, এই বিপত্তির সময়ে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইবে", বলিয়া—রাজা মাঝী মাল্লা দিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কিন্তু সে ঘনঘটাচ্ছন্ন অন্ধকারময়ী রজনীতে বাত্যাসংকুল জাহ্নবীজলে এক পা অগ্রসর হয় কাহার সাধ্য? দেখিতে দেখিতে প্রকৃতিসুন্দরী ভীষণামূর্ত্তি ধারণ করিল। শোভাময়ী প্রকৃতি সতি! তোমার সে নয়নানন্দদায়িনী সুন্দর শোভা কোথায় গেল?

এই যে নীল আকাশের নীলপীতশ্বেতবিমিশ্রিত বিবিধবর্ণবৈচিত্র্যের বিচিত্রশোভা, ভাগীরথীর নীল জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল, সে শোভাত আর নাই।

এ যে, ঘনঘোর মসিবর্ণে সমস্ত আবৃত করিয়া দিয়াছে। আর সে তীর ভূমির সুশ্যামল শস্যক্ষেত্রের সুন্দর শোভা দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন কেবল অন্ধকার, প্রবল ঝটিকার শ্রবণভৈরব শন্ শন্ শব্দ, বজ্রপাতের ভীষণ নিনাদ; আর জাহ্নবীর উত্তাল তরঙ্গমালার উৎক্ষেপণধ্বনি। দাঁড়ি মাঝীগণ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় হইয়াছে; সৈনিকমণ্ডলী জড়প্রায়, অনুচরবর্গ ভয়বিহ্বল। কেবল ক্ষমাধৈর্য্যের অবতার রতিকান্ত রায় তীরবেগে এক নৌকা হইতে অপর নৌকায় যাইতেছেন, আর সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন। তাঁহার মতে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। বায়ুর গতি দেখিয়া দিঙ্নির্ণয় করিয়া তিনি সকলকে অভয় দিয়া বলিতেছেন—যে এপ্রকার ঝড় এক প্রহরের অধিককাল থাকিতে পারে না; তা সে এক প্রহরের অর্দ্ধেকের অধিক সময় অপগত হইয়াছে; অবশিষ্ট দুই দণ্ডেরও অল্প সময় মাত্র আছে; অতএব তোমরা নিশ্চিন্ত হও। তাঁহার ক্ষিপ্রকারিতা ও সময়োচিত উপদেশে অনেকেই প্রকৃতিস্থ হইল।

মাঝী মাল্লারা সাহসে বুক বাঁধিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে ক্ষেপণী ধারণ করিল। হরসুন্দরী দেবী ইষ্টদেবে আত্মসমর্পণ করিয়া একপ্রকার সংজ্ঞাশূন্যা হইয়াছেন; তাঁহার কর্ণে ঝড় বৃষ্টির শ্রবণকঠোর শব্দ প্রবেশ করিতে পারে নাই। শশীর সাহসে পরিজনমধ্যে কোন প্রকার ভয়ের সঞ্চারও হয় নাই।

ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে; প্রকৃতি আবার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; আকাশের কাল মেঘ অন্তরিত হইয়াছে। জাহ্নবীবক্ষে আর সে তরঙ্গরঙ্গের লীলা বিলাস নাই। যেন সকলেই নিস্তব্ধতার অনন্তক্রোড়ে গা ঢালিয়া দিয়াছে। জ্যোৎস্না ফুটিল; রজতশুভ্র জ্যোৎস্নামালাপরিশোভিত তীরভূমি হাস্য করিয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দস্যু হস্তে।

রাজমহল হইতে ভাগলপুর যাইবার প্রশস্ত রাজপথে পথিক একাকী গমন করিতেছেন। পথের দুই পার্শ্বে খোলা মাঠ ধূ ধূ করিতেছে; স্থানে স্থানে নিবিড় অরণ্য; কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়। পথিকের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে একগাছি মাত্র লাঠী সম্বল; পরিধান সামান্য ধূতিচাদর ও একটী মেরজাই। দেখিলে অর্থশালী বলিয়া কোন ধারণাই হয় না। পথিকের বয়স অতি অল্প; পূর্ণযৌবনে পড়িয়াছেন মাত্র; সুঠাম সুন্দর এবং বলিষ্ঠ দেহ। সহসা পার্শ্ববর্ত্তী মাঠের দিকে বিকট শব্দ হইল। পথিক সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে না করিতে বোঁ বোঁ করিয়া একটী লৌহ-দণ্ড তাঁহার দিকে আসিতেছে, দেখিতে পাইলেন। পথিক সবলে লাঠী ঘুরাইয়া দণ্ডের মুখে আঘাত করিলেন; লৌহদণ্ড শতহস্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। আর একটা; তাহারও সেই রূপ দুর্দ্দশা হইল। আঘাত-কারীরা বুঝিল এ দুর্ব্বল হস্তের লাঠী নহে। তখন তাহারা আর দণ্ড-নিক্ষেপ না করিয়া বিকট শব্দে বংশী ধ্বনি করিল। পথিকের ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি যেমন বেগে যাইতেছিলেন, সেই রূপেই গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে আবার বিকট শব্দ শ্রবণগোচর হইল। পথিক চক্ষুরুন্মোচন করিতে না করিতে দশ বার জন দস্যু আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। পথিক নির্ভয়ে যষ্টি সম্বলে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার সহিত বল পরীক্ষা না করিয়া একগাছি বড় জালে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। হস্তপদ এবং

যষ্টিসহ জালে আবদ্ধ হইয়া পথিক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। কিন্তু সে সবল হস্ত কি স্থির থাকিতে পারে? পথিকের হস্ত আস্ফালনে জাল ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া গেল। দস্যুগণ সংকট বুঝিয়া পুনর্ব্বার একগাছি এবং উপরি উপরি আরও দুই তিন গাছি জালে তাঁহাকে জড়াইয়া ফেলিল।

এইবার আঘাত। নৃশংস দস্যুগণের লাঠীর আঘাতে পথিকের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। একজন দস্যু কহিল,—"ভাই! আর মারিতে হইবে না; উহার হইয়া গিয়াছে; এখন যাহা আছে লইয়া আমরা যাই চল"।

দ্বিতীয় দস্যু কহিল—"যদি এত ভয় থাকে তবে এমন কাজে হাত দিতে নাই।" অপর ব্যক্তি বলিল,—"ভাই গলায় পইতা দেখিতেছি, এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইবে"। "প্রথম ব্যক্তি বলিল গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, নরহত্যা, নারীহত্যা আমাদিগের কি বাকী আছে? হত্যায় আবার ব্রাহ্মণ শূদ্র? ব্যবসায় আবার বিচার? ভাই সকল ব্যবসা চালাইতে গেলেই একটু আধটু অধর্ম্ম করিতে হয়। গোয়ালা দুধে জল দেয়, স্যাকরা সোনা চুরী করে; আর ঐ ব্রাহ্মণেরাও মন্ত্র চাপিয়া যায়"। এই বলিয়া—একখানি ছিন্ন বস্ত্র পরাইয়া পথিকের নিকট যাহা কিছু ছিল লইয়া দস্যুরা চলিয়া গেল।

পথিক সংজ্ঞাশূন্য। নয়নদ্বয় নিমীলিত, মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ। বোধ হয় জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। নতুবা চক্ষুর পাতা নড়িত; পল্লব পড়িত। যে আসিতেছে, মৃত দেহ দেখিয়া দশহাত দূরে পলায়ন করিতেছে। সেই মৃতদেহ অনাদৃত, অবজ্ঞাত এবং ভীতিপ্রদ হইয়া অনেকক্ষণ সেইস্থানে পড়িয়া রহিল। সেদিকে জনপ্রাণীর সঞ্চার নাই। হন্ হন্ করিয়া একজন ব্রহ্মচারী আসিতেছেন; হস্তে কমণ্ডলু, পরিধান পীতকৌপিক, মস্তক কেশশূন্য; শ্মশ্রুরাজি অদ্যাপি সুন্দর রূপে উদ্ভিন্ন হয় নাই। মৃতদেহের নিকট আসিয়া ব্রহ্মচারীর গমনবেগ মন্দীভূত হইয়া

আসিল। নিকটে, অতি নিকটে আসিলেন। কমণ্ডলু ফেলিলেন, নয়নে এক বিন্দু জল, আর এক বিন্দু। পীতাম্বরে অশ্রুমোচন করিয়া জানুদ্বয়ে ভর দিয়া উপবেশন করিলেন। শবের মুখে বুকে হাত দিলেন। নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। কমণ্ডলু হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া মৃত পথিকের চক্ষু, মুখ ও মস্তকে প্রদান করিলেন। পরে উত্তার নয়নে ভগবানের পবিত্র নাম জপ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ জপ করিবার পর একবার নয়ন উন্মীলন করিলেন। পুনর্ব্বার কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া সেইমত মৃত ব্যক্তির চক্ষুঃ মুখ ও মস্তকে প্রদান করিয়া আবার জপে নিমগ্ন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন—পথিকের চক্ষুর পাতা নড়িতেছে, নাড়ীতে হাত দিয়া দেখিলেন, একটু একটু সঞ্চালিত হইতেছে। তখন সে স্থান হইতে উঠিলেন; কমণ্ডলু পড়িয়া রহিল। বহুদুর গমন করিয়া একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষের পত্র হস্ততলে মর্দ্দন করিতে করিতে, মৃত দেহের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেইরস, বিন্দু বিন্দু করিয়া মৃতের মুখ ও চক্ষুতে দিতে লাগিলেন। মৃতদেহ সঞ্চালিত হইল; ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মচারীর অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া প্রান্তরভূমি জনতাপূর্ণ হইয়াছে। ব্রহ্মচারীর কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নাই। অনেকক্ষণ পরে জনতার দিকে দৃষ্টি করিয়া একটু দুগ্ধ প্রার্থনা করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে দুগ্ধ, জল এবং ফলমূল, মিষ্টান্ন আসিল। ব্রহ্মচারী অতি সামান্য মাত্র দুগ্ধ লইয়া একটু একটু করিয়া পথিকের মুখে দিতে লাগিলেন। পথিকের চৈতন্য হইয়াছে। জনতা মধ্য হইতে একটি লোক ভক্তিগদ্‌গদ্ হইয়া ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া কহিল—ঠাকুর! আপনি দেবতা। মৃতদেহে প্রাণদান দিলেন।

ব্রহ্মচারী—

জীবন-মরণের কর্ত্তা ভগবান্; আমি কে বাবা?

লোক—

বাবা একটু জলযোগ করিতে হইবে।

ব্রহ্মচারী—

বাবা! সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তোমরা দ্রব্যাদি রাখিয়া যাও; আমি সময় মত গ্রহণ করিব। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া একটু ভিড় ছাড়িয়া দাও।

লোক সকল নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নূতন সন্ন্যাসী।

প্রাতঃকালে বহুসংখ্যক লোক একত্র হইয়া সন্ন্যাসী দেখিতে আসিয়াছে। কেহ বাত রোগের, কেহ অম্লের, কেহ কুষ্ঠ রোগের ঔষধের জন্য আসিয়াছে। কোন রমণীর স্বামী ভাল বাসে না; কোন্ পুরুষের স্ত্রী বশীভূত নহে; তাহারা অমোঘ ঔষধি পাইবে মনে করিয়া আসিয়াছে। কেহ বা দেবতুল্য সন্ন্যাসী দেখিয়া জন্মসার্থক করিবে বলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সকলেই হতাশ হইল। দেখিল—সন্ন্যাসী নাই। পূর্ব্বদিনের খাদ্য দ্রব্য যেমন ভাবে ছিল, সেই ভাবেই আছে। সন্ন্যাসী কোন দ্রব্য স্পর্শও করেন নাই।

সন্ন্যাসী এখন একাকী নহেন। অবিকল একই প্রকারের দুইটী সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী গমন করিতেছেন। একই বেশ, একই বয়স, যেন

দুইটী যমজ ভ্রাতা সন্ন্যাসীবেশ ধারণ করিয়াছেন। একজন কহিতেছেন, "ভাই যোগেন্দ্র নারায়ণ! কে বলিবে যে তুমি আজন্ম সন্ন্যাসী নহ? তোমাকেত আর চিনিবার উপায় নাই।"

২য়—

আসল হইতে নকলের চাকচিক্য চিরকালই বেশী হইয়া থাকে।

১ম—

না ভাই! তোমার গৃহীর চিহ্ন আর কিছুই নাই।

২য়—

'*সকলি তোমার অনুগ্রহ। তুমি প্রাণদান দিয়াছ, সন্ন্যাসী সাজাইয়াছ,* নামকরণ করিয়াছ; আর যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমার কিছুতেই আপত্তি নাই।

১ম—

আর একটী কার্য্য বাকী।

২য়—

কি কার্য্য?

১ম—

আমাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কুণ্ঠিত হইলে আমি যাঁরপর নাই দুঃখিত হইব।

যোগেন্দ্রনারায়ণ। আচ্ছা তাহাই হইবে। যোগজীবন ব্রহ্মচারীর সখা যোগেন্দ্রনারায়ণ হইল। এখন চল কিছু আহারাদির চেষ্টা করা যাউক; কল্য হইতে উভয়েরই অনাহার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিধুমুখী।

রতিকান্তরায়ের পরিজন মধ্যে বিধুমুখী নাম্নী একটী নূতন পরিচারিকা নিযুক্ত হইয়াছে। তারাসুন্দরীর কার্য্যের জন্যই বিধুমুখীর আবশ্যকতা। এই জন্য বিধুমুখীকে তারার খাস চাকরাণীও বলিতে পারা যায়। পাঠক! এই বিধুমুখীর রূপ ও গুণের একটু পরিচয় দিতে হইল। তবে আমরা বাহুল্য ভয়ে তন্ন তন্ন করিয়া বর্ণনা না করিয়া ছেলেরা বিধুর নামে যে একটা গান বাঁধিয়া ছিল, সেইটীর উল্লেখ করিব মাত্র। তাহাতেই বিধু সুন্দরীর রূপ গুণের সুন্দর বর্ণনা হইবে। বিধুর বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ হইবে। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা কবিতে পারেন যে, বিধু যখন যৌবনসীমা উত্তীর্ণ হইয়া প্রৌঢ়াবস্থায় পড়িয়াছে, তখন ছেলেদের সঙ্গে তাহার বিবাদ কেন? ইহার উত্তরে এই বলিতে হয় যে, বিধুর সকলি বিপরীত। তাহার নিকট ছেলে বুড়ো বিচার নাই; গরু বাছুর, কুকুর বিড়াল বলিয়া একটা ইতরবিশেষ ভাব নাই। বিধু সকলেরই সহিত ঝগড়া করে; কলহে তাহার বড় আমোদ। আর একটা কথা এই যে, পরের ভাল সে দেখিতে পারে না। পরের ক্রুটী সে সহিতে পারে না। গরু বাছুর অজ্ঞান; কিন্তু বিধুর নিকট তাহাদের মার্জ্জনা নাই। তাহারা কোন অনিষ্ট করিলে, সে সমস্ত দিন তাহাদের গালি দিবে। কাক ডাকিলে, ঝাঁটা লইয়া মারিতে যায়। বিধু উচ্ছিষ্ট বাসন মাজিতে যাইতেছে, কুকুর বিড়াল প্রত্যাশা করিয়া আছে; বিধু উচ্ছিষ্ট অন্ন, জলে ফেলিয়া দিবে, তবু তাহাদিগকে দিবে না।

উদার হৃদয় রাজা রতিকান্ত রায়ের ফলের বাগান ছেলেদের একচেটিয়া ছিল। তাহারা কচি বেলা হইতে কুল পাড়িতেছে; থলো থলো আম ছিঁড়িতেছে; কতক খাইতেছে, কতক ফেলিয়া দিতেছে; আতা, পিয়ারা, আনারসের ত কথাই নাই। সে সকল ফল অন্যের চক্ষেই পড়িতে পায় না; পাকিবার অগ্রেই ছেলেদের গর্ভে গমন করে। রাজা মহাশয় দেখিয়াও দেখিতেন না; বরং সময়ে সময়ে নিজ হস্তে ঐ সকল ফল পাড়িয়া দিয়া, ছেলেদের সঙ্গে আমোদ করিতেন। বিধু আসিয়া অবধি সে সকল বন্ধ হইয়াছে। বিধুর গালির চোটে ছেলেরা এখন বেদখল। তাই তাহারা আক্রোশে এই গানটী বাঁধিয়াছে।

বিধুমুখি! বল দেখি এমন রূপটী কোথায় পেলে।
তোমায় উল্টো বিধি গড়ে ছিল তাইতে এমন বাহার দিলে॥
আহা! কি লাবণ্য ধন্য ধন্য কালরূপের পাকা জাম।
এমন রংয়ের বাহার দেখ্‌বো না আর আলকাত্‌রা ঢেকেছে নাম॥
তোমার ওষ্ঠাধরের কিবা শোভা হাড়গিলা হার মেনে যান।
মূলোদন্ত শোভামন্ত গজানন লজ্জা পান॥
নাকের শোভা তালতরু সেওত তত দীর্ঘ নয়।
আবার চরণপদ্ম রূপের হদ্দ খড়ম ধন্য মানে তায়॥
কোটর চ'খে কালপেঁচা, কঠোর স্বরে কাক।
তোমার রূপের ব্যাখ্যা, পরম আখ্যা কবি হয় অবাক্॥

ছেলেরা অনেকদিন এই গান বাঁধিয়াছে। কিন্তু বিধুমুখী এখনও পর্য্যন্ত তাহাদের পিতৃপুরুষের প্রশংসা করিতে ছাড়েন না।

যাহাহউক বিধুর আত্মগোপন করিবার একটী বিশেষ ক্ষমতা আছে। মনিবের নিকট যেন বিধু, সে বিধু নহেন। বিধু রায় মহাশয়কে দেখিলে সাত হাত ঘোম্‌টা টানেন। তখন কোণের কুলবধূর অপেক্ষাও বিধুর

লজ্জা বেশী। তারাসুন্দরীর নিকট বিধুর ভক্তি, ভালবাসা এবং নম্রতার সীমা নাই। মায়াবিনী বিধুমুখী এইরূপ মায়াজাল বিস্তার করিয়া, রায়-পরিবারের বিশ্বাস ও ভালবাসা লাভ করিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরম হংস পরমানন্দ স্বামী।

প্রয়াগ তীর্থ রাজের নিম্নভাগে ভরদ্বাজ আশ্রমের সন্নিকটে গঙ্গা যমুনার অপূর্ব্ব সঙ্গম। একদিকে রজত ধবলাকার ভাগীরথীর উত্তাল তরঙ্গমালা; অপর দিকে কৃষ্ণকান্তি, মেঘবর্ণ যমুনার উর্ম্মিরাজি। সে হরিহর সম্মিলনের অপূর্ব্বশোভা দর্শনে মন মোহিত হয়। লীলাময়ী ভাগীরথী খেলিতেছেন, নাচিতেছেন, ধীরে বহিতেছেন; আবার তখনি তরঙ্গবিস্তার করিয়া যমুনার উপরি পতিতা হইতেছেন। যমুনা হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে দ্বিগুণ বিক্রমে ভাগীরথীর উপর পড়িয়া পূর্ব্বের আক্রোশ পরিশোধ করিতেছেন। তরঙ্গিণীযুগলের এই ক্রীড়াভূমি অতিক্রম করিয়া অনতিদূরে ঝুসি নামক একটী ক্ষুদ্র পাহাড়। প্রয়াগের অতি সন্নিকট হইলেও ঝুসি নীরব, নিস্তব্ধ এবং নির্জ্জন। যেন নিদ্রিত ঝুসি সুরতরঙ্গিণীর অভয় ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া, অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষগণের আগমনে ঝুসি জাগ্রৎ হয়; কিন্তু সে জাগরণও মহাত্মাগণের শিষ্য এবং অনুশিষ্যগণের জন্য। নতুবা মহাপুরুষগণের আগমন অনাগমন সমান কথা। সে অটল অচল হিমগিরি সদৃশ পুরুষ-

দিগের চাঞ্চল্য নাই ; আড়ম্বর নাই ; এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই বলিলেই হয়। সেই জন্য মহাপুরুষগণের আগমনে ঝুসি জাগরিত হয় না। যাঁহারা সদা জাগরিত, তাঁহাদের আগমনে ঝুসি জাগ্রৎ হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য।

আজ মহাপুরুষ পরমানন্দ স্বামী পরমহংস দেব ঝুসি পাহাড়ে পদার্পণ করিয়াছেন। ঝুসি আজ পবিত্র। স্বামিজী হিমালয়ের গিরিগুহাতেই প্রায়শই অবস্থান করেন। তবে শিষ্যমণ্ডলী এবং ভক্তবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন জন্য সময়ে সময়ে নিম্নতলে অবতরণ করিয়া থাকেন। স্বামিজীর প্রভার সীমা নাই। ঝুসিতে আসিলে আকবর বাদসাহ কথন কথন ছদ্মবেশে তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। সাহজাদা সেলিমসাহা ও আমির ওমরাহগণের মধ্যে অনেকেই আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য স্বার্থ। স্বামিজীর নিকট সকলেরই অভীষ্টলাভ হয়। তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদ, সাংখ্য, পাতঞ্জল ইত্যাদি সর্ব্বশাস্ত্রের মহামহাপণ্ডিত বিদ্যমান্। তাঁহারা যাহা বলেন এবং যাহা মীমাংসা করিয়া দেন, তাহা অকাট্য।

অরণ্য আবৃত ঝুসির প্রান্তভাগে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ তলে দিগম্বর সন্ন্যাসী পরমহংস পরমানন্দস্বামী উপবিষ্ট। দূরে, অদূরে জাহ্নবীতটে শিষ্য, প্রশিষ্যগণ অজিন, কম্বল প্রভৃতি বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন।

আজকাল স্বামিজীর কতকগুলি গোঁড়া জুটিয়াছেন। ইঁহারাও সন্ন্যাসী। তবে ইঁহারা কিছু আড়ম্বরপ্রিয়। কেহ হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেছেন ; কেহ পাঁচ হাজার সন্ন্যাসীর ডাল রুটীর বন্দোবস্ত করিতেছেন ; কেহ দেউল দিতেছেন ; কেহ কূপ খনন করাইতেছেন ; কেহ পুষ্করিণী কাটাইতেছেন। ঐ সকল কার্য্য সাধারণ হইতে সংগৃহীত অর্থে সম্পাদিত হয়। কথন কথন এক বা দুই জন সঙ্গতিপন্নলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া

ঐ সকল কার্য্যের ভারগ্রহণ করে। লোকে ধন্য ধন্য করে, আর বলিয়া থাকে—যে, এমন নিঃস্বার্থ দান দেখা যায় না। আমরা কিন্তু ইহার মধ্যে স্বার্থশূন্যতা দেখিতে পাই না। ইহকালের প্রশংসা এবং পরকালের স্বর্গলাভ আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ এই সকল কার্য্য মধ্যে ষোল আনা স্বার্থ দেখিয়া, কি করিয়া বলিব যে, ইহাদের এই কার্য্য স্বার্থশূন্য? যাহা হউক, এই ঘোর ধর্ম্মাভিমানী সাধু সকল স্বামিজীকে কামনাশূন্য এবং বাসনাবিবর্জ্জিত দেখিয়া, জড়বুদ্ধি বলিয়া উপহাস ও ঘৃণা করিত। কিন্তু বাদসাহের গমনাগমন শ্রবণাবধি ইহাদের সে ভাব দূর হইয়াছে। এখন এই সকল সাধু আসিয়া শতমুখে স্বামিজীর প্রশংসা করিয়া থাকে। তাহারা স্বামীকে ঈশ্বরের অবতার বা ঈশ্বর পর্য্যন্ত বলিতেও কুণ্ঠিত হয় না। যাঁহার নিকট প্রশংসা ও নিন্দা সমান, তিনি ঐ সকল প্রশংসা শুনিয়া হাস্য করিয়া উড়াইয়া দেন। যিনি বিষ্ঠা চন্দন সমান জ্ঞান করেন, তিনি হাস্য ভিন্ন আর কি করিবেন?

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আকবর বাদসাহের আগমনে স্বামিজী প্রশ্রয় দেন কেন? নিবারণ করিলে ত করিতে পাবেন। তাহাতেও স্বামিজী হাস্য করেন। আকবরেব আগমন এবং অনাগমনে তাঁহার কি? আকবর আসিয়া যদি তৃপ্তিলাভ করেন, আসুন। নিবারণ করিয়া তাঁহার মনে ক্লেশ দিবেন কেন? তিনি ঐশ্বর্য্যশালী বাদসাহ বলিয়া স্বামীর ঐশ্বর্য্যলালসা বৃদ্ধি হইবে? সে সাধ্য আকবরের নাই। ফলতঃ স্বামিজীর নিকট সকলেরই অবারিত দ্বার। আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত সন্ন্যাসীদ্বয় স্বামিজীর আগমনসংবাদ শ্রবণ করিয়া, ঝুসিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা স্বামীর নিকট আসিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

স্বামী—

বৎস! যোগজীবন আসিয়াছ? এত বিলম্ব কেন বাবা!

যোগজীবন—

দেব! আজকাল বঙ্গবিহার উড়িষ্যার এক প্রকার অরাজক অবস্থা, এইজন্য সেইস্থানে যাতায়াত বড় বিপদসংকুল।

স্বামী—

সন্ন্যাসীর আবার বিপদ কিরে বেটা!

যোগজীবন—

বিপদ সন্ন্যাসীর নহে বটে; বিপদ গৃহীর। কিন্তু যবনের নিকট গৃহী সন্ন্যাসী বলিয়া কোন বিচার নাই।

স্বামী—

সে প্রদেশের লোক কোন প্রতিকার চেষ্টা করে না কেন?

যোগ—

বাবা! তাহারা এখন মোগলপক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুনিলাম মোগল আহ্বানে দূত প্রেরিত হইয়াছে।

স্বামী—

এইবার বোধ হয় তাহারা সুখী হইবে।

যোগ—

গুরুদেব! একভস্ম আর ছার দোষগুণ কব কার" আমার মতে পাঠান মোগলে বড় বেশী ইতর-বিশেষ নাই।

স্বামী—

তবে উপস্থিত ক্ষেত্রে কিছু উপকারের সম্ভাবনা আছে। তোমার সমভিব্যাহারী এ যুবকটী কে?

যোগ—

এটী আমার সহোদরস্থানীয়। সন্ন্যাসী নহে।

স্বামী—

সন্ন্যাসীর সজ্জা কেন?

যোগ—

বিপদের আশঙ্কায় আমি ইঁহাকে সন্ন্যাসী সাজাইয়াছি। বলিয়া—আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন।

স্বামী—

যদি বৈষয়িক উন্নতির বাঞ্ছা থাকে, তবে আকবর সাহাকে বলিয়া দিব।

যোগ—

প্রভো! আকবর সাহাকে বলিতে হইবে কেন? তাঁহার সভাসদ্ প্রায় সকলেই আপনার চরণধূলাপ্রয়াসী হইয়া আসিয়া থাকেন, তাঁহাদের কোন ব্যক্তিকে বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

স্বামী—

তাহাই হইবে। তোমরা আহারাদি করিয়া বিশ্রাম কর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সমরেন্দ্রনারায়ণ।

আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত নবীন সন্ন্যাসী এখন সমরেন্দ্রনারায়ণ নামে পরিচিত। স্বামিজী, বাদসাহের পরমপ্রিয়পাত্র রাজা বিক্রমজিৎসিংহকে যোগেন্দ্রনারায়ণের জন্য অনুরোধ করেন। স্বামীর অনুরোধে বিক্রমজিৎ

তাঁহাকে লইয়া বাদসাহের সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। সেখানে উত্তমরূপ শিক্ষালাভ হইলে রাজা তাঁহাকে সম্রাটের উর্দ্দু ও পারসী দপ্তরে শিক্ষানবিস রাখিয়া দিলেন। ইহা ভিন্ন পারস্য ও আরব্য ভাষায় যাহাতে রীতিমত জ্ঞান হয়, উপযুক্ত মৌলভি রাখিয়া তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। যোগেন্দ্রনারায়ণ যখন সামরিক শিক্ষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন, তখন রাজা বিক্রমজিৎ স্বামিজীর অনুমতি লইয়া তাঁহার যোগেন্দ্রনারায়ণ নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, সমরেন্দ্রনারায়ণ নাম রাখিলেন। অবস্থার উপযুক্ত নাম হইল।

বাদসাহ-দরবারে লক্ষ্যভেদের পরীক্ষা হইতেছে। বাদসাহের সখের সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সমবেত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন সেনাপতি, মনসব্দার, হাওলদার প্রভৃতি উচ্চ-নীচ সকল প্রকার সামরিক কর্ম্মচারী উপস্থিত। বাদসাহ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া স্বয়ং উপস্থিত আছেন।

একটি মোমের মক্ষিকা এক খানি কাচনির্ম্মিত দর্পণে রক্ষিত হইয়াছে; মক্ষিকাটী ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র; দূর হইতে অতি কষ্টে দৃষ্ট হয়।

ঘোষণা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি অদ্য এই লক্ষ্য ভেদ কবিতে পারিবে অর্থাৎ দর্পণস্থিত মোমনির্ম্মিত মক্ষিকার মস্তক তীরবিদ্ধ করিবে, তাহাকে তুই হাজাবী মনসব্দারী পদে নিযুক্ত করা যাইবে এবং বাদসাহের পাঞ্জা-স্বাক্ষরিত একখানি প্রশংসাপত্র প্রদত্ত হইবে। মনসব্দারগণেব মধ্যে কেহ বিদ্ধ করিলে তদপেক্ষা উচ্চপদ প্রাপ্ত হইবে। উক্ত ঘোষণায় ইহাও বিদিত করান হইয়াছে যে, উপরোক্ত মাছির মস্তক বিদ্ধ করিতে যেন দর্পণ খানি অক্ষুণ্ণ থাকে; দর্পণ অক্ষত না থাকিলে লক্ষ্য ভেদের পূর্ণতা সাধন হইবে না। বাদসাহজাদারাও পরীক্ষার্থী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন।

অনেক বাদানুবাদের পর উচ্চশ্রেণী হইতে পরীক্ষা আরম্ভ করাই স্থির

হইল। তোডর্ম্মল্ল, বিক্রমজিৎ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সেনাপতিগণ মধ্যস্থ নিযুক্ত হইলেন।

সর্ব্বাগ্রে সাহাজাদা মোরাদ, তৎপরে সুলতান দেনিয়েল এবং পর পর দুই একটী বাদসাহের নিকটআত্মীয় কুমারগণ চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা ব্যর্থ হইল। পরে সেনাপতিগণ। তাঁহারাও অকৃতকার্য্য হইলেন। তখন সকলেরই আতঙ্ক উপস্থিত হইল। আর কেহ অগ্রসর হইতে স্বীকার করে না। সম্রাটের আদেশ অনুসারে সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অগ্রসর হইল; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া ধনুক ধরিতে চাহে না। একটী খোরাসানী ছাত্র সদর্পে ধনুক ধারণ করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিল। মক্ষিকা অক্ষত রহিল; দর্পণ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। ছাত্র অধোবদন, সভাস্থ লোক চমৎকৃত, সম্রাট্ নীরব। পুনর্ব্বার নূতন দর্পণে মক্ষিকা স্থাপিত হইল। কিন্তু লক্ষ্য ভেদ করিবার লোক নাই। ছাত্রগণ পলায়নের পথ দেখিতেছে; সেনা, সেনাপতি প্রভৃতি সকলেই ভীত এবং চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বিক্রমজিৎ ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন—সমরেন্দ্র সুদূরে দণ্ডায়মান আছেন। রাজার ইঙ্গিতে সমরেন্দ্র নিকটে আসিলেন। বিক্রমজিৎ অনুচ্চস্বরে কহিলেন—বৎস' দরবারের সম্মান রক্ষা কর। অদ্যকার এই লক্ষ্যবিদ্ধ ব্যাপারে তুমি ভিন্ন আর কেহই সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। সমরেন্দ্র রাজার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইলেন এবং আকর্ণবিস্তৃতনয়ন বিস্তারপূর্ব্বক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মক্ষিকাটী দেখিয়া লইলেন। একবার, 'দুইবার, তিনবার দেখিলেন। বাণ ছুটিল; ক্ষুদ্র মক্ষিকার মস্তক ভেদ করিয়া বাণ ভূতলে পতিত হইল; দর্পণ অক্ষত রহিল।

সভাস্থলে ধন্য ধন্য ধ্বনি উঠিল। মধ্যস্থগণ দর্পণের নিকটস্থ হইলেন।

দে᾽ কার মস্তক বিদ্ধ হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মতভেদ
েল। তোডর্ম্মল্ল কহিলেন—"মক্ষিকার মস্তক সুন্দররূপে বিদ্ধ
।" খানখানম্ মৃজারস্তম্ কহিলেন—"আমার সন্দেহ হইতেছে।"
.জিৎ কহিলেন—"মৃজাসাহেব! এ সূক্ষ্ম বিষয়ের মীমাংসায় আমাদের
.ত ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধদিগের মধ্যস্থতা না করাই ভাল।" মৃজাসাহেব সে
কথার কোন উত্তর দিলেন না।

যে স্থলে সাহাজাদাগণ হতমান হইয়াছেন, সেনানীগণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, সেস্থলে যে, সকলে এক মত হইবে,ইহা সম্ভবপর নহে। এ জগতে যদি সর্ব্বত্রই নিরপেক্ষতা দৃষ্ট হইত, তাহা হইলে জগৎ স্বর্গপুরী হইত। কিন্তু সেরূপ সত্যপরায়ণ কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়! অধিকাংশ লোকেই উচ্চের জয় গাহিয়া থাকে। এখানেও তাহাই হইল। রাজা তোডর্ম্মল্ল, বিক্রমজিৎ, লালবেগ বা বেজ বাহাদুর, বিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন; কিন্তু আসরফি আকবর, এজফ খাঁ,আবদররহমান, মহম্মদখাঁ, রায়দুর্গা প্রভৃতি ওমরাহগণ স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন—"মক্ষিকা বিদ্ধ হয় নাই।" পাহাড়খাঁ (মানসিংহের খুল্লতাত) প্রথমে দেখিয়াই কহিলেন, "হাঁ বিদ্ধ হইয়াছে।" কিন্তু যখনই শুনিলেন যে, সাজাদাগণ যাহা বিদ্ধ কবিতে পারেন নাই, তাহাই একটী সামান্য যুবক বিদ্ধ করিয়াছে, তখনই মত পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। তোডর্ম্মল্ল কহিলেন—"পাহাড়খাঁ জয়কেতে; সে ওরূপ করিবে, তাহা আমি জানি।"

বাদসাহ আমিরউলওমরার প্রতি ভার দিলেন। অধিকন্তু বলিয়া দিলেন—'রাজা তোডর্ম্মল্ল ও বিক্রমজিতের উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে'। আমিরউলওমরার মীমাংসায় সমরেন্দ্রের জয় নির্দ্ধারিত হইল। তিনি কহিলেন—"মক্ষিকার মস্তক সুন্দররূপে বিদ্ধ হইয়াছে।" সভাস্থলে আবার উচ্চধ্বনি উঠিল। সকলে সমস্বরে সমরেন্দ্রের জয় ঘোষণা করিতে

লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই আনন্দে সাজাদাগণও যোগ দিতে বিরত হইলেন না। উচ্চবংশের মহৎগুণ এই যে, তাঁহারা কখন পরের অভ্যুদয়ে কাতর হন না; বরং সন্তোষ প্রকাশই করিয়া থাকেন। বিরুদ্ধবাদীগণ মর্ম্মাহত হইল। সভাস্থলে নকীব উঠিয়া উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিয়া কহিল—দিন দুনিয়ার মালিক সাহান্ সাহা, অদ্য লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার পুরস্কারস্বরূপ সমরেন্দ্রনারায়ণকে দুইহাজারী মনসব্দারীর পরিবর্ত্তে পাঁচ হাজারী মনসব্দারী পদে নিযুক্ত কবিলেন। সমরেন্দ্র কুর্ণিশ করিতে করিতে বাদসাহ সমীপে উপস্থিত হইয়া জানু অবনত করিয়া রহিলেন।

বাদসাহ—

যুবক! আমি তোমার অদ্যকার কার্য্যে বড়ই সন্তোষলাভ করিয়াছি। তুমি হিন্দুস্থানের কোন্ প্রদেশ উজ্জ্বল করিয়াছ?

সমরেন্দ্র—

দিন দুনিয়ার মালিক শাহান্সাহার অধীন নহে, এমন প্রদেশ নফর অবগত নহে। নফর বাদসাহের খাস জায়গীরের প্রজা।

বাদসাহ অতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিলেন—ফারসী, আরবী ভাষায় দখল কি প্রকার?

সমরেন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন—শাহান্সাহের কৃপায় যৎকিঞ্চিৎ দখল আছে। ইহা শুনিয়া বাদসাহ ফারসী হইতে দুই একটী সমস্যা পূর্ণ বয়েদ অর্থ করিতে বলিলেন। সমরেন্দ্র ঐ সকল বয়েদের উত্তমরূপ ব্যাখ্যা কবিলেন। সম্রাট্ যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া আরবী লিখিত কোরাণ আনয়ন করিবার আদেশ করিলেন। কোরাণ আনীত হইলে বাদসাহ কহিলেন—এই কোরাণের আবৃত্তি কর। এই আবৃত্তিতে তোমার আরবী ভাষার ব্যুৎপত্তি বুঝিতে পারিব। তোমায় আদেশ করিতেছি না; কোরাণ পাঠে আপত্তি থাকিলে অসন্তুষ্ট হইব না। সমরেন্দ্রনারায়ণ ঈশ্বর

উদ্দেশে প্রণাম করিয়া,কোরাণ গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন—জাঁহাপনা! কোরাণ ধর্ম্মপুস্তক। গোলাম গোঁড়া হিন্দু হইলেও ধর্ম্মপুস্তকের আবৃত্তি করিতে আপত্তি করিবে কেন? ধর্ম্মপুস্তকের অবমাননা করিলে নফরের পাপ-স্পর্শ হইবে। আকবরবাদসাহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারমতাবলম্বী ছিলেন। তিনি সমরেন্দ্রের এই উদারতায় অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—যুবক! যদি কখন কোন বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তবে এই অঙ্গুরী পাঠাইলেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে। বলিয়া—অঙ্গুলি হইতে একটী বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরী উন্মোচন করিয়া সমরেন্দ্রকে প্রদান করিলেন। সমরেন্দ্র সসম্মানে কুর্ণিশ করিতে করিতে অঙ্গুরী গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। পরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিতে পরিধান করিয়া পুনর্ব্বার কুর্ণিশ করিলেন।

সম্রাট্ সমরেন্দ্রের সভ্যতা, আদবকায়দা এবং বিনয়নম্রতা দেখিয়া রাজা বিক্রমজিৎকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—এ অমূল্য রত্নটী কোথায় পাইলে সেনাপতি!

বিক্রমজিৎ কহিলেন—জাঁহাপনা! স্বামী পরমানন্দ পরমহংসদেব এ রত্নটী অধীনকে প্রদান করিয়াছেন। নফর ইহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেছে।

বাদসাহ স্বামিজীর নাম শ্রবণ করিয়া, উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিলেন—মহাপুরুষের সংস্পৃষ্ট সকল পদার্থই উৎকৃষ্ট। রাজা তোডর্ম্মল্ল একটু রসিকতা করিবার জন্য বিক্রমজিৎকে কহিলেন—রাজা! এই যুবক তোমার পুত্রস্থানীয় হইলে, আমার কে হইল? বিক্রমজিৎ কহিলেন, তোমারও পুত্র হইল। সভাস্থ সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

তোডর্ম্মল্ল বৃদ্ধ রাজাকে সম্মান করিয়া থাকেন, সুতরাং অপ্রতিভ হইলেও অনুচ্চস্বরে নামাকুল বলিয়া সকলের হাস্যে যোগ দিলেন। বলা বাহুল্য, রাজা বিক্রমজিৎসিংহ তোডর্ম্মল্লের ভগিনীপতি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নিমক-হারামী।

রতিকান্ত রায়ের বজরা পাটনা পার হইয়া গেল। পাটনার ফৌজদার বাদসাহের ছাড়পত্র দেখিয়া আদর অভ্যর্থনার ত্রুটী করিলেন না। রতিকান্ত রায়ের যে স্থানে বিশ্রাম করিবার অভিলাষ হইত, সেই স্থানের ফৌজদারকে সম্বাদ দিতেন। ফৌজদার সাহেব লোকজন এবং তাঁবু প্রভৃতির সরবরাহ করিয়া, যথেষ্ট সাহায্য করিতেন।

আজ কাণপুরের নিকটে রাজা রতিকান্তের তাঁবু পড়িয়াছে। সমস্ত দিবস আহার হয় নাই। রাত্রিতে আহার ও বিশ্রাম করিবার জন্য সংবাদ মতে ফৌজদারের লোক আসিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছে।

বজরা হইতে লোক সকল তাঁবুতে আশ্রয় লইয়াছে। অনেকেই ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। বিধুমুখী দাসী একবার এ তাঁবু, একবার সে তাঁবু করিয়া বেড়াইতেছে। তারা নিদ্রিতা; সুতরাং বিধুর বিরাম।

বশুই ব্রাহ্মণ নন্দলাল ডাকিল—বিধুমুখি! বড় ব্যস্ত দেখিতেছি যে? বলি আজকাল ডুমুরের ফুল হয়েছ নাকি?

বিধুমুখি পুরুষের আদর বড় ভাল বাসিত। কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ কর্কশতার প্রভাবে সে এরূপ আদরের এমনি উত্তর দিত যে, আদরকারী গাত্র-জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকিত।

বিধু—

ডুমুরের ফুল হই আর যাহাই হই, আমিই আছি; আঁটকুড়ির ব্যাটাদের তাহাতে কি?

নন্দলাল অগ্নি অবতার হইয়া কহিল—কি ছোটমুখে বড় কথা ? হাড় গুঁড়ো করে দিব জানিস্ না। বিধু রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে নন্দলালের চতুর্দ্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধ সপিণ্ডন শেষ করিতে লাগিল।

নন্দলাল দেখিল, আর বাড়াবাড়ী করিতে গেলে, কথা মণিবের কাণে উঠিবে, সুতরাং গায়ের রাগ গায়ে মাখিয়া সে চুপ করিয়া গেল। বিধু গালি দিতে দিতে চলিয়াছে, এমন সময়ে সীতারাম সিপাহী ডাকিল—বিধু ! ও বিধু ! বিধুর আর আনন্দ ধরে না।

এই সীতারামকে বিধু অন্তরের সহিত ভাল বাসিত। সীতারাম বিধু অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট হইলেও বিধাতার নির্ব্বন্ধে উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মিয়াছে। কিন্তু সীতারাম বড় মুখচোরা। সে কখন সাহস করিয়া বিধুর নিকট কোন প্রস্তাব করিতে বা বিধুকে কোন পরামর্শ দিতে পারে না। বিধু যাহা বলে তাহাই শুনে। সীতারাম আজ একটী কথা বলিবে বলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বিধুর গরম মেজাজ্ দেখিয়া বলিতে সাহস করিতেছে না। পরে অনেক কষ্টে মনের কথা বলিল।

বিধু কহিল—"কি বলিলে ? বিশ্বাসঘাতকতা ? মণিবের সর্ব্বনাশ ! সে হ'বে না"।

সীতারাম বড় মুস্কিলে পড়িল। বিধুকে বুঝায় এমন সাধ্য তাহার নাই। অনেক কষ্টে বলিল—"বড় মানুষ, একবারে বড় মানুষ ; আর চাক্‌রী করিতে হবে না"।

এইবার বিধু একটু ভাবিল ; পরে বলিল—আচ্ছা বিবেচনা করিয়া দেখি।

আজ সীতারামের মুখ খুলিয়া গিয়াছে ; সে বলিল ভাবিবার আর সময় নাই। আজই করিতে হইবে। আগ্‌রা নিকট হইয়া আসিল। আজ না হলে আর হবে না। দেখ—এই কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে করিয়া দিতে

পারিলে, আমরা আর দেশে ফিরিব না ; এই দেশের একটা গ্রামে, জমি জমা খরিদ করিয়া মান্য গণ্য হইয়া থাকিতে পারিব। সকলে জানিবে—তুমি আমার বিবাহিতা পত্নী। ইহা হইতে সুখের বিষয় আর কি আছে” ?

বিধু এ প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল—“আজই হইবে। কত রাত্রির সময় বলিয়াছ” ?

সীতারাম বলিল—“রাত্রি দুই প্রহরের পর বলিয়াছি”।

“তাহাই হইবে” বলিয়া—বিধু যাইতে উদ্যত হইল। সীতারাম বলিল—“একটু দাঁড়াও ; ভাল করিয়া শুনিয়া লও ; তাঁবুর দরজা আল্‌গা করিয়া রাখিও, যেন হাত দিবামাত্র খুলিয়া যায়। অতি সাবধানে এবং নিঃশব্দে কার্য্য করিতে হইবে ; ঘুণাক্ষরেও যেন কেহ কিছু জানিতে না পারে”।

রাত্রি এক প্রহরের পর সীতারাম আর একবার বিধুর সন্ধানে আসিল। বিধুর কোন সাড়াশব্দ নাই দেখিয়া তাহাদের উভয়ের অভ্যস্ত সঙ্কেত শব্দ করিল। বিধু তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিল—“আবার কেন ? এখনও ত সময় হয় নাই”।

সীতারাম বলিল—“সব ঠিক আছে ত” ? বিধু বলিল—“হাঁ সব ঠিক আছে”। এই বলিয়া—টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিল।

সীতারাম বিধুর নিকট জড়বৎ হইয়া যাইত। সে টাকার কথা অস্বীকার করিতে পারিল না ; বলিল—“কতক টাকা পাইয়াছি ; অবশিষ্ট টাকা কার্য্য শেষ হইবার সময় দিবে”।

“টাকাগুলি দাও দেখি,” বলিয়া—বিধু অঞ্চল পাতিয়া রহিল। সীতারাম সমস্ত টাকা ও মোহর বিধুর অঞ্চলে প্রদান করিল। তখন

বিধু সীতারামকে যাইতে বলিল। আর বলিল—"দেখো যেন ঠকায় না, বক্রী টাকা লইতে ছাড়িও না"। সীতারাম "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় দুইটী লোক কাল রংয়ের পোষাক পরিয়া অন্ধকারে মিশিয়া আসিতেছে। এক এক বার আসিতেছে, আর দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক্ দেখিতেছে। তাহাদের সে সচকিত ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, নিশ্চয়ই তাহাদের কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। লোক দুইটী শিবির দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। শিবির দ্বারে একটীমাত্র প্রহরী, আর আলোকেরও তেমন উজ্জ্বলতা নাই। এক রাত্রির জন্য বিশ্রাম বলিয়া, ফৌজদার সাহেবেরও তত সুব্যবস্থা নাই।

রতিকান্ত রায় মহাশয়েরও তত আড়ম্বর নাই। যাহা হইয়াছে তাহাই বেশ। সেই জন্য আলোকের এই প্রকার অবস্থা। লোক দুইটী শিবিরের অতি নিকটেই আসিল। প্রহরী দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে। থাকুক, তাহাতে ভয় কি ? ও যে সীতারাম। উহার মুখ বন্ধ হইয়াছে।

রাত্রি ঘোর অন্ধকারময় ; অতএব অন্য তাঁবুর প্রহরীর দেখিবার কোন সম্ভাবনা নাই। দস্যুদ্বয় সীতারামের সহিত কি পরামর্শ করিয়া শিবিরে প্রবেশ করিল। শিবিরে প্রবেশ করিয়াই, তারার পর্য্যঙ্কের নিকট গেল। তাহারা এরূপ সিদ্ধহস্ত এবং চতুর যে, সীতারামের নিকট শুনিয়া শুনিয়া গৃহের কোথায় কি আছে, সমস্তই ঠিক করিয়া লইয়াছে। তারা নিদ্রায় বিঘোরা।

বিধু আসিয়া চুপি চুপি বলিল—তোমরা নির্ভয়ে লইয়া যাও। যে ঔষধির আঘ্রাণ করাইয়াছি, তাহাতে রাত্রির মধ্যে কোন মতে নিদ্রাভঙ্গ হইবে না। দস্যুদ্বয় বিরক্তি এবং শ্লেষের সহিত কহিল—"তুমিত নিমকের কার্য্য উত্তমরূপে সুসিদ্ধ করিয়াছ ; এক্ষণে আমাদের কার্য্য করিতে দাও

আমাদিগকে কোন উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া তাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। দেখিতে দেখিতে আরও পাঁচ ছয় জন দস্যু শিবিরে প্রবেশ করিল। পর্য্যঙ্কসহিত তারাসুন্দরী মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্যা হইল।

হা পাপীয়সি বিধুমুখি! কি করিলি! অর্থ লোভে অনায়াসে প্রভু-কন্যাকে দস্যু হস্তে তুলিয়া দিলি!

হা অনর্থকারী অর্থ! তোমার জন্য লোকে না করিতেছে কি? তোমার জন্য নরহত্যা, নারীহত্যা, আঘাত, অত্যাচার প্রভৃতির স্রোতঃ বহিতেছে; তোমার জন্য ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনান্তর হইতেছে; রাজায় রাজায় মনোমালিন্য ঘটিতেছে। তোমার জন্য মানহানি, জ্ঞানহানি, সম্পত্তিহানি হইতেছে। তোমার জন্য বংশনাশ, রাজ্যনাশ এবং বনবাস পর্য্যন্ত ঘটিতেছে। আজি তোমারই জন্য উমাশঙ্করের সর্ব্বস্বধন, বিজয়কুমারের আশাভরসা তারারত্ন অপহৃতা হইল।

হা উমাশঙ্কর! এ নিদারুণ সংবাদে তোমার কি অবস্থা হইবে জানি না। হা দেবি শৈলজাসুন্দরি! তোমার একমাত্র অবলম্বন তারাসুন্দরী আজ দস্যুহস্তে পতিতা হইল; না জানি তাহারা তাহাকে কোথায় এবং কি অবস্থায় রাখিবে?

হা বিজয়কুমার! যে রত্ন কণ্ঠে ধারণ করিয়া তুমি সর্ব্বসুখে সুখী হইয়াছিলে, যাহার আশা ভরসায় তুমি কোন দুঃখ যাতনায় কাতর হও নাই, আজ তোমার সেই ভাবী সুখের আশাদীপ নির্ব্বাণ হইতে চলিল। হা রতিকান্ত রায়! তুমি সর্ব্বত্যাগী কর্ম্মযোগী হইয়া কি বিষম বিভ্রাটে পতিত হইলে? উমাশঙ্করের স্থাপিত ধন তোমার নিকট হইতে লইয়া চলিল। এ মর্ম্মবেদনা তোমায় বড় লাগিবে। শ্যামা অপহৃতা হইলে তুমি বিচলিত হও নাই; কিন্তু এবারে চিত্তসংযম করা কঠিন হইবে। মাতার আনন্দদায়িনী, পিতার আদরিণী, স্বামী সোহাগিনী তারাসুন্দরী অপহৃতা

হইল! রতিকান্ত হরসুন্দরীর অভিন্ন তনয়া, শ্যামার সখী, শশীর শিষ্যা। তারা দস্যুকরে পতিতা হইল। কেহই রাখিতে পারিল না; কেহই রাখিতে চেষ্টা করিল না; কেহই জানিতে পারিল না। সৌভাগ্যক্রোড়ে লালিতা তারা, কি করিয়া স্বজন বিচ্ছিন্না হইয়া থাকিবে? কিন্তু তাই বলিয়া কি হইবে? যাহা হইবার তাহা হইবেই হইবে। কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। তাহা যদি পারিত, তবে রামচন্দ্রের বনগমন হইত না। রামের বনগমনে দশরথের প্রাণনাশ হইত না; রাবণের সর্ব্বনাশ ঘটিত না; সাধ্বাসতী সীতা সতা চিরদুঃখিনী হইতেন না; কৈকেয়ীর অনন্ত যাতনা ঘটিত না। ভবিতব্য অখণ্ডনীয়।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চিতোর আক্রমণ।

উদয়পুর, জয়পুর, যোধপুর, বিকানিয়র, আলবর, প্রতাপগড় প্রভৃতি চতুর্দ্দশটী প্রদেশ লইয়া রাজপুতানা পরিগণিত। রাজপুতানার মধ্যে উদয়পুর (মিবার) আবার সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। মিবারের অধিপতি মহারাণা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বাবর বাদসাহের সময় হইতে রাজপুতানার রাজন্যবর্গকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন বাদসাহ সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রাজপুতানার কোন কোন নৃপতি সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলেও, মিবারের রাজধানী চিতোর নগর এ পর্য্যন্ত উন্নতমস্তকে উদয়পুরের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছে। আকবর সাহা দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন। রাজপুতানা তাঁহার লক্ষ্য।

দিল্লীর এত নিকটবর্ত্তী রাজপুতানার নৃপতিবর্গ শৌর্য্য-বীর্য্য এবং স্বাধীনতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার দিল্লীশ্বরোহবা জগদীশ্বরোহবা নামে টিট্‌কারী প্রদান করিবে, ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি ছল, বল, কৌশল অবলম্বন করিয়া নৃপতিবর্গকে হস্তগত করিতে লাগিলেন। ঐশ্বর্য্যলোভে অনেক রাজা, বাদসাহপদে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

অম্বর (জয়পুর) মারবার (যোধপুর) প্রভৃতি প্রদেশের রাজারা আক্‌বর-করে দুহিতা অর্পণ করিয়া প্রচুর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। কথিত আছে যে, যোধপুরপতি স্বীয় তনয়া যোধাবাইকে আক্‌বর-করে প্রদান করিয়া চল্লিশ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছে। মিবারপতি এই জন্য ঐ সকল রাজার সহিত আদান প্রদান এবং আহার বিহার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে রাণার প্রতি আক্‌বরের আক্রোশ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

চিতোর আক্রান্ত হইয়াছে। সম্রাট্ স্বদলে পরিখা পার হইয়া চিতোরের প্রাচীর তলে আগমন করিয়াছেন। সমরেন্দ্রনারায়ণ এই যুদ্ধে সেনাপতি রাজা বিক্রমজিতের অধীনে পঞ্চ হাজারী মনসব্‌দার। তিনি সেনাপতি বিক্রমজিতের বড় প্রিয়পাত্র। রাজা তোডর্ম্মল্লও তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সমরেন্দ্র যুদ্ধে আসিয়াছেন বটে, কিন্তু মনের বড় প্রসন্নতা নাই। হিন্দু হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা তাঁহার বড় ভাল লাগিতেছে না। সমরেন্দ্র যোদ্ধৃবেশ পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ রাজপুতের বেশে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চতুর্ভুজার মূর্ত্তি দেখিতে বড় অভিলাষ হইয়াছে। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটী দীর্ঘাকার ব্রাহ্মণ অনন্যমনে একখানি পুরাতন গ্রন্থে মনোনিবেশ করিয়া আছেন। সমরেন্দ্র ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া ভক্তিভাবে দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ একবার সমরেন্দ্রের দিকে দৃষ্টি করিয়া গ্রন্থপাঠে নিরত হইলেন। সমরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কি এই মন্দিরের পুরোহিত? ব্রাহ্মণ বিরক্তির সহিত বলিলেন, হুঁ; কিন্তু পুস্তক হইতে চক্ষুঃ অপসারিত করিলেন না। সমরেন্দ্র মনে করিলেন, লোভী ব্রাহ্মণ কিছু প্রণামী না দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছে। অতএব অঙ্গবস্ত্র হইতে দুইটী রজত মুদ্রা বাহির করিয়া, ব্রাহ্মণের নিকট ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

সন্তুষ্ট হইয়া বারম্বার আশীর্ব্বাদ করিতে

টু রহস্য করিবার ইচ্ছা হইল। বলিলেন—আপনার
পুস্তক? ব্রাহ্মণ কহিলেন, এখানি কুলতন্ত্র্যধিধীতি।
ণের ভাবে ব্রাহ্মণের মূর্খতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল।

কথাটী বলিলেন, উহার মধ্যে কি কি সমাস আছে,
?

নজির্জ্জতি। সমাস মাষমন্নামি ইত্যাদি ইত্যাদি।
হাস্য করিতে করিতে কহিলেন,—ব্যাকরণে আপনার
ধকার দেখিতেছি।

—

মামার সঙ্গে পরিহাস? আমি চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যার্ণব উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি কি যে, সে, লোক?

সমরেন্দ্র—

চতুঃসাগর উপাধিটী হইলে আরো ভাল হইত না কি?

ব্রাহ্মণ—

অবে মূর্খ! সাগর কি চারিটী? সাগর যে সাতটী; লবণেক্ষু সুরাসর্পিঃ দধি দুগ্ধ জলান্তকাঃ। আমার সঙ্গে বিদ্রূপ?

সমরেন্দ্র—

মহাশয়! এতক্ষণে বুঝিলাম আপনি মহাপণ্ডিত; আমি মূর্খ, আপনার মহিমা কি বুঝিব? এত বিদ্যা আছে বলিয়াই চতুর্ভুজার পুরোহিত হইতে পারিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ, এই বার বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া গুম্ফে হস্ত বিস্তার করিতে লাগিলেন।

এই হস্তীমূর্খ ব্রাহ্মণ কিরূপে চতুর্ভুজার পুরোহিতের পদে নিযুক্ত হইল, ভাবিয়া সমরেন্দ্র চমৎকৃত হইলেন। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ঠাকুর মহাশয়! আপনাদিগের মহারাণা উপস্থিত যুদ্ধের কি প্রকার আয়োজন করিয়াছেন, বলিতে পারেন কি?

ব্রাহ্মণ—

মহারাণা কাপুরুষ। তাঁহার কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। তিনি যুদ্ধ আরম্ভ হইবার বহুপূর্ব্বে অরণ্যে পলায়ন করিয়াছেন।

সমরেন্দ্র—

তবে কি বিনা যুদ্ধে মিবারের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্ত গমন করিবে? চিতোরের দুর্ভেদ্য দুর্গ যবন করে অর্পিত হইবে?

ব্রাহ্মণ—

মহাবীর জয়মল্ল জীবিত থাকিলে, শত শত আক্‌বরসাহ চিতোরের কণামাত্র অনিষ্টসাধন করিতে পারিবে না। জয়মল্ল এবং পুত্তের পতাকা তলে শতসহস্র রাজপুত্র জন্মভূমির রক্ষার্থ অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। পুত্তের বীরমাতা এবং বীরপত্নীও রণরঙ্গিণী বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা।

সমরেন্দ্র—

রাজপুতানার অন্যান্য প্রদেশের অধিপতিবর্গও বোধ হয় সমর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া আসিয়াছেন?

ব্রাহ্মণ—

সে নরাধম নারকীগণের নাম উল্লেখ করিবেন না। তাহারা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অধিকাংশই আক্‌বরের শরণাপন্ন। এক্ষণে জয়মল্ল এবং

পুত্রই একমাত্র ভরসাস্থল। জয়মল্ল এই সমর সাগরের কর্ণধার, আর পুত্র প্রভৃতি সুযোগ্য সহকারী।

সমরেন্দ্র—

ঠাকুর মহাশয়! আপনি জয়মল্লের সমস্ত সংবাদ রাখেন কি?

ব্রাহ্মণ—

জয়মল্লের সংবাদ আমি রাখি না? আমি তাঁহার অনুগত এবং বিশ্বাস পাত্র।

সমরেন্দ্র—

ভাল হইয়াছে। তবে একটী প্রস্তাব করি। দেখুন! আমার মোগল দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। আপনি যদি একটী কার্য্য করিতে পারেন, তবে আর কখন কোন কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয় না, এক বারে আপনাকে বড়মানুষ করিয়া দিতে পারি।

ব্রাহ্মণ শুনিয়া আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিলেন—বলেন কি? এক বারে বড় লোক? কি করিতে হইবে বলুন? আহা! দরিদ্র ব্রাহ্মণ একবারে বড় মানুষ! এত সৌভাগ্য কি ঘটিবে?

সমরেন্দ্র—

কার্য্য এমন কিছুই নহে, আপনি যদি জয়মল্লকে ধরাইয়া দিতে পারেন, তবে বাদসাহের নিকট হইতে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দেওয়াইতে পারি। বিনা যুদ্ধে জয়মল্লকে ধৃত করিতে পারিলে বাদসাহের নিকট হইতে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা বাহির করা অতি সামান্য কথা। যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিতে হইবে। সমরেন্দ্র ব্রাহ্মণের হৃদয় পরীক্ষা করিবার জন্য এই প্রলোভনের কথা বলিলেন।

ব্রাহ্মণ কাতর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—মহাশয়! আপনি কে, তাহা জানি না। তা, আপনি যেই হউন, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে আর

প্রলুব্ধ করিবেন না। আমি দরিদ্র, মূর্খ এবং সহায়সম্পত্তিহীন বটে; কিন্তু হৃদয়হীন হই নাই। আমি এই ঘোর বিপত্তির সময়ে জন্মভূমির উদ্ধারকর্ত্তা জয়মল্লকে ধরাইয়া দিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতে পারিব না। আমি আপনার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়াছি। আমি চতুর্ভুজার পুরোহিতও নহি এবং বিদ্যাবুদ্ধিও আমার কিছু নাই। এই বলিয়া—ব্রাহ্মণ ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সমরেন্দ্র ব্রাহ্মণের দেশানুরাগ এবং হৃদয়ের উচ্চতা ও উদারতা দেখিয়া মোহিত হইলেন।

বিদ্যা বুদ্ধিতে হৃদয় মার্জ্জিত হওয়া সম্ভব হইলেও সকলের তাহা হয় না। স্বাভাবিক কুটিল ও কুচরিত্র লোক বিদ্যা বুদ্ধির সাহায্যে আরও কুটিল ও কুচরিত্র হয়। সে রূপ অগাধ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা, নিরক্ষর অথচ উন্নত হৃদয়ের লোকের সঙ্গ শতগুণে বাঞ্ছনীয়।

সমরেন্দ্র ব্রাহ্মণকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন—ঠাকুরজি! তোমার উদারতা এবং লোভশূন্যতা দেখিয়া যারপরনাই আনন্দলাভ করিলাম। যুদ্ধ নিবৃত্ত হইয়া যাউক, আমি সদুপায়ে তোমাকে বড় লোক করিয়া দিব। আমার ইচ্ছা তোমার ন্যায় সরল এবং সহৃদয় ব্যক্তির সঙ্গলাভ করিয়া সুখী হই। ব্রাহ্মণ আনন্দের সহিত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

গুপ্ত ঘাতক।

চিতোরের দুর্গপ্রাচীরের চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য যবনসৈন্য আল্লা হো আক্‌বর রবে ঘোরতর সমর আরম্ভ করিয়াছে। সকলেই দুর্গদ্বার অধিকার করিতে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সে দ্বার অরক্ষিত নহে। দলে দলে রাজপুত সৈন্য দুর্গপ্রাকার রক্ষা করিতেছে। স্বয়ং জয়মল্ল এই দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত।

জয়মল্লের বিরাম নাই। যেথানে ঘোরতর যুদ্ধ, সেই খানেই জয়মল্ল। জয়মল্ল দ্বার রক্ষা করিতেছেন; প্রাচীরের ভগ্নাংশ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতেছেন। যেন এক জয়মল্ল সহস্র হইয়া চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছেন। মোগল কামানের অগ্নি বর্ষণে এক স্থানে রাজপুতের সংখ্যা অল্প হইয়াছে। মোগল সৈন্য মহোৎসাহে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। রাজপুত আর কত ক্ষণ যুদ্ধ করিবে? পলায়ন ভিন্ন আর রাজপুতের গতি নাই। পলায়ন না করিয়া এ অপার যবন সৈন্য সমুদ্রে, গোষ্পদ তুল্য রাজপুত সৈন্য কত ক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিবে? রাজপুত সেনা পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে; জয়মল্ল উপস্থিত। জয়মল্লের আগমনে রাজপুতহৃদয়ে বলসঞ্চার হইল। "জয় চতুর্ভুজা দেবী কি জয়" বলিয়া—রাজপুত সৈন্য উচ্চ চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল।

জয়মল্ল বলিতে লাগিলেন—"সৈন্যগণ! রাজপুতগণ! আজি আমাদের বড় শুভ দিন। এমন দিন আমরা এ নশ্বর জীবনে আর কখন পাইব না। আজি আমরা পিতা পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত হইয়া জন্মভূমি

রক্ষায় সমাগত হইয়াছি ; দেশবৈরী যবন নিধনে বদ্ধপবিকর হইয়াছি। যদি কার্য্যসাধন করিতে পারি, তবে আমাদের অপেক্ষা ভাগ্যবান্ আর কে আছে ? এ কার্য্যে সফলতালাভ করিতে পারিলে, নব বলে বলীয়ান্ হইব ; আর জননী জন্মভূমির চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া জীবন সার্থক করিব। ইহাতে যদি জীবন পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিব। ভট্ট চারণগণ আমাদের বীরত্ব গাথা গান করিয়া পববর্ত্তী বীব দিগকে উৎসাহিত কবিবে। ভ্রাতৃগণ ' যবনের করে আত্মসমর্পণ অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে মঙ্গলকর। যবন আমাদের স্ত্রী পুত্রের দুর্দ্দশা করিবে ; সোণার চিতোর ছারখার করিবে ; দেবালয়, দেবমূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ কবিবে ; আমরা কোন্ প্রাণে তাহা সহ্য করিব ? তাই বলিতেছি, আর যুদ্ধ ভিন্ন গতি নাই। যবনের সহিত যুদ্ধে পলায়ন অপেক্ষা এ ঘৃণিত প্রাণ পবিত্যাগ করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ।”

জয়মল্লের কথা শেষ হইতে না হইতেই অসংখ্য রাজপুত সৈন্য সেই স্থান আবৃত করিয়া ফেলিল। আর তাহাদের প্রাণেব মায়া নাই। সেই বলদৃপ্ত রাজপুত সৈন্যের দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণে, যবন সৈন্য সে স্থানে আর ক্ষণ মাত্র অবস্থান করিতে পারিল না। দলে দলে যবন সেনা রাজপুত হস্তে নিহত হইতে লাগিল। কেহ অসির আঘাতে, কেহ বন্দুকের গুলিতে, কেহ বা পদ তলে দলিত হইয়া লীলা সংববণ করিল। এই রূপে বহুসংখ্যক যবন-সৈন্যের ক্ষয় দেখিয়া, বাদসাহ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি বুঝিয়াছেন, যে জয়মল্ল জীবিত থাকিতে চিতোর জয় অসম্ভব।

“হর হর” শব্দে আর এক দিক কম্পিত হইয়া উঠিল। মহাবীর পুত্তের অনিবার্য্য বেগ নিবারণে অসমর্থ হইয়া, সে দিকের যবন সেনা পলায়ন করিতেছে। বহু যবন ধরাশায়ী হইয়াছে। আকবর সেই দিকে নূতন একদল

অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি বিক্রমজিতের অধীনে এই সৈন্য চালিত হইয়াছে। সমরেন্দ্রনারায়ণ এই অশ্বারোহী দলে সুযোগ্য এবং সুশিক্ষিত মনসব্‌দার। সেনাপতির নিম্নেই তাঁহার সম্মান। সমরেন্দ্রের অপ্রতিহত বেগ অবরুদ্ধ হইল। সম্মুখে চামুণ্ডা মূর্ত্তি। ভীম অসি ধারণ করিয়া পুত্তজননী সমরেন্দ্রের গতিরোধ করিয়া যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। সমরেন্দ্র সে অসুরনাশিনী মূর্ত্তি দর্শনে ভক্তিগদ্‌গদ্‌ হইয়া কহিলেন—"মা! আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না।" পুত্তের জননী বলিলেন,—কেন বাপ্‌! যোদ্ধার মুখে এ কথা কেন? যুদ্ধ করিতে পারিবে না, তবে যুদ্ধে আগমন করিয়াছ কেন? সমরেন্দ্র কহিলেন—"মা! আপনি যেমন দেশ রক্ষার জন্য এই চামুণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, আমাকেও তেমনি দেশের হিতের জন্য, এই অন্যায় কার্য্যে ব্রতী হইতে হইয়াছে। নতুবা হিন্দু হইয়া মুসলমানের হিতের জন্য, হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ যে গর্হিত কার্য্য, তাহা আমি অবগত আছি।

আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, দেবদ্বেষী যবন যদি দেবপ্রতিমা ভঙ্গ করে, দেবালয় চূর্ণ করে, কিম্বা অবলার প্রতি বল প্রকাশ করে, তবে আমি প্রাণ পণে তাহার প্রতিবিধান করিব। ইহাতে আমার প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার"।

"বৎস! চিরজীবী এবং চিরকল্যাণ ভাজন হও" বলিয়া, সে অসুরনাশিনী মূর্ত্তি নিমিষে অন্তর্হিতা হইল।

একি স্বপ্ন না প্রহেলিকা? এই চিন্তা করিতে করিতে, সমরেন্দ্র ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন—ষোড়শবর্ষীয় পুত্ত, অবিরল ধারায় অস্ত্র বর্ষণ করিতেছেন। সে অস্ত্রে যে কত যবন ধ্বংস হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ কি দ্বিতীয় অভিমন্যুর অভিনয়? অভিমন্যু যেমন কুরুকুল ক্ষয় করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, ইহাও সেইরূপ। যবন যায়

যায় হইয়াছে। আহা কি অস্ত্র চালনার কৌশল! কি অদ্ভুত রণনৈপুণ্য! এক বীরের হস্তে নিমেষ মধ্যে শত শত যবন নিহত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে রণরঙ্গিণী বালিকা আসিয়া বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইল। যবন পতঙ্গ এই বৈদ্যুতিক অগ্নির নিকট অনলকীটের ন্যায় দলে দলে জীবনলীলা শেষ করিতে লাগিল। দুই হস্ত চারি হস্ত হইয়াছে। এই যুগল মিলনে ক্ষিপ্র গতিতে যবন সংহার আরম্ভ হইল। সমরেন্দ্র স্বপক্ষের ধ্বংস দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু যুগল মিলনে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। মনে মনে আক্‌বর সাহাকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন—নিষ্ঠুর বাদসাহ! করিতেছ কি?

ঐ দেখ বর্ষীয়সী জননী দেশ রক্ষায় পাগলিনী হইয়া তোমার সৈন্য-সাগর মথিত করিতেছে। আবার ঐ দেখ দুইটী অস্ফুট কুসুম ফুটিতে না ফুটিতে মুকুলেই মুদিত হইতে চলিয়াছে। ঐ সে দিকে বৃদ্ধ জয়মল্ল যৌবনসুলভ রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া কি অদ্ভুত যুদ্ধ করিতেছেন! কিন্তু তোমার অসংখ্য সৈন্য মধ্যে ইহারা আর কত ক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিবে? ইহারা জীবন ত্যাগ করিলে, তোমার দুর্দ্দান্ত যবন সৈন্য অত্যাচারের এক শেষ করিবে।

সহসা রণস্থলী কম্পিত করিয়া উচ্চধ্বনি উঠিল। সে শব্দ চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজার মন্দির হইতে আসিতেছে।

"বৎস পুত্ত! আজি অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছ; যাও অমর ধামে গমন কর; সে স্থানে তোমার জন্য উপযুক্ত আয়োজন হইতেছে; অদ্য সে স্থানে তোমার অভিষেক হইবে; তুমি বীর কুলের অগ্রগণ্য; আমি বীরমাতা বলিয়া ধন্যা হইলাম।" অশ্বারোহণে চতুর্ভুজার মন্দির দ্বারে দণ্ডায়মানা হইয়া, পুত্তজননী পুত্র ও পুত্র বধূকে উক্ত প্রকারে উৎসাহ দিতেছেন।

পুত্রের হৃদয় শত গুণে বলবান্ হইয়াছে। সহসা শন্ শন্ করিয়া দুইটী গুলি আসিয়া পুত্রজননীর ললাট দেশে বিদ্ধ হইল। গুলি কোথা হইতে আসিল? যুদ্ধক্ষেত্র হইতে? না। এ গুপ্ত ঘাতকের গুলি। গুপ্তঘাতক কে? কূটবুদ্ধি আকৃবব।

জয়মল্ল যে প্রকার যুদ্ধ করিতেছেন, এ প্রকার যুদ্ধ আর কিছু ক্ষণ হইতে থাকিলে যবন সম্রাটের প্রত্যাবর্ত্তন কঠিন হইবে। আবার দুইটী গুলি। একটী বক্ষঃ এবং একটী মস্তক ভেদ করিল। জয়মল্লের জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হইল। প্রভুভক্ত অনুচব, প্রভুর অবস্থা দেখিয়া, গুলির পথ লক্ষ্য করিয়া অসি হস্তে ছুটিল। অনুচব আগতপ্রায়। দ্বিতীয় গুলি পূর্ণ কবিবাব অবসর নাই। অনুচব উপস্থিত হইয়াছে; অসি উত্তোলিত কবিয়াছে; আব রক্ষা নাই। সমরেন্দ্র লক্ষ্য কবিয়াছেন। তীর বেগে ছুটিতেছেন। কাপুরুষকে রক্ষা করিবাব জন্য প্রভু ভক্তের প্রাণবধ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। হস্তস্থিত অসির বিপরীত পৃষ্ঠ দ্বারা সবলে অনুচরের হস্তে আঘাত করিলেন; ঝন্ ঝন্ শব্দে আস ভূতলে পতিত হইল। আকৃবর আসন্নমৃত্যু হইতে বক্ষা পাই-লেন। স্ত্রীঘাতক, নরঘাতক, গুপ্ত ঘাতকের জীবনরক্ষা জগদীশ্বরের আভপ্রায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জহর ব্রত।

যুদ্ধের এখনও নিবৃত্তি হয় নাই। তবে এখন আর বীরত্বের বিকাশ নাই। কেবল অত্যাচারস্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। জয়মল্ল, পুত্ত প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুত সেনানী জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন; সুতরাং রাজপুত পক্ষ দুর্ব্বল হইয়াছে। মুসলমানগণ সুযোগ বুঝিয়া লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত। সমরেন্দ্রের আর যুদ্ধে প্রবৃত্তি নাই। এখন অত্যাচার দমনে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যে থানে আর্ত্তের, আর্ত্তনাদ, কাতরের ক্রন্দন, সেই থানে সমরেন্দ্র। যে স্থানে দেবমূর্ত্তি অপবিত্র হইবার আশঙ্কা, সেই স্থানে সমরেন্দ্র। সমরেন্দ্রের কার্য্যের বিরাম নাই, শ্রান্তি দূর করিবার অবসর নাই। অদূরে কাতরধ্বনি শ্রুত হইল। ত্বরিত গমনে সমরেন্দ্র রোদনশব্দ লক্ষ্য করিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—একটী দিব্যকান্তি রমণীর প্রতি, কয়েকটী মুসলমান সৈন্য অত্যাচারের উপক্রম করিতেছে। পাষণ্ডগণ! এই কি সৈনিক ধর্ম্ম? বলিয়া—সমরেন্দ্র অসি হস্তে অগ্রসর হইলেন। সৈনিকগণ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী দেখিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—আপনি স্বপক্ষ হইয়া শত্রুদমনে বাধা দিতেছেন কেন?

সমরেন্দ্র কহিলেন—অনাথা অবলার প্রতি বলপ্রকাশ কি শত্রুদমন? এ উৎকৃষ্ট নীতি কোন শাস্ত্রে শিক্ষা করিয়াছিস্? এখনি পরিত্যাগ কর্; নতুবা এই অসির আঘাতে তোদের মস্তকচ্ছেদন করিব। সমরেন্দ্রের দৃঢ়তা দেখিয়া, উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকগণ রমণীকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

সমরেন্দ্র রমণীকে কহিলেন—ভদ্রে! কোন্ স্থানে রাখিয়া আসিলে, তুমি নিরাপদ হইতে পারিবে? রমণী কহিলেন—বাবা! আমার আর আপদ নিরাপদ কি? পতি স্বর্গে গমন করিয়াছেন; পিতা জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন; আত্মীয় স্বজন সকলেই চিতোর রক্ষায় প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে আমাকে এক খানি অস্ত্র দিলে, আমি তাঁহাদের অনুগামিনী হইতে পারি। অথবা যে স্থানে জহর ব্রত সমাধা হইতেছে, সেই স্থানে লইয়া গেলে জ্বলন্ত অনলে জীবনবিসর্জ্জন দিয়া যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিব। "তাহাই হইবে" বলিয়া—সমরেন্দ্র রমণীকে সমভিব্যাহারে লইলেন।

একি? এ কিসের শব্দ? আর্ত্তনাদ! ক্রন্দন! শিশুর রোদন! পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ভয়ে চিৎকার করিতেছে। তোমরা কে? বাদসাহের-সৈন্য? এ শিশুকে কোথায় লইয়া যাইতেছ? একজন সৈনিক উত্তর করিল—শত্রুপুত্র; পিতাকে যে পথে পাঠাইয়াছি, পুত্রকেও সেই পথে পাঠাইব। ইহার পিতা বাদসাহের অনেক সৈন্য বিনষ্ট করিয়াছে। শুনিয়াছি—এই শিশু ইহার পিতার একমাত্র পুত্র; অতএব ইহাকে বিনাশ করিতে পারিলে, পুরস্কারের আশা আছে। সমরেন্দ্র ক্রোধ কম্পিত স্বরে কহিলেন—আক্‌বর বাদসাহ এত অপদার্থ হন নাই যে, এই নৃশংস কার্য্যে, শাসনের পরিবর্ত্তে তোমাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন। বর্ব্বরগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল—ইহাকে তরবারির উপরি ফেলিয়া মারিব; কেহ বলিল—না সঙ্গিনের দ্বারা কার্য্যশেষ করা যাউক। সমরেন্দ্র কহিলেন—দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণ! সাবধান! শিশুর একগাছি কেশ স্পর্শ করিলে মস্তক থাকিবে না। অস্ত্রধারী সৈনিকগণ সমরেন্দ্রকে সম্মান করিত; কিন্তু অদ্য তাঁহার কথায় শিশুকে ছাড়িতে চাহিল না। তখন সমরেন্দ্র কোষ হইতে অসি মুক্ত করিয়া, সৈনিক গণের সম্মুখীন

হইলেন। সে অসম যুদ্ধে পরাজয়েরই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু সমরেন্দ্র যেন দৈব বলে বলীয়ান্ হইয়া একাকী সকলকে নিরস্ত্র করিলেন। সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তখন সমরেন্দ্র শিশুকে বুকে তুলিয়া লইয়া আদর করিতে লাগিলেন। কহিলেন—বাবা! তুমি কে? তোমার বাবার নাম কি বলিতে পার? শিশু কহিল—আমি থুবল। সুভল? কার ছেলে? বাবার থেলে? বলিয়া—শিশু দুই খানি কোমল হস্ত বিস্তার করিয়া, সমরেন্দ্রের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলিল—আমাকে মেলে ফেলে দিবে বলেথে। তুমি ওদেল খুব মেলেথ, বেশ কলেথ; আমি মাকে বলে দেবো। আমাদেল অনেক সিপাই আথে, ওদেল খুব মাল্‌বে। তা আল বল্‌বোনা। ওলা তোমাল কাথে খুব মাল খেয়েথে। সমরেন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—বাপধন! শত্রুর প্রতি এই বয়সে তোমার এত দয়া! না জানি তুমি কোন্ মহৎ লোকের সন্তান? নিশ্চয়ই তুমি কোন মহৎ বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছ। সমরেন্দ্র শিশুকে বক্ষেঃ লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। শিশু অঙ্গুলী হেলাইয়া পথ দেখাইতে লাগিল। চিতোরের প্রান্ত সীমায় এক প্রকাণ্ড আট্টালিকার নিকট তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—বাটীর প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড অনলকুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। সে অগ্নিস্তূপের শিখাধূম আকাশে উঠিয়াছে। বুঝি প্রলয়ের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। চারিদিকে দিব্যাঙ্গনার ন্যায় রাজপুত রমণীবৃন্দ। সকলেই নব সজ্জায় সজ্জিতা। আজি বিধবা সধবা বিচার করিবার উপায় নাই। নব বিধবা কাহারই বৈধব্য বেশ নাই। সকলেই অলক্তরাগ রঞ্জিত চরণে, সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু ধারণ করিয়া, অনলকুণ্ডে প্রাণ-পরিত্যাগ জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। বীর এবং করুণরসের প্রাণাকর্ষণী মধুর বাদ্য বাজিতেছে; রমণীগণ ইষ্টদেবতার পূজা সাঙ্গ করিয়া, পতিদেবতার পূজা করিতেছেন। এই সময়ে

বক্ষেঃ শিশু এবং পশ্চাতে সেই অনাথা রমণীকে লইয়া, সমরেন্দ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। মৃত্যুন্মুখিনী নারীগণ কৌতূহল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। পশ্চাৎগামিনী রমণী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—দেবতা; সতীত্বের রক্ষক; শিশুর পরিত্রাতা; দেব মূর্ত্তির সম্মানকারী; মহাপুরুষ। সকলে সমস্বরে জয় মহাপুরুষের জয়; জয় শিশুর রক্ষাকারীর জয়; জয় সতীর সম্মানকারীর জয় বলিয়া—আগন্তুকের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। সমরেন্দ্র অবনত মস্তকে সেই সকল দেবী-রূপিণী জগন্মাতৃকা রমণীগণকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলেন—হায়! আজ চিতোরের কি সর্ব্বনাশ হইল! নৃশংস সম্রাট্! এক বার দেখ, তোমার দুরাকাঙ্ক্ষায় কত ফুল্লারবিন্দ অকালে অন্তর্হিত হইতে চলিল। তোমার অন্যায় রাজ্য লিপ্সায়, একটী প্রকাণ্ড নগর বীরশূন্য হইল। তুমিনা স্বনামধন্য কৃতীপুরুষ? এই কি তাহার নিদর্শন? ইহার জন্য কি তোমার কিছুমাত্র দায়িত্ব নাই? এক দিন কি ইহার জন্য তোমাকে ফলভোগ করিতে হইবে না? বীর রসে মাতাইয়া, করুণ রসে ভাসাইয়া উচ্চস্তম্ভে চারণী দেবী গাহিলেন—

একদিন, আলাদিন দুষ্ট দুরাচার।
অত্যাচার করেছিল সীমা নাহি তার॥

আজি আছে কোন্ চিহ্ন,
অকীর্ত্তি অযশ ভিন্ন,
খ্যাতি আছে ধরাধামে পাষণ্ড বর্ব্বর।
ঘুষিবে কলঙ্ক তার শশাঙ্কভাস্কর॥
পদ্মিনী পঙ্কজকেতু,
রেখেছে সতীত্ব সেতু,

ধন্য ধন্য পুণ্যবতী সুকীর্ত্তি তাঁহার।
তোমরাও রাখ কীর্ত্তি রাজপুতানার॥
ভানুকুলে লভি জন্ম,
রাখ রমণীর ধর্ম্ম,
অনলে অর্পণ কর প্রাণ আপনার।
প্রাণ দিবে হিন্দুনারী নহে চমৎকার?

অনুগামিনী রমণী অগ্নি পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন। শিশু মাতৃ ক্রোড়ে যাইবে—জননী আর থাকিতে পারিলেন না। হাত বাড়াইয়া শিশুকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। পরে সমরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—মহাপুরুষ! আপনি যিনিই হউন, অদ্য শঙ্করাপতি সমর-সিংহের বংশ রক্ষা করিলেন। আমি পতির নিধনবার্ত্তা শুনিয়া শিশুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। বিলম্ব দেখিয়া বুঝিলাম যে, সেও পিতৃসহ স্বর্গ ধামে গমন করিয়াছে। নিষ্ঠুর যবন নিশ্চয়ই তাহার প্রাণবধ করিয়াছে, তাই আর অপেক্ষা না করিয়া, পতির অনুগমনে প্রস্তুত হইতেছিলাম।

এক্ষণে সমরসিংহের বংশরক্ষা হইল দেখিয়া, যারপরনাই আনন্দ লাভ করিয়া যাইতে পারিব। আপনার মঙ্গল হউক। আপনি সর্ব্ব-সুখে সুখী হউন, এই আমার শেষ প্রার্থনা। জগদীশ্বর নিশ্চয়ই আমার শেষ প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবেন। এই বলিয়া—বার বার শিশুর মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন—যাও বৎস! যিনি তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এই সময়ে সমরসিংহের প্রধান কর্ম্মচারী আসিয়া, শিশুর সহিত সমরেন্দ্রকে গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন।

সকলে এক যোগে গাহিতে গাহিতে অগ্নিকুণ্ডের নিকট আগমন করিলেন।

আয়, সখি আয়, আয়, দিনমণি অস্ত যায়।
আর ত বিলম্ব করা উচিত না হয়॥
ঐ দেখ সুর সাজে,
পতি দেব স্বর্গ মাঝে,
বিলম্ব দেখিয়া, তব পথ পানে চায়।
শান্তি নিকেতন তথা,
রোগ-শোক নাহি ব্যথা,
অত্যাচার, অবিচার কেহ না দেখিতে পায়।
চরণে অলক্ত দেহ,
সীমন্তে সিন্দূর লহ,
সবস্ত্র সঅলঙ্কার সুন্দর সজ্জায়।
চল সখি, চল চল দিনমণি অস্ত যায়॥

সকলে অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া, গাহিতে লাগিলেন।

চল গো জহর ব্রত হলো সমাধান।
চল গো অমরধামে শান্তি নিকেতন॥
চল সখি চল চল,
ঢাল ঘৃত, ধূপদল,
প্রজ্জ্বল করহ বহ্নি পর্ব্বত প্রমাণ।
প্রাণ শূন্য শুধু কায়া,
এ প্রপঞ্চ মহামায়া,
আর না ভুলিব সখি, ছাড়িব এই ছার প্
চল গো জহর ব্রত হলো সমাধান

সেই নারীকুল অগ্নিকুণ্ডে মিশাইয়া গেল। সং

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্মশান।

চিতোরের অনতিদূরে গিরিতরঙ্গিণী তীরে, মহা শ্মশান ধূ ধূ জ্বলিতেছে। উপরে উন্নতশৃঙ্গ আরাবল্লী গভীর অরণ্য বিস্তার করিয়া সেই মহা শ্মশানের গম্ভীরতা বৃদ্ধি করিতেছে। শাল, পিয়াল, শিশু প্রভৃতি বন্য বৃক্ষের শাখা পল্লবে সূর্য্যকিরণ রোধ করিয়া নিবিড় অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে। কোথাও মৃতদেহ সংকারের শেষ চিহ্ন; কোথাও অস্থি কঙ্কালের দগ্ধাবশেষ; কোথাও অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড; কোথাও অঙ্গার রাশির উচ্চ স্তূপ; কোথাও শিবাশুনীগণ ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। যে দিকে চাহিয়া দেখি, সেই দিকেই এই ভীষণ শ্মশানের ভীতিপ্রদ দৃশ্য।

পাপী, তাপী, বিপন্নের একমাত্র অবলম্বন শ্মশান ভূমি! কে তোমায় ভীষণ বলে? তুমি যদি ভীষণ, তবে জগতে শান্তি স্থান কোথায়? তুমি বিপন্নের বন্ধু, পাপীর পরিত্রাতা, তাপিতের জুড়াইবার স্থান। তুমি আশার সাফল্য, কামনার কল্পতরু। ভ্রান্ত মানব জগৎব্রহ্মাণ্ড তন্ন তন্ন ...সা যাহা না পায়, তুমি অজস্র ধারে তাহা তাহাকে ঢালিয়া দাও। ... সংসারের মধ্যে বিচরণ করিয়াও নিরপেক্ষতার একশেষ ...শাক। তোমার ধনী দরিদ্রে বিভেদ নাই; বৃদ্ধ তরুণে ...ত মূর্খের ইতরবিশেষ নাই। যে মহাশক্তির অচিন্ত্য ...ক্তি ধারণ করিয়াছ, সেই শক্তিকে নমস্কার করি। ...শ্বেত কৃষ্ণের প্রভেদ ঘুচাইয়াছ; ব্রাহ্মণ শূদ্রের ...ছ; সেই শক্তিকে শত নমস্কার করি। আশার-

ছলনা, পাপের তাড়না, রোগের যাতনা তুমি ভিন্ন এক বারে নিভাইতে পারে, এমন সাধ্য কাহার? তুমি বিজয়ীর বিজয় তৃষ্ণার নিবৃত্তি কর; উন্মত্তের উন্মত্ততার শান্তি কর; শোকার্ত্তে শান্তিবারি ঢালিয়া দাও। প্রকৃতির বিপর্য্যয়নাশিনি সংসারশান্তিকারিণি শ্মশানভূমি! তোমার মহিমা কত বর্ণনা করিব? তুমি দুর্দ্দান্ত দশাননে ক্রোড়ে করিয়া, দেবভয় নিবারণ করিয়াছ; অগণিত ক্ষত্র শোণিতে মেদিনী প্লাবিত করিয়া, যুধিষ্ঠিরে রাজ সিংহাসনে বসাইয়াছ; তোমার প্রভাবে শত শত দিক্‌বিজয়ীর দিক্‌বিজয়বাসনা প্রশমিত হইয়াছে: শত শত অত্যাচারী সম্রাট্ যাহাদের বীর দর্পে জগৎ কম্পিত হইয়াছিল, তাহারা তোমার চরণ প্রান্তের ধূলিকণায় মিশাইয়া গিয়াছে। তোমার নিকট দর্পীর দর্প নাই; বলীর বল নাই; আর্ত্তের বেদনা নাই; আছে কেবল শান্তি! শান্তি! তোমার উদ্দেশ্য মহৎ; কার্য্য মহৎ; কীর্ত্তি মহৎ; জগতের শান্তিবিধান। তাই অত্যাচারী কলুষচিন্তা বিস্মৃত হইয়াছে; রাজ্যেশ্বর রাজ্যচিন্তা ভুলিয়া গিয়াছে। বাগ্মীর বাগাড়ম্বর নাই; বৈজ্ঞানিকের গভীর গবেষণা নাই; সকলেই বিশ্রাম শয্যায় চির নিদ্রায় অভিভূত। এমন নিশ্চেষ্ট, নিরুপদ্রব এবং নিষ্কাম স্থান আর নাই। এখানে আকাঙ্ক্ষার, কামনার, বাসনার যজ্ঞকাণ্ডে আহুতি হইয়াছে।

এই গহন গম্ভীর মহাশ্মশান আজি অসংখ্য রাজপুত শবের চিতানলে প্রজ্জ্বলিত। ধূ ধূ অগ্নি জ্বলিতেছে; চিতা ধূমে শ্মশানভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। যেন ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজিপরিপূরিত বৃহদারণ্যে দাবানল দেখা দিয়াছে। চন্দনকাষ্ঠ, ধূপ, ধূনা এবং ঘৃতের সৌগন্ধে দিক্ আমোদিত করিয়াছে। সমরেন্দ্রনারায়ণ, রাজা তোডর্ম্মল্ল এবং বিক্রমজিৎ রাজার আগ্রহে, এই শবসৎকারের আয়োজন। এ কাল সমরে অতি অল্প সংখ্যক রাজপুত্রই জীবিত আছে। যাহারা জীবিত আছে, তাহারা পরমোৎসাহে

এই সৎকার্য্যে যোগদান করিয়াছে। তাহারা লোকান্তরিত আত্মা সমূহের সদ্গতির জন্য এক এক বার ঈশ্বরের নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতেছে; আর এক এক বার জয় সমরেন্দ্রনারায়ণের জয়, জয় রাজা তোডর্ম্মল্লের জয়, জয় রাজা বিক্রমজিতের জয় বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। সমরেন্দ্র ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া, এই মহা কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন। জয়মল্লের বীরবপু যে স্থানে দগ্ধ হইতেছে, সেই স্থানে সমরেন্দ্র উপস্থিত। ভারে ভারে চন্দন কাষ্ঠ সে চিতায় সজ্জিত হইয়াছে, কলসী কলসী ঘৃতের স্রোত বহিতেছে। যে, যেখানে পাইতেছে, ধূপ, দীপ, ধূনা অর্ঘ্যে চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতেছে; তাহারই অদূরে পত্নীসহ পুত্রের চিতাশয্যা। পার্শ্বে বীরাঙ্গনা পুত্রজননী। রাজপুতগণ এই কয়েকটী শবদেহ সৎকারে দেহ মন অর্পণ করিয়াছে। জয়মল্লের পত্নী, জহর ব্রত সাধন করিয়া জীবনবিসর্জ্জন দিতেছেন; সেই নিমিত্ত সহ মরণের এখানে কোন উদ্যোগ নাই। সহসা সুললিত স্বরে শব্দ হইল—"যাও বৎস অমরধামে যাও। সে খানে তোমার জন্য আজি যে অপার্থিব আয়োজন হইয়াছে, কোন কালে কোন ভাগধরের জন্য বুঝি সে প্রকার আয়োজন হয় নাই। তুমি স্বদেশ ও স্বজাতি রক্ষায় অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া, যে জয় মুকুট মস্তকে পরিধান করিয়াছ, তাহার তুলনা নাই। জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছে; মুনি, ঋষি, যোগী, তপস্বীগণ চমৎকৃত হইয়াছেন। এ তোমার মৃত্যু নহে, অক্ষয় অনন্ত কীর্ত্তির বিস্তার"। বীণার ঝংকারে উদাত্ত স্বরে, এই কয়েকটী কথা উচ্চারিত হইল। সমরেন্দ্র এই অলৌকিক স্বরলহরী শ্রবণ করিয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কোথা হইতে এ স্বর উত্থিত হইতেছে? জন মানব নাই। তবে এ স্বর কাহার? অতি স্পষ্ট, অতি পরিষ্কার স্বর। সমরেন্দ্র ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন

াম্ভীরনাদে আবার শব্দ হইল—যুবক! যদি দর্শনেচ্ছা বলবতী
। থাকে, তবে বাসনাশক্তিকে অব্যাহত করিয়া. প্রবল ইচ্ছার সহিত
কাল চিন্তা কর। সমরেন্দ্র চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া উত্তারনয়নে
কাল চিন্তা কবিতে লাগিলেন। বাসনার ফল ফলিল। নয়ন উন্মীলন
য়া দেখিলেন, দীর্ঘশ্মশ্রু জটাজূটধারী তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী সম্মুখে
য়মান। সমবেন্দ্র সন্ন্যাসীচবণে বিলুণ্ঠিত হইয়া পদধূলি লইতে
বিস্তার কবিলেন। বৃথা চেষ্টা। পদস্পর্শ করিতে পারিলেন না;
' ইন্দ্রজাল—না দেবলীলা। প্রত্যক্ষ পবিদৃশ্যমান্ চরণ, ধারণ
তে পারিলেননা কেন? সমরেন্দ্র হতবুদ্ধি। সন্ন্যাসী কহিলেন—
! চবণধূলি লইবার আবশ্যকতা নাই। আমি তোমার কার্য্যে বড়
চ হইয়াছি। সেই জন্যই দর্শন দিলাম। তোমাকে দেখা দিবার
এতক্ষণ অপেক্ষা কবিতেছি। তুমি স্থূল দেহভ্রমে পদধূলি লইতে
করিতেছ; কিন্তু এ সূক্ষ্মদেহ। এ দেহ স্পর্শ করিবে কিরূপে?
ল্লের অমানুষিক কার্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহার দিব্যদেহ দর্শনে পুণ্য-
করিতে আগমন করিয়াছি। ঐ দেখ শত শত মহাপুরুষ জয়মল্লের
পার্শ্বে দণ্ডায়মান্। সকলেরই দিব্য মূর্ত্তি, সূক্ষ্ম দেহ।
সন্ন্যাসীর আদেশে সমবেন্দ্র চিতানলে দৃষ্টিপাত কবিলেন, দেখি-
—স্বর্গ পৃথীর অপূর্ব্ব শোভা। সমরেন্দ্রের হৃদয়ে আর পার্থিব স্পৃহা
প্রাণ মন এখন সেই স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ: অভিন্ন দেবতাগণের
র্থব দিব্যকান্তিব অপূর্ব্ব তেজ, তাঁহার অন্তবে বাহিরে প্রবেশ
াছে। তিনি আর জবামরণশীল এবং বাসনার বশীভূত মানব
। কপটতা, কঠিনতা দূরে পলায়ন করিয়াছে; কলুষচিন্তা হৃদয় হইতে
ত হইয়াছে। হিংসা নাই; দ্বেষ নাই; মৎসরতা নাই। হৃদয়
—সুনির্ম্মল। সমরেন্দ্র দেবতাসদৃশ। সমরেন্দ্র কিয়ৎকাল নিস্পন্দ

ও নির্নিমেষ নয়নে এই অভাবনীয় হৃদয়ভাবের পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়া, সাগ্রহে সেই দিব্যমূর্ত্তি মহাপুরুষকে বলিয়া উঠিলেন—ভগবন্! আর যেন আমাকে পাপ তাপ জড়িত সংসারযাতনা ভোগ করিতে না হয়। আপনার অশেষ করুণায় আজ যে সুখ অনুভব করিতেছি, এ জীবনে এমন সুখ আর পাই নাই। দেব! হৃদয় বিভোর হইয়াছে, আত্মা পবিত্র হইয়াছে। আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে এই মানবদুর্ল্লভ স্বর্গীয় সুখের আস্বাদন করিতে অধিকারী হইলাম?

সন্ন্যাসী কহিলেন বৎস! তোমার বিশেষ চেষ্টায় এই দেবসদৃশ জয়মল্ল প্রভৃতি স্বার্থত্যাগী বীরগণের মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন হইয়াছে। সেই পুণ্যের ফল, এই সকল সূক্ষ্ম-দেহধারী মহাপুরুষগণের সন্দর্শন এবং তাহা হইতেই এই স্বর্গীয়ভাবের অনুভব। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার সুখে সুখী হইয়া ধর্ম্মপথে বিচরণ কর।

সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইলেন। সেই সঙ্গে সমস্ত মহাপুরুষেরই তিরোভাব হইল।

সমরেন্দ্র চমৎকৃত হইয়া, এই আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে শ্মশান হইতে বহির্গত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—— • ✱ • ——

আগ্‌রা আগমন।

তারা অপহরণ বৃত্তান্ত প্রাতঃকালে বাষ্ট্র হইল। তাঁবুতে এবং বজরায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সংসারবিরাগী কর্ম্মযোগী গিরিতুল্য অটল রতিকান্ত রায় আজ ব্যাকুল না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। শ্যামা অপহরণে যাহা না হইয়াছিল, আজ তাহা হইল। উমাশঙ্করের সর্ব্বস্ব ধন, তাঁহার নিকট হইতে অপহৃত হইল; স্থাপিতধন ধনস্বামীকে ফিরাইয়া দিতে পারিলেন না, এই ভাবনায় তাঁহার অন্তর্দ্দাহ হইতে লাগিল। কিন্তু যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে; তাহার জন্য কাতর হইলে চলিবে কেন? এক্ষণে উদ্ধারের উপায় দেখিতে হইবে। এই ভাবিয়া, প্রহরীদিগকে আহ্বান করিলেন। সীতারাম পলাতক। বিধুমুখী মাঝখানের মাছ; কিছুই জানেন না। কাঁদিয়াই আকুল। রক্ষীদিগকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া কোন ফল হইল না; যাহাহউক চারিদিকে অনুচর প্রেরণ করিলেন। গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন; পুরস্কারের ঘোষণা করিলেন। বলিয়া দিলেন— যে, "যে ব্যক্তি প্রকৃত সন্ধান দিতে পারিবে, তাহাকে দশহাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।" কাণপুরের ফৌজদারের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। এইরূপে ঘটনাস্থলে দশবার দিবস অপেক্ষা করিয়াও যখন কোন কিনারা হইল না, বা হইবার সম্ভাবনাও দেখিলেন না, তখন অগত্যা আগ্‌রা রওনা হওয়াই স্থির করিলেন। মনে করিলেন, বাদসাহ দরবারে চেষ্টা করিয়া কোন উপায় করিতে পারিবেন।

এ দিকে হরসুন্দরীও বড় চঞ্চলা। অল্পদিনের মধ্যেই তারা তাঁহার

বড় প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিয়াছিল। আর ধ্যানে বসিতে পারেন না; মন স্থির হয় না; তারার কথাই মনে উঠে। আগ্‌রা যাত্রার এই শুভ সুযোগে তীর্থদর্শন করিয়া পবিত্রা হইবেন মনে করিয়া, স্বামীর সঙ্গিনী হইয়াছিলেন; কিন্তু সে বিষয়ে আর আস্থা নাই। শ্যামা দিন দিন কৃশা ও দুর্ব্বলা হইয়া যাইতেছেন। কেবল শশীমুখী অটলা, অচলা। তিনি গুরুদেবকে আশ্বস্ত করিতেছেন; গুরুপত্নীকে সান্ত্বনা দিতেছেন, শ্যামাকে প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বজরা আগ্‌রার ঘাটে আসিয়া লাগিল। রতিকান্ত রায় বাদসাহ দরবারে কোন সংবাদ প্রেরণ না করিয়া, রাজা তোডর্ম্মল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন।

তোডর্ম্মল্ল—

রায়জী আসিয়াছেন? আমরা আপনার আগ্‌রা যাত্রার প্রথম সংবাদ অবগত আছি। তৎপরে অনেক দিন কোন সংবাদ না পাইয়া উদ্বিগ্ন ছিলাম। কোন বিঘ্ন হয় নাই ত?

রতিকান্ত—

মহারাজ! বিপদের চূড়ান্ত হইয়াছে। আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী কন্যা প্রভৃতি কয়েকটী স্ত্রীলোক তীর্থদর্শন উদ্দেশে আগমন করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে আমার একটী আত্মীয়ের কন্যা অপহৃতা হইয়াছেন।

তোডর্ম্মল্ল—

কোন্ স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে?

রতিকান্ত—

কাণপুরের সন্নিকটে।

তোডর্ম্মল্ল—

কন্যাটী দেখিতে কেমন? বয়স কত?

রতিকান্ত—

সে পরমাসুন্দরী; আর বয়সে পূর্ণ যুবতী।

তোডর্ম্মল্ল—

মেয়েটীর বুদ্ধি শুদ্ধি কেমন? বিলাসপ্রিয়তা কিছু আছে কি?

রতিকান্ত—

মহারাজ! আমি আপনার কথার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।

তোডর্ম্মল্ল—

রায়জি! এ মোগল দরবারের গূঢ় রহস্য অনেক; এখন সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার সময় নহে। সময়ে সব বুঝিতে পারিবেন। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, সে মেয়েটী যদি সুশীলা, সচ্চরিত্রা এবং বুদ্ধিমতী হয়, তবে বোধ হয় কেহ তাহাকে প্রলোভনে ভুলাইতে পারিবে না।

রতিকান্ত—

না—তাহাকে ভুলাইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সে প্রখর বুদ্ধিশালিনী এবং সচ্চরিত্রা।

তোডর্ম্মল্ল—

তবে তাহাকে উদ্ধার করা কঠিন হইবে না। আমি গুপ্তচর দ্বারা সন্ধান লইতেছি। সন্ধান হইলেই, উদ্ধারের উপায় হইবে। ইতি মধ্যে বাদসাহকে জানাইয়া প্রকাশ্য ভাবে যদি কোন উপায় করিতে পারি তাহাও করিব। এক্ষণে দায়ুদখাঁর সংবাদ কি? আর আপনাদের যোগাড় যন্ত্রেরইবা কতদূর কি হইল? আপনার রাজোপাধি এবং জমীদারী পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন কি?

রতিকান্ত—

না মহারাজ! দুয়ের কিছুই পাই নাই।

তোডর্ম্মল্ল—

কি বাদসাহেব হুকুম অমান্য করিয়াছে ?

বতিকান্ত—

শুধু অমান্য নহে; অবজ্ঞা কবিয়াছে। হুকুম শুনিয়া সভামধ্যে যারপব নাই বিবক্তি প্রকাশ কবিতে সংকুচিত হয় নাই।

তোডর্ম্মল্ল—

দাযুদখাঁ পতঙ্গেব মত পুড়িয়া মবিবে। নির্ব্বোধ এই সে দিনকার পরাজয় ইতি মধ্যেই বিস্মৃত হইয়াছে।

যাহা হউক কত দিন মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ কবাইতে পাবিবেন ? বাদসাহের সৈন্য সামন্তেব অপ্রতুল নাই। আপনাবা প্রস্তুত হইলেই বিপুল সৈন্য প্রেবিত হইবে। তবে দেশের লোকেব মনোভাব পবিজ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন। সেই নিমিত্তই আপনাকে আহ্বান।

রতিকান্ত—

মহাবাজ! আবাল বৃদ্ধ বনিতা পাঠানের উপব খড়্গহস্ত। আমি জমীদার, তালুকদাব, জোতদার এবং নানাস্থানের প্রধান প্রধান প্রজাবর্গকে বশীভূত কবিয়াছি; সকলেই মোগল আগমনেব অপেক্ষা কবিতেছে। ইহা ভিন্ন বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য সংগ্রহ কবিয়াছি, একটী সুদৃঢ় এবং সুরক্ষিত দুর্গও প্রস্তুত হইয়াছে। অ.ব বিশ পঁচিশ সহস্র সৈন্যের এক বৎসবেব উপযোগী বসদ সংগ্রহ কবা হইয়াছে।

তোডর্ম্মল্ল—

আমরা অতি দক্ষ লোকেব সাহায্য প্রার্থনা কবিয়াছিলাম। আপনাব ন্যায় উপযুক্ত বন্ধুব সাহায্য পাইলে, বাঙ্গালা বিজয় করিতে কয়দিন লাগিবে ?

বতিকান্ত—

মহারাজ! গৌড়ের নিকটবর্ত্তী ধনশালী জমীদার বিশ্বনারায়ণ চৌধুরী,

মোগল সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষায় দিন গণনা করিতেছেন; পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান জমিদার সত্যেন্দ্রশিখর রায়, পাঠানের প্রতি যারপরনাই বিরূপ হইয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে অনেক জমীদার ও তালুকদার আছেন। বীর-ভূমির শশীশিখর রায়; বগুলার বলেন্দ্রকুমার ভূপ, উড়িষ্যার দীর্ঘতিলক গজপতি, বর্দ্ধমানের অধরেশ চন্দ্র ত্রিপদী, বিহারের সুখবর্দ্ধন সিংহ প্রভৃতি ব্যাকুলভাবে আপনাদের অপেক্ষা করিতেছেন। কেশবপুরের উমাশঙ্কর, দায়ুদের পরম বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তিনি এখন ঘোরতর বিরোধী। কেবল কমলনারায়ণ রায় আর পাঠান জায়গীরদারগণ বাদসাহের বিপক্ষ। মহারাজ! পাঠান অত্যাচারে দেশ ছারখার হইল; আর সহ্য হয় না। বলুন মহারাজ! আপনি হিন্দুকুলচূড়ামণি হইয়া, হিন্দু ভ্রাতার নিকট মনের কথা গোপন করিবেন না বলিয়াই, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া বলুন, এ অত্যাচার-বহ্নি কি মোগল শাসনেও প্রজ্জ্বলিত থাকিবে? না—আমরা মোগল শাসনের শান্তিবারিতে সুশীতল হইতে পারিব?

তোডর্ম্মল—

রায়জি! শুনিয়াছি—তুমি বিষয়বাসনাবিরহিত ঋষিতুল্যপুরুষ; যাহা করিতেছ কেবল পরের উপকারের জন্য, আর স্বদেশের হিতের জন্য। অতএব তোমার নিকট সত্য গোপন করা উচিত নহে। মুসলমান মাত্রই দুরন্ত ও দুর্দ্ধর্ষ। আবার বিলাসিতায় উহারা একান্ত অন্ধ হইয়া যায়; উহাদের নিকট হইতে চিরশান্তি আকাঙ্ক্ষা দুরাশা।

আমি হিন্দু হইলেও রাজানুগৃহিত এবং রাজভক্ত। অতএব আমার মুখ হইতে এ সকল কথা বাহির হওয়া উচিত নহে। তবে এক কথা এই বলিতে পারি যে, উপযুক্ত অধিনায়কের অধীনে চালিতে হইলে, উহাদের উদ্দাম প্রকৃতি প্রশমিত হইতে পারে। আমার বঙ্গশাসন সময়ে উহাদের

উচ্ছৃঙ্খলতার লাঘব হইয়াছিল। সে কার্য্য যে শুদ্ধ আমার নিজ শক্তিতে হইয়াছিল তাহা নহে। বাদসাহ আমাকে অতিশয় স্নেহ এবং বিশ্বাস করেন বলিয়া, আমি যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে পারিয়াছিলাম। এবার বঙ্গ বিজয় হইলে মানসিংহ শাসনকর্ত্তা হইয়া যাইবেন। তিনি মনে করিলে, মোগল শাসনে অমৃত ফল উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু তাঁহা দ্বারা তাহা হইবে না। হইবে না এই জন্য যে, মোগল শাসনের সুযশ, তাঁহার বাঞ্ছনায় নহে। মোগল হইতে ধন মান ঐশ্বর্য্যে তিনি সর্ব্বোচ্চ হইয়াছেন, অথচ তিনি মোগল হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন। তিনি রাজভক্ত বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তাঁহার রাজভক্তি নাই।

সে যাহাহউক পাঠান অপেক্ষা মোগল অনেক উন্নত ও উদার আর পাঠান যেরূপ অর্থপিশাচ, ইহারা সেরূপ নহে। তবে অতি বিলাসী বলিয়া ইহাদেরও অর্থাকাঙ্ক্ষা বড় প্রবল। এক্ষণে বেলা অধিক হইয়াছে, আপনি বজরায় গমন করুন। আমি বাদসাহকে জানাইয়া আপনার অভ্যর্থনার যথাযোগ্য আয়োজন করিয়া দিব। আগামী কল্য আপনি বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার রাজদূতস্বরূপ সরকারীভাবে আহূত হইবেন। আর সেই কন্যাটীর জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। তাহার উদ্ধারের সমুচিত ব্যবস্থা আমি করিব। রতিকান্ত রায় অভিবাদন করিয়া বিদায় হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুইটী রমণী।

কাণপুরের একটী দ্বিতল প্রকোষ্ঠে দুইটী অনিন্দ্যসুন্দরী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। জ্যেষ্ঠা এখনও যৌবনসীমা অতিক্রম করেন নাই। কনিষ্ঠা পূর্ণযুবতী।

জ্যেষ্ঠা উজ্জ্বলশ্যামাঙ্গী, দীর্ঘাকার, স্থূল ও কৃশ দুয়ের মাঝামাঝি; তাঁহার নাসিকা বাঁশীর মত সরল না হইলেও যেরূপ হইলে স্ত্রীলোককে ভাল দেখায় সেইরূপ। চক্ষু, মুখ এবং শারীরিক গঠন সকলই ঐ মত। অর্থাৎ তিনি সাগরছেঁচা মণির মত অতি অপূর্ব্ব, বা ডেনাকাটা পরীর মত অবনীতুল্লভা সুন্দরী নহেন। ফল মোটের উপরে তাঁহাকে সুন্দরী বলা যায়। কনিষ্ঠার রূপে ঘর আলো।

জ্যেষ্ঠা—

দিদি! অমন করে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া শরীর মাটি কল্লে কি হবে ভাই! আহা! এমন সোণার রং কাল হয়ে এসেছে? তা দিদি! আমি একটা কথা বলি; আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী—তাই বলিতেছি; নতুবা বলিতাম না। তুমি এত ভাব কেন? লোকে তপস্যা করে যাহা না পায়, তোমার অদৃষ্টে অনায়াসে তাহা ঘটিতেছে। ইহাতেত আমি ভাবনার বা ক্রন্দনের কোন কারণ দেখিতে পাই না। শুনিয়াছি—সাহজাদা সেলিম তোমার জন্য পাগল। তিনি তোমার রূপের কথা শুনিয়া, শুনিয়াই বা বলি কেন? তোমাকে এই গৃহের বারান্দায় দেখিয়া, মোহিত হইয়াছেন। তোমার অদৃষ্টে বোধ হয় একদিন দিল্লীর সিংহাসন

লাভ হইবে। সেলিমসাহাকে পাইবার জন্য কত পরমাসুন্দরী কায়মনে প্রার্থনা করিতেছে।

কনিষ্ঠা—

ভাই! আমি দিল্লীর সিংহাসনও চাহি না, আর সেলিম-সাহাকেও চাহি না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা কবি, যেন আমার স্বামী-পদে মন থাকে।

জ্যেষ্ঠা—

ভাই! প্রথম প্রথম দিন কতক ঐ বকম মনের গতি থাকিবে; পবিশেষে পবিবর্ত্তন হইবে। যোধাবাইএব কথা ভাবিয়া দেখনা কেন' যোধা অনেক কান্নাকাটনা করেছিলেন; ধর্ম্মত্যাগ কবিবেন না প্রতিজ্ঞা কবেছিলেন, তা'শেষ বাখ্‌তে পাল্লেন কই? এখন সম্রাট্‌গত প্রাণা। যোধা এখন বাজরাজেশ্বরী।

কনিষ্ঠা—

দিদি! আমি পৃথিবীর সাম্রাজ্ঞী হইতে চাহিনা। আমাব পতিদেবতাকে আমি বাজারবাজা মহাবাজা বলিয়া জানি। আমি সেই বাজাধিরাজচবণে বিক্রীতা আছি। যেন চিরদিনই তাহাই থাকি। আমাকে সে চবণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে কাহাবও সাধ্য হইবে না। আমি বাজ্য নহি যে, সৈন্য সামন্ত লইয়া আমাকে পবাজিত করিবে; মণিরত্ন নহি যে, বলে অপহবণ কবিবে। আমার প্রাণেব উপর ক্ষমতা কাহারও নাই। সেলিমের হস্তে পড়িতে হইলে, এ প্রাণ কখনই থাকিবে না। অনশন, উদ্বন্ধন প্রভৃতি কত উপায় আছে।

জ্যেষ্ঠা—

দিদি! এইবার প্রাণের কথা বলি। তুমি খাটীসোণা জানিলে, এতক্ষণ এত কথা বলিতাম না। কসিয়া দেখিবার জন্য এবং

পরীক্ষা করিবার জন্য অনেক কথা বলিয়াছি। সে সকল মার্জ্জনা কর। আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কেহ বলপূর্ব্বক তোমাকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতে পারিবে না। আর যাহাতে তোমার উদ্ধার হয়, আমি প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। দরজায় আঘাত হইতে লাগিল। জ্যেষ্ঠার ইঙ্গিতে কনিষ্ঠা গৃহান্তরে গমন করিলে, দৌলতরাম গৃহে প্রবেশ করিল।

দৌলতরাম—

কতদূর কি করিলে? সাহজাদা বড়ই অস্থির হইয়াছেন। কন্যা-টীকে সম্মতা করিয়া লইয়া যাইবার তাঁহার ইচ্ছা। আর একার্য্য সাধন করিতে পারিলে যে আমার বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহা বোধ হয় তোমার অবিদিত নাই। আমি তোমাকে একসুট মূল্যবান্ জড়োয়া অলঙ্কার দিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

জ্যেষ্ঠা—

জড়োয়া গহনাই দাও আর আকাশের চাঁদই দাও, একার্য্য আমা হইতে হইবে না।

দৌলতরাম—

বল কি, এই সামান্য কার্য্য তোমাদ্বারা হইবে না? ভারতবর্ষের ভাবী সম্রাটের মহিষী হইবে, এ দুর্ল্লভ প্রলোভন দেখাইয়াও তাহাকে সম্মতা করাইতে পারিবে না? ইহার জন্য কতশত রমণী কায়মনে কামনা করিতেছে।

জ্যেষ্ঠা—

প্রার্থনা যে করিতেছে, সে মহিষী হইবে। যে করেনা সে হইবে কি প্রকারে?

দৌলতরাম—

তবে এক কার্য্য কর। ভয় দেখাও। বল যে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে। ইহাতে রাজি হইতে পারে।

জ্যেষ্ঠা—

যাহার প্রাণের মায়া নাই, তাহাকে আবার কিসের ভয় দেখাইব? আমি ভয়, মিত্রতা, প্রলোভন কিছুই বাকী রাখি নাই।

দৌলতরাম—

তার পর?

জ্যেষ্ঠা—

তার পর আর কি? তাহাকে সম্মত করান কাহারও সাধ্য নহে। সে খাঁটীসোণা। আমি একটা কথা বলি, রাখিবে কি?

দৌলতরাম—

বল বল, তোমার কথা রাখিব না?

জ্যেষ্ঠা—

বলি এত ঐশ্বর্য্য লইয়া করিবে কি? পুত্র নাই, কন্যা নাই, ভবিষ্যতে ভোগ করিবার কেহ নাই; এইজন্য বলি, যাহা করিয়াছ তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক। আর পাপের বোঝা বাড়াইও না। এ কার্য্য পরিত্যাগ কর।

দৌলতরাম—

সাজাদার অনুগ্রহলাভ, ভাবী সম্রাটের প্রিয়পাত্র হওয়া কি সকলের ভাগ্যে ঘটে?

জ্যেষ্ঠা—

আর ভাবী সম্রাটের অনুগ্রহে কি হইবে? এত অর্থ খাইবে কে?

আর ভাবী সম্রাটের প্রিয় কি অপ্রিয় হইবে তাহার স্থিরতা কি. ভাবী সম্রাট্ যখন মসনদে বসিবেন, তখন কি তাঁহার এ প্রকার মতিগতি থাকিবে? তখন হয়ত দুষ্ক্রিয়ার সহচর বলিয়া তোমার প্রতি দারুণ ঘৃণা হইবে। হয়ত এসকল ঐশ্বর্য্য বলপূর্ব্বক ধনাগারে জব্দ করিয়া লইবেন। তাই বলি আর পাপের প্রশ্রয় দিও না। পাপকার্য্যের সংস্রব পরিত্যাগ কর। পাঠক! এই দৌলতরাম দস্যুদিগের থানাদার। আগরার অভ্যন্তরে কয়েক দল দস্যুর আড্ডা হইয়াছে। তাহারা দূরবর্ত্তী সম্ভ্রান্ত ঘরের সুন্দরী যুবতী আনয়ন করিয়া সাজাদা হইতে আমীর ওমরাহগণকে সরবরাহ করে। রমণীর সৌন্দর্য্য এবং বয়ঃক্রম, তথা ক্রেতার মুক্তহস্ততা অনুসারে ঐসকল রমণী বিক্রীতা হয়। যে কয়েক জন মহাজন দস্যুদিগের নিকট ঐসকল স্ত্রীলোক ক্রয় করিয়া বড় লোকের নিকট বিক্রয় করে, দৌলতরাম তাহাদের মধ্যে একজন। দৌলতরাম জহরতের কার্য্য করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার ধনোপার্জ্জনের প্রধান উপায় এই প্রকারে রমণীসংগ্রহ করিয়া দেওয়া। জ্যেষ্ঠা মহিলা দৌলতরামের পত্নী রত্নবতী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাখি ভ্রাতা।

ভগ্নী কোথায়? বলিয়া, বাদসাহ দরবারের পাঁচ হাজারী মনসবদার সুজনসিংহ দৌলতরামের গৃহে প্রবেশ করিলেন। এস এস ভাই এস, বলিয়া, রত্নবতী হাত ধরিয়া, সুজনসিংহকে আসনে বসাইলেন। সুজন রত্নবতী হইতে বয়সে দুই তিন বৎসরের ছোট। উভয়ে রাখিবন্ধনে ভ্রাতা

ভগ্নী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন। রাখি সম্বন্ধ হইলেও সুজন, দিদিকে সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করেন; রত্নবতীও সুজনকে কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়াই বিবেচনা করেন। দৌলতরামও ইহাতে বড় সুখী। সে দশ জনের নিকট সগৌরবে এই সম্বন্ধের কথা বলিয়া বেড়ায়। বাস্তবিক সুজন-সিংহের যেমন উচ্চকুলে জন্ম এবং বল বীর্য্য ও বীরত্বের যে প্রকার প্রশংসা বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা বা আত্মীয়তা গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। এক সমরেন্দ্র ভিন্ন, সুজনেব তুল্য বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি বাদসাহ সৈনিকশ্রেণীতে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুজন কহিলেন—দিদি! আজ হঠাৎ আহ্বানের কারণ কি? রত্নবতী বলিলেন—ভাই! বড় দায়ে পড়িয়া তোমাকে সংবাদ দিতে হইয়াছে। তোমাব ভগ্নীপতির অর্থাকাঙ্ক্ষার কথা ত তোমার অবিদিত নাই।

আজ কয়েকদিন হইল একটী সুন্দরী যুবতী আনিয়াছে, বলে—সাহজাদা সেলিম সাহাকে দিতে হইবে। শুনিলাম—সেলিম সাহা তাহাকে দেখিয়াও গিয়াছে। কিন্তু সে রমণী সাধ্যাসতী, আমি অনেক লোভ দেখাইয়াছি, অনেক চেষ্টা করিয়াছি। সেলিম কেন, পৃথিবীর আধিপত্য প্রদান করিলেও তাহাকে বশীভূত করিতে কাহারও সাধ্য নাই। সে নিজপতি-পদারবিন্দ ভিন্ন আর সকলই অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে। আমি তাহাকে আশা দিয়াছি; শুদ্ধ আশা দেওয়া নহে; প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, তাহাকে অত্যাচারের হাত হইতে উদ্ধার করিব। সেই জন্য তোমাকে আহ্বান। এক্ষণে যাহা করিলে সেই কুলবতী সতীর সতীত্ব রক্ষা হয়, এবং আমাকেও সত্যপথ বিচ্যুত হইতে না হয় তাহা কর। ভ্রাতার নিকট ভগ্নীর এই সকাতর প্রার্থনা।

সুজন কহিলেন—দিদি! অর্থপিশাচ দৌলতরামের পত্নী হইয়া, তোমার হৃদয়ে এই মহৎ বাসনার উদয় হইয়াছে দেখিয়া, আমি যে কি পর্য্যন্ত

আনন্দিত হইলাম তাহা কি বলিব! আজ তোমার ভ্রাতা বলিয়া আমার সৌভাগ্য গর্ব্ব হইতেছে।

কিন্তু ভগ্নি! এ বড় সমস্যার কথা। সেলিম সাহের বিরুদ্ধে কার্য্য করা বড় সহজ কথা নহে। অতি গোপনে, অতি সন্তর্পণে কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। প্রকাশ হইলে ঘোর বিপদ। আর একটী কথা এই যে, এ কার্য্যে সমরেন্দ্রনারায়ণের সাহায্য লইতে হইবে। সমরেন্দ্র এ সকল কার্য্যে সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হয়। তাহার বিপদের ভয় নাই; অর্থের আকাঙ্ক্ষা বা পদগৌরবের প্রত্যাশা নাই। পরের উপকার করিতে পারিলেই সে কৃতার্থ হয়। বলবানের কবল হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে সমরেন্দ্রই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। ফল যাহাতে একার্য্য সুসিদ্ধ হয় তাহা করিব বলিয়া, সুজনসিংহ বিদায় হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আকবরসাহের নৌরোজা।

আকবর বাদসাহের নৌরোজার বাজার বসিয়াছে। রমণীই ক্রেতা, রমণীই বিক্রেতা। এ বাজারে পুরুষের অধিকার নাই। কেবল একমাত্র বাদসাহেরই এ সখের বাজারে ক্রয় বিক্রয় করিবার ক্ষমতা আছে। বাদসাহ খোস করিয়া এ বাজারের নাম খোসরোজা রাখিয়াছেন। শত শত সীমন্তিনীর সুচারু শিল্পসম্ভারে এই বাজার পরিপূর্ণ হইয়াছে। বাদসাহ লীলাচ্ছলে বিবিধ দ্রব্য ক্রয় করিতেছেন। কোথাও দর লইয়া কষাকষি হইতেছে;

কিন্তু মূল্য দিবার সময় দশগুণ মূল্য দিতেছেন। কোথাও যেন ভ্রান্তিক্রমে এক টাকার পরিবর্ত্তে একটী মোহর দিয়া যাইতেছেন। সুখের ফোয়ারা উঠিয়াছে, আনন্দের লহরী ছুটিতেছে। খোসরোজে যেন প্রীতিপ্রফুল্লতার হাট বাজার বসিয়াছে। মোগল কুলভূষণ আকবর বাদসাহের চরিত্রে কাহারও অবিশ্বাস নাই। সুতরাং দরিদ্র হইতে আমীর ওমরা এবং সামন্ত-সর্দ্দার প্রভৃতি কেহই এ বাজারে পরিবারবর্গকে পাঠাইতে কুণ্ঠিত বা সন্দিগ্ধ নহে। কিন্তু কে জানিত যে, ইহার মধ্যে কূটবুদ্ধি বাদসাহের পাপস্পৃহা অলক্ষ্যে ক্রীড়া করিতেছে? তাহা জানিলে—পবিত্র হিন্দুকুলের অসূর্য্যম্পশ্যা যুবতীকামিনীগণ কখনই এ অপবিত্র ভূমি স্পর্শ করিতেন না, তাহা জানিলে—বলদর্পিত রাজপুত রাজন্যগণ সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেও এ পারিবারিক লাঞ্ছনা প্রাণ থাকিতে স্বীকার করিতেন না। আকবর সাহ অতি সাবধানেই এই নৌরোজার সৃষ্টি করেন। এই নৌরোজা যে বিলাসী সম্রাটের পাপপিপাসা এবং সৌন্দর্য্যলালসার লীলাক্ষেত্র, ঘৃণাক্ষরেও কেহ তাহার সন্ধান করিতে পারে নাই। তাই শত শত সুন্দরী এই মোহন বাগুরায় আবদ্ধ হইয়া, রমণীর সর্ব্বস্বধন সতীত্বরত্ন বিসর্জ্জন দিয়াছে।

কত বিদ্যুদ্দাম বিস্ফারিতা ষোড়শী বালা, এইরূপে সতীত্বের সঙ্গে সঙ্গে কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছে, পতিধনে বঞ্চিতা হইয়াছে, পিতা মাতার স্বর্গীয় স্নেহ হারাইয়াছে।

কেহ বা কলঙ্কের বোঝা মাথায় বহিয়া, তৎপরিবর্ত্তে মহামূল্য অলঙ্কার বিজড়িতা হইয়া, নীরবে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। হায়! হতভাগিনীর সেই অলঙ্কার, সহস্র বৃশ্চিকের ন্যায় তাহাকে শতমুখে দংশন করিয়াছে। তাহার যে রত্ন অপহৃত হইয়াছে, সমস্ত পৃথিবীর মহার্ঘ রত্ন একত্র সমাবেশ করিলেও সে অমূল্য রত্নের সমতুল্য হইবে না।

ছদ্মবেশী সম্রাট্‌ ছলে, বলে, কৌশলে এইরূপ অসংখ্য অবলার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া মহা দর্পিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে, দিল্লীশ্বরকরে আত্ম সমর্পণ করিতে, কোন রমণীই অস্বীকৃতা হইতে পারে না। আজি এই নৌরোজার বাজারে অসংখ্য রমণী আগমন করিয়াছে। সৌন্দর্য্যপিপাসু সম্রাটের পাপচক্ষুঃ অবিরত ঘূর্ণিত হইতেছে। সত্য বটে সম্ভ্রান্ত রমণীগণ যাহাতে দূরে থাকিয়া স্ব স্ব মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন, তজ্জন্য বাদসাহ নিজ ভ্রমণের একটী সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু খোসরোজের প্রবেশও নির্গমপথে এবং অন্যান্য নানা স্থানে যাহাতে দৃষ্টি চলে, এমন করিয়া কতকগুলি গুপ্তগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, সেই স্থান হইতে অনায়াসে সমাগত সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া, বাদসাহ স্বীয় কলুষিত নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন। একটী একটী করিয়া প্রায় সকল সুন্দরীর লাবণ্যছবি বাদসাহনয়নে প্রতিভাত হইল। কিন্তু কোনটীই মনোমত হইল না।

অবশেষে মিবারেশ্বরের ভ্রাতৃদুহিতা লাবণ্যবতীর অনুপম লাবণ্যরাশি, তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। ইহার উপর আবার যখন অবগত হইলেন যে, সেই অতুল রূপরাশির অধিষ্ঠাত্রীদেবী, মহারাণা প্রতাপসিংহের ভ্রাতা শক্ত সিংহের দুহিতা, তখন হৃদয়ের আগুণ দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল। লাবণ্যবতীর রূপরাশি রাজপুতানায় অতুলনীয়, এ কথা তিনি অনেকের মুখেই শুনিয়াছেন। আজি সেই স্বর্গীয়া প্রতিমা সম্মুখে বিরাজিতা। সম্রাট্‌ সংজ্ঞাশূন্য। চিতোর ধ্বংস করিয়া, সহস্র সহস্র রাজপুতশোণিতে করতল কলঙ্কিত করিয়া, যে বংশ কলঙ্কিত করিতে পারেন নাই, আজি সেই বংশের অমূল্য রত্ন, স্বর্গেরজ্যোতিঃ, অনন্ত রত্নের খনি হস্তে পাইয়া কি ছাড়িতে পারেন ? প্রতাপ তাঁহার উন্নত মস্তকে আঘাত করিয়াছে ; প্রতাপের জন্যই তিনি উচ্চাদপি উচ্চ হইয়াও খর্ব্ব হইয়া আছেন।

প্রতাপ যদি তাঁহার সিংহাসনের পার্শ্বদেশে অবনত মস্তকে বসিত, তাহা হইলে তাঁহার দিল্লীশ্বরোহবা জগদীশ্বরোহবা নামের সার্থকতা হইত। তাঁহার যে প্রসাদ লাভে সমগ্র হিন্দুস্থানের অধিরাজগণ লালায়িত হইয়া, কর প্রসারণ করিয়া আছে, এক প্রতাপই তাঁহার সেই প্রসাদ বিজাতীয় ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আজি প্রতিহিংসার সহিত প্রেম-পিপাসা প্রশমিত হইবে। আক্‌বরের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্রাটের প্রবেশসূচক বংশীধ্বনি হইল। সম্ভ্রান্তমহিলাগণ খোস-রোজ পরিত্যাগ করিলেন। লাবণ্যবতীও ত্বরিত গমনে সে স্থান পরি-ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাহির হইবার পথ পাইলেন না। দাবদগ্ধা কুরঙ্গীর ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিতা হইয়া যে একটী পথ পাইলেন, তাহারও তোরণদ্বার বাহির হইতে বদ্ধ। নিকটবর্ত্তী প্রহরীকে খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। সে তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিল না।

তখন বুঝিলেন যে তাঁহার সর্ব্বনাশের সমস্ত আয়োজন সংযোজিত হইয়াছে। বীরবালা আর গত্যন্তর নাই দেখিয়া, শেষের জন্য প্রস্তুত হইলেন। একবার মুদিত নেত্রে পতিপদারবিন্দ ধ্যান করিলেন। উদ্দেশে পতির চরণে প্রণাম করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পতি পৃথ্বীসিংহ, রূপে গুণে মনোহর; সর্ব্বাংশে সমযোগ্য। তিনি সম্রাট্ সৈন্যে প্রবেশ করিয়া বিপুল যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছেন। ইহাভিন্ন বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কবিত্বেও তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির সীমা নাই।

ভট্টচারণগণ সুমধুর গাথাবলী রচনা করিয়া তাঁহার যশোরাশি বিস্তার করিয়াছেন। সতীর হৃদয়ে পতির সেই সকল গুণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার আরাধ্যধন, পতিদেবতা গগনাদপি উচ্চ হইয়া তাঁহার হৃদয়-মন্দির আলোকিত করিতে লাগিলেন। আর আক্‌বর—নগণ্য জঘন্য নারকীয় কীটের ন্যায় বীভৎস আকারে, বীভৎস লীলার অভিনয় করিতেছে

দেখিলেন। সহসা সতীরহৃদয় সহস্রমত্তহস্তীর বলে বলীয়ান্ হইল। যেন শিরায় শিরায় বৈদ্যুতিক তেজ প্রবেশ করিল। কে যেন মাভৈঃ মাভৈঃ রবে অভয় প্রদান করিয়া সতীর শরীরে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ঢালিয়া দিল। জ্যোতির্ম্ময়ী লাবণ্যবতী এখন উগ্রচণ্ডী।

বক্ষঃবস্ত্র হইতে সবলে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া, দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়া রহিলেন। কামাতুরসম্রাট্ ঘৃণিত প্রস্তাব করিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু সে মুখের কথা মুখেই রহিল। দেখিলেন—বীরাঙ্গনার শাণিত ছুরিকা তাঁহার বক্ষোপরি উন্নত হইয়া আছে। হায়! যাহাকে কুসুমকোমলা লাবণ্যরাশি জ্ঞান করিয়া, মনে মনে আশালতা রোপণ করিতেছিলেন, দেখিলেন—সে প্রচণ্ড প্রখর বৈদ্যুতিক অগ্নি।

তখন তাঁহার মোহ ভাঙ্গিল। দিল্লীর সিংহাসন মনে পড়িল; পুত্রকলত্রের স্নেহমাখা মুখচ্ছবি হৃদয়ে উদিত হইল। সম্রাট্ নয়ন মুদ্রিত করিলেন। এতক্ষণে বুঝিলেন কিরূপ জ্বলন্ত অনলে হস্তপ্রসারণ করিয়াছেন।

তিনি স্বভাবতঃ পাষণ্ড ছিলেন না। সেইজন্য এই প্রাথমিক আশাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বিবেকদংশনে ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—আর কখন সতীর অবমাননা করিবেন না।

লাবণ্যবতী সম্রাটের কাতরতা দেখিয়া, প্রচণ্ডতা প্রশমিত করিলেন। কিন্তু উত্তোলিত ছুরিকা পরিত্যাগ করিলেননা। কহিলেন—"ভ্রান্ত সম্রাট্! যদি জীবনের মায়া থাকে, দিল্লীর সিংহাসন ছাড়িতে ইচ্ছা না হয়, তবে প্রতিজ্ঞা কর আর কখন নৌরোজার পাশব লীলার অভিনয় করিবেনা; নতুবা এই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তোমার বক্ষেঃ বসাইয়া দিব।"

আকবর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ঈশ্বরের পবিত্র নামে শপথ করিয়া কহিলেন—"আর কখন সতীর অবমাননা করিব না; নৌরোজার পাশব অভিনয় পরিত্যাগ করিলাম।"

বীরবালা বিদ্যুদ্বেগে বিক্ষিপ্ত রত্নরাজির উপর সগর্ব্বে পাদবিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আর আকবর—সন্ত্রস্ত ও চকিত হইয়া, ভৈরবীর ভীম লীলার আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

তারার সম্বাদ।

আমাদের পূর্ব্ববর্ণিতা শশীমুখীও এই বাজারে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি এখন পাগলিনীও নহেন, সন্ন্যাসিনীও নহেন। তাঁহার এখন রাজরাজেশ্বরী বেশ। রত্নালঙ্কার বিভূষিতা শশিমুখীকে দেখিলে, কে বলিবে যে, এই সেই বিষয়বাসনাবিরহিতা তপস্বিনী শশিমুখী? এখন প্রখরা মুখরার একশেষ হইয়াছেন; হাবভাব লাবণ্যে টলমল করিতেছেন। তাঁহার রূপের ছটায়, কথার ঘটায়, খোসরোজ মাতিয়া উঠিয়াছে। নানা ভাষায় কথা কহিতেছেন; নানা লোকের সহিত মিশিতেছেন; যে, যে প্রকৃতির লোক তাহার সহিত সেই ভাব। যাহার নিকট যাইতেছেন, তাহার হৃদয় আকর্ষণ করিয়া প্রাণের কথা টানিয়া বাহির করিতেছেন। উদ্দেশ্য, তারাসুন্দরীর সন্ধান। নৌরোজার বাজারে অনেক স্ত্রীলোকের আমদানী হইবে মনে করিয়া, তিনি এখানে প্রবেশ করিয়াছেন।

কিয়ৎকাল এখানে, ওখানে, সেখানে, বেড়াইয়া, রাইপুরের অধিকারী সুজনসিংহের রমণীর নিকট গমন করিলেন। সুজনপত্নী

স্বভাবতঃ অহঙ্কৃতা, তাহাতে সাহজাদা সেলিমের শ্বাশুড়ী বলিয়া, অহঙ্কারে মাটিতে পা দেন না।

শশী লোকবশ করিতে মজবুদ্। ক্ষণমধ্যে অধিরাণী তাঁহার বশবর্ত্তিনী হইয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার নিকট কিছু পাইলেন না। কোটা, বুঁদি, শিকাবতী, সিন্ধু, কাশ্মীর, কর্পূর প্রভৃতি রাজরাণী সমূহের সহিত প্রাণেমনে মিশিয়া হৃদয়ের কথা বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন। মনের কথা মিলিল না। রাণী মহারাণী ছাড়িলেন। মধ্যবিদ্ শ্রেণীতে গমন করিলেন। অদ্ভুত ক্ষমতা! রাণী মহারাণীরা তাহাদের সমশ্রেণী মনে করিয়াছিল; আবার এই মধ্যবিদ্‌শ্রেণী আপনাদের লোক মনে করিতে লাগিল। এই শ্রেণীর একস্থানে স্বর্ণালঙ্কার ও জহরাতের দোকান সাজান দেখিয়া, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। আগ্‌রার প্রচুর ধনশালী জহরীগণের পত্নী সকল এই সমস্ত দোকান সাজাইয়া বসিয়াছেন। জহরী লছমন সনাতন হড্ডিমল, শীতলচাঁদ ভগবানচাঁদ প্রভৃতি জহরীগণ বিবিধ মণি মুক্তা এবং জড়োয়া অলঙ্কার সহ স্ব স্ব বনিতা প্রেরণ করিয়াছেন। দৌলতরামের পত্নী রত্নবতীও দোকান সাজাইয়া বসিয়াছেন।

শশিমুখী সর্ব্বপ্রথমে লছমনের পত্নীর নিকট গমন করিলেন। কহিলেন—আমি বারাণসীর একজন ধনী মহাজনের বনিতা। আমার স্বামী বাদসাহ দরবারে থাকেন। আমরা বারানসীতেও থাকি এবং আগ্‌রাতেও সময়ে সময়ে অবস্থিতি করি।

লছমনপত্নী—

তা ভাই! তোমাকেত আর কখন নৌরোজায় আসিতে দেখি নাই।

শশী—

আসিবনা কেন? প্রত্যেক বারেইত আসিয়া থাকি। তবে আমি

দোকান করি না। দোকান করিলে একস্থানে থাকিতে হইত, সুতরাং দেখিতে পাইতে।

লছমনপত্নী—

তা ভাই! তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে বড় সুখী হইলাম। বাদসাহের রং মহলে কাহারও সঙ্গে জানাশুনা আছে কি?

শশী—

আছে বই কি? যোধা বেগম আমাকে বড় ভাল বাসেন।

লছমনপত্নী—

বটে! যোধাবেগমের সঙ্গে আলাপ? তবে তুমিত বড় কেও-কেটা নয় দেখ্‌ছি। আমার ভাই! সুলতান্ দেনিএলের দুইএকটী বেগমের সঙ্গে আলাপ আছে।

শশী—

সুলতান্ দেনিএলের কতগুলি বেগম আছে ভাই!

লছমনপত্নী—

তা বিশ পঁচিশটী হইবে।

শশী—

বল কি? একজনের এত বেগম?

লছমনপত্নী—

বিশ পঁচিশটী শুনিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলে? তবু সেলিমসাহার কথা শুন নাই।

শশী—

কেন, সেলিমের কতগুলি বেগম?

লছমনপত্নী—

সেলিমের বেগমের অন্ত নাই। রোজ্ নূতন নূতন যোগাড় হইতেছে।

শশী—

সে কি প্রকার?

লছমনপত্নী—

ভাই! বড় ঘরের বড় কথা। এ সকল গোপন কথা বলিতে নাই; তবে তোমার সঙ্গে ভাব হয়েছে বলে, পেটের কথা না বলে থাকৃতে পাচ্ছি না। এ কাজের জন্য একদল লোক নিযুক্ত আছে। তারাই যোগাড় করে এনে দেয়। তবে যারা আইসে তারা যে কষ্ট পায় তাহা নহে। বড় লোকের ঘরে বহু সুখ স্বচ্ছন্দে থাকে। ইহার মধ্যে যাহার কপাল ফির্‌বে সেই সিংহাসনে বসিবে। সেলিমসাহাইত বাদসাহ হইবে।

শশিমুখী এতক্ষণে অভীষ্টসিদ্ধির উপক্রম বুঝিয়া বড় সুখী হইলেন। কহিলেন—ভাই! শুনিলাম আজকাল নাকি একটী খুব সুন্দরী মেয়েকে কোথা হইতে ধরিয়া আনিয়াছে?

লছমনপত্নী—

হাঁ ভাই! আজকাল একটী বাঙ্গালী বড়লোকের মেয়েকে আনিয়াছে শুনিয়াছি।

শশী—

সে মেয়েটা বোধ হয় সেলিমের বেগম হইবে বলিয়া আনন্দে অধীরা হয়েছে।

লছমনপত্নী—

না ভাই! তাহা হয় নাই। সে কিছুতেই রাজি হইতে চাহে না। এ প্রকার মেয়ে এই নূতন। আর কখন এমন শুনি নাই। সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে।

শশী—

তা সে এখন কোথায় ?

লছমনপত্নী—

মেয়েটী প্রথমে আমাদের জহুরী দৌলতরামের বাটীতে ছিল; তারপরে শুন্‌চি কে তাহাকে লইয়া গিয়াছে।

শশী—

আর কে লইয়া যাইবে ? সেলিমসাহার লোকই লইয়া গিয়াছে।

লছমনপত্নী—

না দৌলতরামইত সেলিমের লোক। সেখান হইতে সেলিমের লইয়া যাইবার আবশ্যকতা ছিল না। দৌলতরাম বলিতেছে—সেনাপতি সমরেন্দ্রের কাজ।

শশী—

সমরেন্দ্র কে ? তিনিও কি সেলিমের লোক ?

লছমনপত্নী—

সমরেন্দ্র রাজা বিক্রমজিতের অধীনে একজন মনসব্‌দার। বিক্রমজিৎ তাঁহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছেন। তিনি অতি দয়ালু। পরোপকার তাঁহার জীবনের ব্রত। তা, তিনি কি এত নির্ব্বোধ যে, আজ পরে কালি যে সম্রাট্ হইবে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন ? কেহ কেহ বলে, দৌলত-রামের পত্নী রত্নবতীর রাখী-ভ্রাতা সুজনসিংহ মেয়েটীকে উদ্ধার করেছেন। তা, তিনিও একজন মনসব্‌দার। শশিমুখীর কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে। এইবার উঠিবার চেষ্টা। দুই একটা কথাবার্ত্তা কহিয়া শশী বিদায় লইলেন। একবারে রত্নবতীর কাছে না গিয়া, অপর দুই একটী জহুরীণীর নিকট গমন করিলেন। সেখানে ফাঁকা কথা। পরিশেষে রত্নবতীর নিকট হাজির হইলেন

শশীমুখী রত্নবতীর নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে সকল কথা বাহির করিয়া লইলেন। রত্নবতী চতুরা বটে, কিন্তু শশীর সহিত কতক্ষণ চাতুর্য্য করিবেন? তিনি তারার উদ্ধার, সুজনসিংহের বাটীতে তাহার অবস্থিতি প্রভৃতি সমুদায় বলিয়া ফেলিলেন। শশী দেখিলেন, রত্নবতীর অনুতপ্ত এবং উষর হৃদয় উর্ব্বর হইয়া, ধর্ম্মবীজ বপনের উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি রত্নবতীর বাটীর ঠিকানা জানিয়া লইয়া বিদায় হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ভীল বালক।

রাজপুতানার অন্তর্গত রাইপুরের রাজা সুজনসিংহ, মোগল রাজধানীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। তিনি সাজাদা সেলিমসাহার শ্বশুর; সুতরাং বাদসাহের বৈবাহিক। কিন্তু বৈবাহিকের যে প্রকার আদর অভ্যর্থনা হওয়া উচিত, তাহার কিছুই নাই। যাহারা ক্ষুদ্র হইয়া, উচ্চের সহিত মিশিতে চাহে; যাহারা আত্মমর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অবৈধ এবং অন্যায় তোষামোদ করে; তাহাদের দশা এই রূপই হইয়া থাকে। সুজনসিংহ স্বীয়রাজ্যের নিকটবর্ত্তী ভীলসর্দ্দার হুতানকে বাদসাহ দরবারের শোভা এবং রাজধানীর সমৃদ্ধি দেখাইবার জন্য সমভিব্যাহারে আনিয়াছেন। হুতান মনে করিয়াছিলেন, বৈবাহিকের বন্ধু বলিয়া বাদসাহের নিকট সমাদৃত হইবেন। কিন্তু তাঁহার মনের কল্পনা, মনেই রহিল। হুতান শান্তপ্রকৃতি বলিয়া মনের ক্লেশ চাপিয়া

রাখিলেন। কিন্তু সমভিব্যাহারী স্বাধীনতাপ্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র মুঞ্জার হৃদয়ে এ অপমান, শেলসম বিদ্ধ হইল। মোগল বাদসাহ এবং মুশলমান জাতির প্রতি তাহার আক্রোশের সীমা রহিল না। মুঞ্জা ষোড়শ বর্ষীয় বালক। আকৃতি প্রকৃতিতে সাধারণ ভীল হইতে তাহার কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সে ভীলদিগের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বটে, কিন্তু তত খর্ব্বাকৃতি নহে। সরল বটে, কিন্তু নির্ব্বোধ নহে; উদ্ধত বটে, কিন্তু একবারে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া কার্য্য করে না। তাহার দেহ বগিষ্ঠ, চক্ষুর আয়তন দীর্ঘ এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক।

ফলতঃ মুঞ্জা সুপুরুষ না হইলেও কুৎসিত নহে। একদিন মুঞ্জা দুইটী ভীল বালকের সহিত আগ্‌রার রাজপথে ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময়ে দুইটী মুসলমান সৈনিক সেই পথে আগমন করিল। তাহারা ভীলবালক দেখিয়া, কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। নিকটে আসিয়া কহিল—ওরে বন্যপশুগণ! সভ্য জাতিকে কি প্রকারে সম্মান করিতে হয় তাহা জান না। আইস শিখাইয়া দিতেছি। বলিয়া—কটিস্থিত কোষবদ্ধ অসি লইয়া সানুচর মুঞ্জার মস্তকে সবলে আঘাত করিল। সঙ্গী ভীলবালকদ্বয়, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কিন্তু মুঞ্জা নীরবে সে আঘাত সহ্যকরিয়া, হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা দ্বিগুণবলে দুই সৈন্যের মাথায় আঘাত করিল। নিষ্ঠুর সৈনিকদ্বয় অসি কোষমুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার আঘাতে উদ্যত হইল। একবারে দুই অসি মুঞ্জার মস্তকে উত্তোলিত হইয়াছে। সে অসির আঘাতে মুঞ্জার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইবে সন্দেহ নাই। অসি পড়িল; কিন্তু মুঞ্জার মস্তকে পড়িল না। আর একখানি অসি একবারে দুই অসিতে প্রতিঘাত করিল। তত্রাচ একজন সৈনিকের অসির অগ্রভাগ মুঞ্জার মস্তকে বিদ্ধ হইল। আঘাত গুরুতর না হইলেও প্রবল বেগে

শোণিত ছুটিতে লাগিল। প্রতিঘাতকারী অবিলম্বে ক্ষত স্থান চাপিয়া ধরিলেন। শোণিত বন্ধ হইল। হাত ছাড়িয়া দিলেন; আবার রক্ত ছুটিল। এ কাহার অসি? এ শুশ্রূষাকারী কে? সমরেন্দ্রনারায়ণ। সমরেন্দ্রনারায়ণ অঙ্গ বস্ত্র ছিন্ন করিয়া, আঘাত স্থান বাঁধিয়া দিলেন। শোণিতস্রাব নিবারিত হইল। সৈনিকদ্বয় সমরেন্দ্রকে লক্ষ্য না করিয়া গালি দিতে লাগিল এবং আঘাত করিতে উদ্যত হইল। পরে চিনিতে পারিয়া পলায়ন করিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার অল্পে অল্পে গোধূলির আলোক ঢাকিয়া দিতেছিল; তাই তাহারা সেই অন্ধকারের সাহায্যে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইল; কিন্তু তাহাদের মনসব্দারের চক্ষুঃ যে তাহাদের পরিচ্ছদ সংলগ্ন, নামাঙ্কে পতিত হইয়াছে, হতভাগ্যগণ তাহা বুঝিতে পারিল না। অপরিমিত শোণিতপাতে মুঞ্জার শরীর দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছে; সে ঢলিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল। সমরেন্দ্র সযত্নে মুঞ্জার মস্তক বক্ষেঃ টানিয়া লইলেন। তাঁহার বক্ষেই মুঞ্জার মূর্চ্ছা হইল। মূর্চ্ছিত মুঞ্জাকে বক্ষেঃ লইয়া ভীলবালকদ্বয়ের সাহায্যে সমরেন্দ্র মুঞ্জাকে হুতানের আলয়ে আনয়ন করিলেন। চক্ষুঃ, মুখ এবং মস্তকে জলের ছিটা দিয়া মুঞ্জার মূর্চ্ছা দূর করিয়া, দুগ্ধ ও বেদনারস পান করাইলেন। মুঞ্জার সম্পূর্ণ সংজ্ঞা হইয়াছে। তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা সমরেন্দ্রকে শতশত ধন্যবাদ দিয়া, হৃদয়ের ভার লাঘব করে; কিন্তু সমরেন্দ্র তাহাকে উঠিতে ও কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। হুতান আসিয়া সহস্র ধন্যবাদ দিল এবং কাতরকণ্ঠে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল; আর কহিল—মহাশয়! আপনাকে আর অধিক কি বলিব? আজি আমাদের রোহিয়া বংশ নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছিল। আমার বংশের এই একটী মাত্র সন্তান জীবিত আছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমার ও ইহার মাতার মৃত্যু হইত। আপনি রাজরাজেশ্বর হউন; ভগবান্

আপনাকে দীর্ঘজীবী ও চিরসুখী করুন। সুজনসিংহ আসিয়াও যথেষ্ট সৌজন্য প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। মুঞ্জার নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে দেখিয়া, সমরেন্দ্র সেদিনকার মত বিদায় হইলেন। রজনীতে মুঞ্জা "সেই দয়াব সাগর" বলিয়া, দুই একবার প্রলাপ চীৎকার করিয়াছিল। প্রভাতে চিকিৎসকসহ সমরেন্দ্র আসিলেন। চিকিৎসক, আঘাত সামান্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন; এবং একটী প্রলেপের ব্যবস্থা দিলেন। বলিলেন—দুই দিন মধ্যে ক্ষত আরোগ্য হইবে। তাহাই হইল।

সমরেন্দ্রের চেষ্টায় সৈনিক দুইজনের সামরিক বিচার হইল। সুজন-সিংহও সেলিমসাহাকে বলিয়া তাহাদের গুরুদণ্ডের বিধান করাইলেন।

মুঞ্জা নতজানু হইয়া, সমেরেন্দ্রের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। বলিল—"দয়ার সাগর তুমি; তোমার জন্যই এই অধম ভীল-বালকের জাবন রক্ষা হইল। যদি কখন সময় পাই, প্রাণ দিয়াও এ উপকারের প্রতিশোধ দিবার চেষ্টা করিব।"

সমরেন্দ্র হাসিতে হাসিতে মুঞ্জাকে আলিঙ্গন কবিলেন। মুঞ্জা সেই মহোপকারী বন্ধুর শরীবে দুইটী চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া রাখিল। চিহ্ন—কর্ণপার্শ্বে একটী আঁচিল এবং ললাটে একটী তিল।

———

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভিখারিণী।

ভিখারিণী গান করিতে করিতে সুজনসিংহের বাটীর দিকে আসি-তেছে। আগ্রা সহর অতিক্রম করিয়া তণ্ডুলার দিকে আসিতে কতক-গুলি গণ্ডগ্রাম আছে। তাহারই একটী জনাকীর্ণ গ্রামে সুজনসিংহ অবস্থিতি করেন।

ভিখারিণী গ্রামে প্রবেশ করিয়াই গান ধরিল। ভাবিল—সুজনসিংহের বাটী যেখানেই হউক, তাহার গান শুনিতে পাইলেই তারা ডাকিয়া লইবে।

গান—

হারায়ে প্রাণের পাখী পাগলিনী সই।
কোথা গেল পলাইয়ে খুঁজে সারা হই॥
বড় ভাল বাসি তারে,
সেও ভাল বাসে মোরে,
তাই গো তাহার তরে বেদনার বোঝা বই।
কেউ যদি দেখিয়ে থাক,
বলে দিয়ে প্রাণ রাখ,
নতুবা তাহারই তরে পরাণ থাকে গো কই?

ঝনাৎ করিয়া একটী বাটীর খিড়কির দরজা খুলিয়া, একটী স্ত্রীলোক ভিখারিণীকে আহ্বান করিল।

ভিখারিণী আবার গান ধরিল—

আমি ভিখারিণী নারী, ভিক্ষা মেগে খাই।
যেখানে ডাকিবে যাব তাহে বাধা নাই॥
তারা যদি থাকে সুখে,
বসে যাব বুক ঠুকে,
কত গান গাব তথা যত ইচ্ছা চাই।

ভিতর হইতে তারাসুন্দবী কহিল—শশী দিদি! তোমার তারা প্রাণে মরে নাই; কিন্তু বড় অসুখে আছে।

শশী গাহিল—

সিংহাসন ঠেলিয়াছ চরণে তোমার।
ইহার অধিক সুখ কিবা আছে আর।
পিতামাতা ধন্য তোব,
সুখেব নাহিক ওর,
ধন্যা আমি ধর্ম্ম শিক্ষা ধন্য গো আমার।
অমূল্য অতুল্য তুমি নারী সারাৎসার॥

শশিমুখী ভিতরে আসিয়া বলিল, অনেক কষ্টে সন্ধান করেছি দিদি এখানে কতদিন এসেছ?

তারা—

শশী দিদি! তোমার আবার কষ্ট? ক্ষমতা অদ্ভুত। কোথায় ছিলাম, কোথায় আছি, সব সন্ধান জানা হয়েছে।

শশী—

সন্ধান লইতে হইলে আবার ন্যাজা মুড়া বাদ দিব কেন? এখন বাটীতে চল।

তারা।

রায় মহাশয় কোথায় আছেন?

শশী—

আগ্‌রায় তাঁহার জন্য বাটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অটল পাহাড় তোমার জন্য টলিয়াছেন; আর বাটীর সকলেই তোমার জন্য কাতর।

তারা—

কাতর হয় নাই কেবল শশী দিদি।

শশী—

শশী দিদির যে কাজ? কাতর হইবার সময় কখন? এ, ত, সুজন-সিংহের বাটী। সমরেন্দ্র কোথায় থাকেন?

তারা—

তিনি আগ্‌রায় থাকেন। শশী দিদি! মানুষ এত উচ্চ হয় তাহা জানিতাম না। তিনি মানুষ নহেন দেবতা।

শশীমুখী মনে মনে বলিলেন—আগুণ ধরেছেরে। এ, ত, শুধু ধুম দেখ্‌ছি; যাহা হউক আর বাড়াবাড়ী না হয়। বলিয়া, তারাকে কহিলেন—তিনিইত তোমাকে উদ্ধার করেছেন?

তারা—

তিনি বই কি? তবে সুজনসিংহও তাঁহাকে সাহায্য করেছেন। দিদি! যেমন বীরত্ব, তেমনি মহত্ব; আর যত্নের কথা কি বলিব?

শশী—

সুজনসিংহ কেমন লোক?

তারা—

তিনিও মন্দ লোক নহেন।

শশী গাহিলেন—

ইষ্টদেব দুই নহে, এক মাত্র সার।
তাঁহারে তুলনা করি কে করে বিচার?
সেই পদে মন যার,
সেকি ভাবে অন্য আর,
হৃদয়ে বিরাজে মূর্ত্তি সেই দেবতার।

শশী আবার বলিলেন—দিদি? এই গানটার ভাবার্থ কিছু বুঝ্‌লে কি? তারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—দিদি! তুমি অন্তর্যামিনী।

শশী—

অন্তর্যামিনীই হই আর যাহাই হই, সাবধান! তারা! সাবধান!

তারা—

সেই মুখ, সেই চক্ষুঃ, সেই স্বর, কেবল বয়স আর পরিচ্ছদের বিভিন্নতা। তা-বয়স এতদিনে ঐ রকমই হবে।

শশী—

এক হয়ে দুই হ'তে কতক্ষণ! শশীর স্বর একটু রুক্ষ।

তারার হৃদয়ে তুফান বহিতেছে। বলিলেন—দিদি! তুমি দেবী। তোমার নিকট গোপন করিবার কি আছে? আমি দিল্লীর সিংহাসন চরণে ঠেলিয়াছি; কোন প্রলোভনে আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না বলিয়া আমার বিলক্ষণ অহঙ্কার আছে। কিন্তু এ আকর্ষণ কেন হয়? দিদি! সমরেন্দ্রসিংহ আমার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি; কিন্তু তাই বলিয়া হৃদয় টলে কেন? দিদি! আমায় রক্ষা কর। আমায় নরকের পথ হইতে তুলিয়া দাও। আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া উন্নত করিয়াছ; এক্ষণে এই ঘোর বিপদ সমুদ্রে আমার এই বিক্ষিপ্ত তরণীর কর্ণধার হও। বলিয়া—তারা মূর্চ্ছিতা হইলেন।

শশী অতিযত্নে তারার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়া, ক্রোড়ে শয়ন করাইলেন। তারা শশিমুখীর শীতলক্রোড়ে স্থানলাভ করিয়া, যাতনাদগ্ধ প্রাণে শান্তি পাইল। মনে মনে বলিতে লাগিল—ভাগ্যে শশী দিদি আসিয়াছিল, নহিলে কি সর্ব্বনাশই হইত! হায়রে দুর্ব্বল হৃদয়! এই তোমার দৃঢ়তা? এই তোমার শিক্ষা দীক্ষা? সমরেন্দ্র যাহাই হউন, আমার হৃদয়-দেবতা হইতে কখনই শ্রেষ্ঠ নহেন। তবে তোমার এ চাঞ্চল্য, এ দুর্ব্বলতা কেন? হৃদয়দেব! একবার দেখা দাও। প্রত্যক্ষে না হয় অন্তরে আসিয়া দাঁড়াও। আমি ঐরূপ ধ্যান করিতে করিতে উপস্থিত দুর্ব্বলতা হইতে পরিত্রাণ পাই।

শশী বলিলেন—তারা! কি চিন্তা করিতেছ?

তারা, কাতরা হইয়া কহিল—শশী দিদি! আমার উপায় কি হইবে? দিদি! তুমিত বলিযাছ—

একঃস্বত্বা পূরিতানন্দরূপঃ পুণ্যোব্যাপী বর্ত্ততে।

আরও বলিয়াছ—

পতিরেকগুরুস্ত্রীণাং।

তা দিদি! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

শশী গাহিলেন—

পতি ধ্যান পতি জ্ঞান পতির চরণ।
এ সংসারে সার দিদি ভাবিবি এখন॥
তাহা বিনা কিছু আর,
প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার,
নেই গো অবলা বিধি শাস্ত্রের লিখন।

"তবে আসি" বলিয়া, শশিমুখী বিদায় হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মুঞ্জা মহারাজ।

মুঞ্জার আগ্‌রা হইতে প্রত্যাগমনের পর আট বৎসর গত হইয়াছে মুঞ্জা এখন পূর্ণযুবা পুরুষ। তাহার বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে; শরীরে বিশেষ শক্তিসঞ্চার হইয়াছে; মুঞ্জা এখন রাজা। পহ্লন নামক ভীল প্রদেশের আধিপত্য পাইয়াছে। ফলতঃ সমস্ত ভীল প্রদেশের মুঞ্জা এক প্রকার প্রভু বলিলেই হয়। ভীলগণ মুঞ্জাকে ভয়, ভক্তি এবং সম্মান করে, মুঞ্জারাজা বলিয়া থাকে। মুঞ্জারাজার বাদসাহের উপর বড়ই আক্রোশ। এই জন্য সে মোগল অধিকার ও বাদসাহের অনুগত রাজাদিগের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া লুঠপাঠ করিয়া থাকে।

এইরূপ লুঠপাঠ করে বটে, কিন্তু মুঞ্জা কখন দরিদ্রপীড়ন করে না। সে বিপন্নের সাহায্যকারী, দুঃখীর দুঃখহারী; কিন্তু দর্পীর দর্পনাশক এবং দুর্দ্দান্তের যম। বাদসাহের বিপক্ষ বলিয়া, উদয়পুরের মহারাণাকে মুঞ্জারাজা বড় শ্রদ্ধা করে; আর সম্রাটের কুটুম্ব ও অনুগত বলিয়া সুজনসিংহকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। সুজনসিংহ তাহার জন্য সময়ে সময়ে বড় বিব্রত হইয়া থাকেন। মুঞ্জার দুর্দ্ধর্ষ ভীলসৈন্যের গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? সম্মুখসমরে পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিলে, তাহারা পর্ব্বতের গাত্রে লুক্কায়িত হয়, অথবা এক শৃঙ্গ হইতে অন্য শৃঙ্গে লম্ফ দিয়া পলায়ন করে। মানুষের যাহা সাধ্য নহে, তাহারা তাহা করে। সুতরাং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে।

কিন্তু আমাদের এই মুঞ্জারাজা একজনের নিকট শক্তিশূন্য হইত; দিশা হারা হইয়া যাইত। শেফালীপ্রণয়ে-অন্ধ ভীলরাজ, আপন জ্ঞান গৌরব হারাইয়া শেফালীর সহিত ক্রীড়া করিত। শেফালী নাচাইলে নাচিত, বসাইলে বসিত, উঠাইলে উঠিত।

মুঞ্জা শেফালীকে ধরিতে যাইতেছে; শেফালী ধরা দেয় না; ছুটিতেছে; মুঞ্জাও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতেছে; হরিণীর ন্যায় পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে শেফালী লম্ফ দিতেছে; মুঞ্জাও সেই সঙ্গে যাইতেছে। যেন আকাশবিহারী গন্ধর্ব্ব কিন্নরে ক্রীড়া কৌতুকে উন্মত্ত হইয়াছে। শেফালী নামিয়া আসিল; গিরিনদী অতিক্রম করিল; বনকুসুমে ভূষিতা হইল; সঙ্গে সঙ্গে মুঞ্জা। শেফালী মালা গাঁথিতেছে; ফুল পাড়িতেছে; আপনি সাজিতেছে; মুঞ্জাকে সাজাইতেছে। মুঞ্জা আত্মহারা। মুঞ্জা মনে করে, আমি এমন আত্মহারা হই কেন? আমি কি শেফালীকে বশে আনিতে পারি না? আমার বল আছে; বিক্রম আছে, সৈন্য আছে; আধিপত্য আছে; তবে আত্মবিজয় করিতে পারিনা কেন? শেফালীর খেয়ালের পুতুল হই কেন? "বল শেফালী আর কতকাল আমাকে পাগল করিয়া রাখিবে? একবার বল আমার হইবে কিনা? যদি আমার না হও, আমার আত্মজ্ঞান ফিরাইয়া দাও। আমার স্বাধীনতা ফিরাইয়া দাও। আমি আর আমি শূন্য হইয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে পারি না।" শেফালী, মুঞ্জার কথার উত্তর দেয় না; হাস্য করে। পীড়াপীড়ি করিলে বলে—"পরীক্ষা করিতেছি।"

মুঞ্জা—

এতদিনেও কি তোমার পরীক্ষা শেষ হইল না। আর কি পরীক্ষা করিবে শেফালি! তোমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি। বল তুমি আমার হইবে কি না?

শেফালী—

প্রাণ দেওয়া বুঝি না। রাজ্য ছাড়িতে পার? রাজ্য ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে পার?

মুঞ্জা—

তবে তোমাকে পাইলাম কই?

শেফালী—

আমাকে পাও না পাও তাহার জন্য কি? আমি যাহা করিতে বলি, তাহা যদি করিতে পার, তাহা হইলে বুঝিব, যে আমাকে ভালবাস।

মুঞ্জা—

তবে এই মুহূর্ত্ত হইতেই আমি সন্ন্যাসী।

মুঞ্জা চলিয়া গেল। রাজ্য চাহিল না; ধন সম্পত্তিতে দৃক্‌পাতও করিল না। কোথায় গেল, কেহ জানিল না। একমাস, দুইমাস, ছয়মাস, একবৎসর, দুইবৎসর মুঞ্জার সংবাদ নাই। ভীলগণ শক্তিহারা। ভীল সৈন্যের সে তেজোগর্ব্ব নাই। এখন ভীলদিগকে কেহ ভয় করে না। অত্যাচারগ্রস্ত রাজগণ ভীলদিগকে দমন করিবার জন্য সজ্জিত হইতেছে। ভীলগণ সশঙ্ক, শশব্যস্ত এবং ব্যাকুল হইয়াছে। সর্দ্দারগণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। রটা, জটা প্রধান সেনাপতিদ্বয় মুঞ্জার অধীনে কত বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছে; আর তাহাদের সে সাহস নাই; সে শক্তি নাই। হায়! এক [illegible] বিনা সব অন্ধকার। শেফালী এখন পাগলিনী। সে ভাবিতেছে, কেন এমন দুষ্কর্ম্ম করিলাম? এখন যদি মুঞ্জাকে পাই, পায়ে ধরিয়া ফিরাইয়া আনি। হায়! কেন এমন সর্ব্বনাশ করিলাম? খেয়ালের বশে মুঞ্জাকে বিদায় দিয়া দেশ ছারখার করিলাম!

সে মুঞ্জার দুর্ব্বলতা দেখিয়া আপনার খেয়াল চালাইতেছিল। খেয়াল

চালাইতে চালাইতে যে এমন সর্ব্বনাশ করিবে, সে তাহা মনে করে নাই। সে এখন গিরি, নির্ঝরিণী, পর্ব্বত, কাননে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়।

নদীর নিকটে আসিয়া—

কল্লোলবাহিনী তুমি ওগো কল্লোলিনি!
মুঞ্জার বিহনে কাঁদি আমি অভাগিনী॥
তুমি যাও দূরে দূরে,
সলিল ধরিয়ে শিরে,
মুঞ্জারাজা কত দূরে, বল স্রোতস্বিনি!
কখন পুষ্পবনে প্রবেশ করিয়া—
হাসিতেছ ফুল রাশি! কুল কুল কুল।
মুঞ্জার বিরহে মোর হৃদয় আকুল।
দেখিয়া তোমার খেলা,
মনে পড়ে কত লীলা,
ভেবে ভেবে প্রাণে মরি, নাহি পাই কূল।
মুঞ্জার বিরহে বড় হয়েছি ব্যাকুল॥
দেখিয়া আমার জ্বালা,
করনাগো অবহেলা,
নাচিতেছ রসরঙ্গে ঢুল ঢুল ঢুল।
মুঞ্জারাজা বিনা প্রাণ হতেছে আকুল॥

হরিণীর নিকট যাইয়া—

আয়লো হরিণী সখি! আয় আয় আয়।
মুঞ্জারাজা বিনা মোর প্রাণ রাখা দায়॥

তুমি সখি নাচ যত,
মুঞ্জা মনে পড়ে তত,
এইরূপে নাচিতাম মুঞ্জাসনে হায় !
মুঞ্জার বিহনে মোর প্রাণ বুঝি যায় !

সর্ব্বনাশি, পোড়ারমুখি ! কি সর্ব্বনাশ করেছ বল দেখি ? দেশের যে সর্ব্বনাশ হলো। এখন মুঞ্জারাজাকে এনে দাও। বলিয়া, বিজলী আসিয়া শেফালীর পৃষ্ঠে তুই কীল মারিল।

শেফালী বিজলীর দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া গান ধরিল—

দেখলো বিজলী সখি ! দেখ দেখ চেয়ে।
কাল মেঘে ঢেকে দিল আকাশের গায়ে॥
সেইমত শেফালিকা,
মুঞ্জাকে দিয়াছে ঢাকা,
মুঞ্জাশশী রবে কি আর পহ্লনে ফুটিয়ে।

বিজলী, গিরিনদী হইতে সুশীতল সলিল আনিয়া শেফালীর মস্তকে সিঞ্চন করিতে লাগিল। আদর করিয়া চিবুক ধরিয়া বলিতে লাগিল— সখি ! ভাবনা কি ? মুঞ্জা আবার আসিবে। তুমি অনুমতি দিলে এখনি আসিতে পারে।

শেফালী—

কি বলিলে অনুমতি ! কি বিষম কথা ?
নারী হয়ে অনুমতি কেবা করে কোথা ?
মুঞ্জা হৃদয়ের রাজা,
আমি সখি তাঁর প্রজা,
প্রজা করে অনুমতি নাহি হেন প্রথা।

বিজলী, শেফালীর হাত ধরিয়া নানাপ্রকার সান্ত্বনা দিয়া প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু শেফালীর সেই. শূন্যভাব; সেই অস্থিরতা।

এমন সময় একটী ভীলবালক ছুটিয়া আসিয়া বলিল—মুঞ্জারাজা অসিয়াছে।

শেফালী—

কি বলিলে মঞ্জাবাজা আসিয়াছে ফিরে '
বাঁধিবাবে শেফালিকা প্রণয়েব ডোরে ?
কোথা মুঞ্জা প্রাণধন,
শেফালীব আকিঞ্চন,
এস এস হৃদয়েতে রাখি যত্ন করে।
ছাড়িবনা, ছাডিবনা, রাখিব অন্তরে ॥

একদল ভীলরমণী গাহিতে গাহিতে আগমন কবিল।

শেফালী মুঞ্জার আজি হবে পরিণয়।
আয় সবে ত্বরা করে আয আয আয় ॥
মঙ্গল বাজনা আর,
হুলুধ্বনি বার বাব,
মঞ্জারাজা শেফালীর গাওগো বিজয়।
শেফালী মুঞ্জাব আজি শুভ পরিণয়।

— ——

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যোধাবেগম।

আগ্রার যোধাবেগমের গৃহে, শশীমুখী সন্ন্যাসিনী সন্ধ্যায় প্রবেশ করিলেন। অগণ্য প্রহরী বেষ্টিত বাদসাহের মহলে সন্ন্যাসিনী কি করিয়া প্রবেশ করিলেন? শশীর সে ক্ষমতা আছে। যোগীঋষিতপস্বীগণ, অনাবৃত এবং অরক্ষিত অবস্থায় শ্বাপদসংকুলগহনকাননে তপস্যা করেন, কই তাঁহাদের নিকটেত, হিংস্র পশু আসে না। তবে শশীর নিকট আসিবে কেন? তপস্বিনী শশীমুখী বাসনা বিজয় করিয়া, হৃদয় শ্মশান করিয়াছেন। সেই বাসনাবিবর্জ্জিতা ভগবানে দেহমন অর্পিতা সন্ন্যাসিনীর প্রতি অত্যাচার করে, বা তাহার পথ অবরোধ করে, কাহার সাধ্য ইহা ভিন্ন ধর্ম্ম সম্বন্ধে আকবরবাদসাহ বড়ই উদার ছিলেন। তিনি কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা বা অনাদর প্রদর্শন করিতেন না। তজ্জন্য রক্ষা প্রহরীরাও কাহারও প্রতি কঠোর ব্যবহার করিত না। সন্ন্যাসিনী কাহারও অপেক্ষা না করিয়া, যোধাবাইএর নিজ প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন।

বেগমসাহেবা সহসা সন্ন্যাসিনী দেখিয়া চমৎকৃতা হইলেন। কিন্তু তখনই প্রকৃতিস্থা হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং বসিতে আসন দিলেন। সন্ন্যাসিনী আশীর্ব্বাদ করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন।

যোধাবেগম —

দেবি! যবনীর প্রতি এত অনুগ্রহ? যাহাহউক আজি আমি ধন্যা হইলাম।

সন্ন্যাসিনী—

মা! যবনী ও ব্রাহ্মণীতে কি বিভেদ, আমিত তাহা বুঝিতে পারি না। তবে যে, ভগবানের চরণ বিচ্যুতা হয়, সে অস্পৃশ্যা। তাহার ত্রিসীমায় যাইতে নাই। তুমিত মা! ভগবানের চরণে মতি রাখিয়াছ; তবে তোমার নিকট আসিব না কেন?

যোধা—

ভগবতি! আমি যতদূর পারিয়াছি, হিন্দু আচার ব্যবহার বজায় রাখিয়াছি; আর ভগবানের চরণে মতি রাখিতে চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু রাখিতে পারি কই?

সন্ন্যাসিনী—

মা! এটা তোমার ভুল। তুমি হিন্দুভাবে ভগবানকে হৃদয়গত করিতে চেষ্টা করিতেছ; কিন্তু এ যবনপুরীতে হিন্দুভাবে থাকিবে কি প্রকারে তবে যতদূর হিন্দু আচার ব্যবহার থাকে, ইহাতে যদি তুমি সন্তুষ্ট থাকিতে পার, মনের বিকার না আইসে, তাহা হইলে ক্ষতি নাই: ভগবান তাহাতেই তোমাকে কৃপা করিবেন।

যোধা—

দেবি! আমার উপায় কি হইবে? আমি চিরাভ্যস্ত হিন্দুভাব ছাড়িতে পারি না, অথচ তাহার পবিত্রতাও রাখিতে পারিতেছিনা।

সন্ন্যাসিনী—

মা! সকল ভাবই মনে। মনের বিকার না হইলে, সকল সময়ে, সকল অবস্থায় এবং সর্ব্বত্রই পবিত্রতা থাকিতে পারে।

যোধা—

তবে কি আমার মুক্তির উপায় নাই? মা! বল বল; কেন আমার

দশা এমন হইল? আমি পবিত্র হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আচারভ্রষ্টা যবনী হইলাম কেন?

সন্ন্যাসিনী—

সে তোমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। শুধু কর্ম্মফল নয় মা! প্রবল বাসনার ফল। তোমার প্রবল বাসনাজাত উচ্চআকাঙ্ক্ষা সুসিদ্ধ হইয়াছে। রাজাধিরাজের গৃহিণী হইয়াছ, হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্ঞী হইয়াছ। যদি ঐ আকাঙ্ক্ষায় পবিত্রতার সংমিলন থাকিত, তবে এরূপ হইত না; অন্য প্রকারে ঐ বাসনার ফল ফলিত। ফল যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এক্ষণে কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করিও না। স্বামীভক্তি হারাইও না।

কুৎসিতং পতিতং মূঢ়ং দরিদ্রং রোগিনং জড়ং।
কুলজা বিষ্ণুতুল্যঞ্চ কান্তং পশ্যতি সততং॥ শিবসংহিতা।

স্বামী কুরূপ, কুৎসিত, জাতিভ্রষ্ট, অজ্ঞানী, দরিদ্র, রোগগ্রস্ত অথবা জড়বৎ হইলেও ভগবানের তুল্য স্ত্রীলোকের পূজ্য।

যোধা—

দেবি! স্বামী আমার সর্ব্বস্ব। আমি ভগবান্ ও স্বামীতে প্রভেদ বিবেচনা করি না। ভগবান্ আমার যেমন আরাধ্য, স্বামীও আমার তেমনি পূজ্য। স্বামী যাহাই হউন আমার দেবতা।

সন্ন্যাসিনী—

তবে তোমার চিন্তার বিষয় কি? তুমিত কার্য্য সমাধা করিয়া বসিয়াছ। নীরস, শুষ্ক এবং কঠোরজ্ঞানের আশ্রয়লাভ করিয়া, বহুদিনে আমরা যাহা করিতেপারিনাই; তুমি জ্ঞানকাণ্ডের বিনাসাহায্যে এবং লালসার মোহমায়ার প্রলোভন মধ্যে পড়িয়াও অনায়াসে তাহা লাভ করিয়াছ। তোমা হইতে ভাগ্যবতী আর কে আছে?

যোধা—

ভগবতি! আজ আপনার আশ্বাসবাক্যে হৃদয়ের জ্বালা অনেক নিবৃত্তি হইল। এক্ষণে বলুন, কি উদ্দেশে আজ দর্শনদিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন?

সন্ন্যাসিনী—

সাম্রাজ্ঞি! আমি সন্ন্যাসিনী বটে; কিন্তু পরের জন্য আমাকে কর্ম্ম-যোগিনী হইতে হইয়াছে। আমি বাসনা ত্যাগ করিয়াছি; সুতরাং কর্ম্ম আর আমার নাই। কিন্তু নিজের কর্ম্মত্যাগ করিয়াছি বলিয়া, অন্যের কর্ম্ম করিব না কেন? সে যে ভগবানের কার্য্য। সে কার্য্য ত্যাগ করিলে প্রত্যবায় হইবে; তাই আমি পরের কার্য্য করিয়া থাকি। কর্ত্তব্য বলিয়া পরের কার্য্য প্রাণপণে করিয়া থাকি। যতদিন জীবন থাকিবে এইরূপ করিতে হইবে।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি র্নচাক্রিয়ঃ॥

গীতা।

কর্ম্মফল উদ্দেশ্য না করিয়া অর্থাৎ নিষ্কাম হইয়া যে ব্যক্তি কার্য্য করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই পরম সন্ন্যাসী ও যোগী। নতুবা কেবল কর্ম্মত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না। সে যাহা হউক আজ বড় বিপদে পড়িয়া তোমার নিকট আসিতে হইয়াছে।

যোধা—

দেবি! বলুন, কিজন্য আসিয়াছেন? আমার যত দূর সাধ্য উপকার করিতে চেষ্টা করিব।

সন্ন্যাসিনী, তথন তারাঅপহরণবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন।

যোধা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। বলিলেন—মা! বড় কঠিন কার্য্যে আজি আপনার আগমন। শুনিয়া থাকিবেন যে, বাদসাহের প্রধান অমাত্য আবুলফাজলকে সেলিম হত্যা করাইয়াছেন। অমাত্যশোক এবং সখাশোক উভয় শোকে কাতর হইয়া, সম্রাট্ তিনচারি মাস শয্যাগত ছিলেন। তেমন অকৃত্রিম বন্ধু, তেমন সুযোগ্য কর্ম্মচারী, তেমন বিদ্যাবুদ্ধি এবং বিনয়সম্পন্ন লোক আর হইবে না। সেই অবধি তিনি পুত্রের মুখদর্শন করেন না। অনেকে মনে করিতেছে যে, সেলিমের সিংহাসনের আশা ফুরাইয়াছে, কিন্তু সে কথা অলীক। ততদূর করিবার তাঁহার ইচ্ছা নাই। যাহা হউক এবিষয়ে বিশেষ করিয়া আমি বাদসাহকে অনুরোধ করিব এবং আশা করি যে, তিনি সাধ্যমত ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতে বিরত হইবেন না। সুবিধার বিষয় এই যে অপহৃতা রমণী সাধ্বী সতী। সতীর অবমাননা আকবরবাদসাহের রাজ্যে কখনই হইবে না। সেই আফ্গানপত্নীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেলিমসাহ কার্য্য করিতে সক্ষম হন নাই বাদসাহ অবিচার করিবেন না, ইহা আমার দৃঢ়বিশ্বাস। সন্ন্যাসিনী আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মিলন।

মুঞ্জা শেফালীকে পাইয়াছে। শেফালী মুঞ্জা এক হইয়াছে। মুঞ্জা এখন রাজকার্য্যে মন দিয়াছে; হস্তচ্যুত ভীলপ্রদেশগুলির পুনরুদ্ধার করিয়াছে; রাইপুরপতি সুজনসিংহের শত্রুতার প্রতিশোধ লইয়াছে। ভীল রাজ্যে আবার প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের উদয় হইয়াছে।

আজ শেফালী, বিজলী ও মুঞ্জা একত্র হইয়া শেফালীর উন্মাদ অবস্থার আন্দোলন করিতেছে।

বিজলী—

বাজা! শেফালী যে এমন সুন্দর গান গাহিতে পারে, তাহা আমি উহার সখী হইয়াও এত দিন জানিতে পারি নাই। আহা! উহার গানে পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়। বলিয়া—শেফালীকে কহিল—সখি! একটা গান গাহিয়া রাজাকে শুনাওনা ভাই '

শেফালী—

ভাগ্যে পাগল হইয়াছিলাম তাই রক্ষা। পাগল হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ে যে কি জ্বালা ছিল তাহা কি বলিব পাগল হইয়া দুঃখের সঙ্গে সঙ্গেও যেন আনন্দ পাইয়াছিলাম।

রাজা! আর আমি তোমার অবাধ্য হইব না। এখন হইতে আর সে বনচারিণী শেফালিকাকে দেখিতে পাইবে না। শেফালিকা ধীরা স্থিরা এবং স্বামীর আজ্ঞাপ্রতিপালনকারিণী হইবে।

বিজলী—

তবে পর্ব্বত লঙ্ঘন করিবে কে? নদী সন্তরণ করিবে কে? হরিণ হরিণীর পিছু পিছু দৌড়াইবে কে? হাসির তরঙ্গ তুলিয়া বনফুল ছড়াইয়া, ছুটাছুটি করিবে কে?

শেফালী—

সখি! আর লজ্জা দিস্ না। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আর হইবে না। একবার যাহা করিয়া সর্ব্বস্বধন হারাইতে বসিয়াছিলাম, ভীলরাজ্যের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলাম, আর তাহা করিব না।

মুঞ্জা—

বিজলী সখি! গানের কথা কি বলিতেছিলে?

বিজলী, মুঞ্জা ও শেফালীকে সিংহাসনে বসাইয়া, শেফালীকে গাহিতে অনুরোধ করিল।

শেফালী—

সিংহাসনে মুঞ্জারাজা বামেতে শেফালী।
হেরিয়ে মোহন শোভা হাসিছে বিজলী॥
মেঘে ঢেকে ছিল শশী,
ঘন ঘোর অমানিশি,
পোহাইল দুঃখ নিশি, উদিল কিরণমালী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—*⁐∘⁐*—

রটা জটার রণজয়।

রটা জটা—

ভীলরাজ! অনুমতি অনুসারে বাদসাহের অধিকৃত দিল্লীর নিকট-বর্ত্তীস্থান লুণ্ঠন করিয়াছি; দিল্লী হইতে কয়েকদল সৈন্য আমাদিগকে ধৃত করিতে আসিয়াছিল, আমরা তাহাদিগকে উচিত মত শিক্ষা দিয়াছি।

মুঞ্জা—

উচিত শিক্ষা কি দিয়াছ?

রটা জটা।

উহাদিগকে রীতিমত পরাজিত করিয়াছি। ইহা ভিন্ন প্রেরিত সৈন্যের অধ্যক্ষ সেনাপতি মহাশয়কে ধৃত করিয়া আনিয়াছি।

মুঞ্জা—

তোমাদের কার্য্যে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলাম। পুরস্কার—লুণ্ঠিত দ্রব্যের তিন ভাগ তোমাদের; এক ভাগ মাত্র আমাকে দিও।

রটা জটা—

ভীলরাজ! আমরা অরণ্যচারী ভীল, আমাদের অর্থের প্রয়োজন কি? আপনি ভীল হইলেও রাজা। রাজার অর্থের অনেক প্রয়োজন। দেশশাসনে এবং সাধারণকার্য্যে রাজাকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়।

মুঞ্জা—

সাধু রটা জটা! তোমরা ভীলরাজ্যের সুপুত্র। তোমাদের বীরত্বে ভীলরাজ্যের অশেষ উন্নতি হইবে।

রটা জটা—

না মহারাজ! চন্দ্র অস্ত গমন করিলে, সামান্য নক্ষত্রের আলো কোন কার্য্যই হইতে পারে না। তোমার বিদেশগমনকালে র জটা শক্তিহীন হইয়াছিল; কোন কার্য্যেই সফলতা লাভ করি পারে নাই।

সে যাহা হউক এক্ষণে আর একটী কথা শুনিয়া আসিলাম। আক্‌বরসাহ নাকি একদল সুশিক্ষিত সেনাসহ সেনাপতি সমরেন্দ্র নারায়ণকে আমাদের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছেন। সে সৈন্য আগতপ্রায়।

মুঞ্জা—

আচ্ছা, তোমরা বন্দীসেনাপতিকে দরবারগৃহে আবদ্ধ করিব ব্যবস্থা করিয়া বিশ্রাম করিতে গমন কর। দেখিও সেনাপতির যেন আহার বিহারে কোন কষ্ট না হয়। সেনাপতি হিন্দু কি মুসলমান?

রটা জটা—

মুসলমান।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পরীক্ষা।

বটা জটাকে বিদায় দিয়া, মুঞ্জা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—
হু দিনের কথা, নামটী ভাল মনে পড়িতেছে না; বোধ হয় যেন সমর-
চ হইবে। বটাজটা বলিতেছে, সমরেন্দ্রনারায়ণ। তবে তিনিই
সেই দয়াময়? আমার সেই উদ্ধারকর্ত্তা, প্রাণদাতা সমরেন্দ্র নারায়ণ?
তাহা হইলে আর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ক্লেশ দেইকেন? আত্মসমর্পণ করি।
কিন্তু যদি তিনি না হন, তবে কাপুরুষের মত আত্মসমর্পণ করিব কেন?
হইত! এ যে বড় বিষম সমস্যায় পড়িলাম। ভাল কথা মনে হইয়াছে—
আমি যে তাঁহার শরীরে দুইটী চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছিলাম। ভ্রূর
কাই তিল এবং কর্ণের পার্শ্বে আঁচিল দেখিয়া রাখিয়াছি যে। যদি এই
পতি আমার সেই প্রাণদাতা হন, তবে শুদ্ধ আত্মসমর্পণ কেন,
দিয়াও মুঞ্জা তাঁহার আজ্ঞাপালন করিবে।

মুঞ্জা মনে মনে এই প্রকার আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছে, এমন
সীমান্তপ্রদেশ হইতে সংবাদ আসিল যে, মোগল সৈন্য সীমান্তে
সন্নিবেশ করিয়াছে।

মুঞ্জা আর কালবিলম্ব না করিয়া যুদ্ধঘোষণা করিয়াদিলেন। তিন দিক্
তিনদল সৈন্য, মোগলছাউনী অবরোধকরিল। মোগলসেনা
আপনাদের সাজসরঞ্জাম ও দ্রব্যাদি গুছাইয়া উঠিতে পারে নাই।
এই আকস্মিক আক্রমণে সজ্জীভূত হইতে না হইতে, ভীলগণ
দের বহুমূল্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া নিকটবর্ত্তী অরণ্যে মিশাইয়া গেল।

হিন্দু সৈন্য কিছুক্ষণ বাধা দিয়াছিল বটে, কিন্তু সংখ্যাব অল্পতায়, উহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। অধিকন্তু উহাদের দুইতিন জন সেনাপতি ধৃত হইলেন। অবশিষ্ট সৈনা আব অগ্রসব হইল না।

এইরূপে বাইশ দিন যুদ্ধ চলিল। ভীলগণ শ্রান্ত, ক্লান্ত হইলে, অথবা পরাজয়ের উপক্রম বুঝিতেপারিলে, সম্মুখেব অরণ্যে এবং পর্ব্বতের গাত্রে এমনই অলক্ষিত হইয়া যায় যে, কাহার সাধ্য উহাদিগকে খুঁজিয়া বাহিব কবে? ফল বহুসংখ্যক মোগল সৈন্য হতাহত হইতে লাগিল। অপব সেনাপতি হইলে, এ লোকক্ষয়কারী যুদ্ধে ক্ষণমাত্র অবস্থান না কবিয়া পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণবক্ষাব চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সমবেন্দ্রনাবাযণ সে প্রকৃতিব লোক নহেন।

তিনি ভীল যুদ্ধে পলাতক নাম গ্রহণ অপেক্ষা, সম্মুখ সংগ্রামে হত বা আহত হইয়া বীবনাম অর্জ্জনকবা শ্লাঘনীয় মনে করেন। তাই এত দিবস যুদ্ধ চলিতেছে।

তেইশ দিনেবদিন, "টাট্‌কা হবিণেরমাংস লইবে গো" বলিয়া, একজন মাংসজীবী, মোগল তাঁবুতে প্রবেশকরিল। সেনাপতি মহাশয় যে স্থানে একাকী উপবিষ্টহইয়া উপস্থিতসংগ্রামেব পরিণাম চিন্তা কবিতেছেন, মাংসজীবী সেই স্থানেই আসিয়া দাঁড়াইল।

সেনাপতি—

তুমি কি চাও?

মাংসজীবী—

হরিণের মাংস বিক্রয় করিতে আসিয়াছি।

সেনাপতিমহাশয় ভীলজাতীয়মাংসজীবীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়াদেখিন। দেখিলেন—সেআগন্তুক ভীল অতি বলিষ্ঠ, আর তাহাব

নয়নে অগ্নিকণা জ্বলিতেছে। একবার বোধ হইল ছদ্মবেশ। আবার ভাবিলেন—না ছদ্মবেশ নহে।

সেনাপতি—

তুমি যুদ্ধে যোগ দাও নাই কেন ?

ভীল—

সেনাপতিসাহেব! সকলেই কি যুদ্ধ করে? ভীলগণ ত মুসলমান নহে যে অর্থ দিয়া, বেতন দিয়া, জায়গীর দিয়া সকলকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিবে।

সেনাপতি ঈষৎ কুপিত হইয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন—তুমি কখনই মাংসজীবী নহ।

ভীল—

এইটী আপনার ভ্রম। ভীল মাত্রেই মাংসজীবী। মাংসবিক্রয় করিয়া সকলে অর্থ না লইতে পারে; কিন্তু শিকার করিয়া প্রায় সকল ভীলকেই প্রাণধারণ করিতে হয়।

সেনাপতি—

তোমাদের রাজা মুঞ্জাও কি ঐরূপে জীবিকানির্ব্বাহ করেন।

ভীল—

রাজার কথা স্বতন্ত্র। রাজার বহু অনুচর আছে; ভৃত্য আছে; রাজার জন্য আমরা আছি।

সেনাপতি—

তোমার এ হরিণ মাংসের কি মূল্য লইবে ?

ভীল—

অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিবেন, তাহাই লইব। আমরা বড়লোকের নিকট দরদাম করি না।

সেনাপতি, দুইটী রজত মুদ্রা ফেলিয়া দিলেন।

ভীল—

মহাশয়! যদি রোজ রোজ মাংস দিবার অনুমতি হয়, তবে মূল্য এখন থাকুক, আমি একবারে লইব। বলিয়া—মাংসজীবী সেনাপতির মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

সেনাপতি—

কি দেখিতেছ?

ভীল—

আপনি রাজপুত কি অন্য দেশীয় লোক তাই দেখিতেছি।

সেনাপতি—

সন্দেহ করিবার কারণ কি?

ভীল—

আমি নিরস্ত্র এবং নিঃসহায় ভীল, আপনার তাঁবুতে প্রবেশ করিয়াছি; এরূপস্থলে সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারে না। রাজপুতগণ অকুতোসাহসী বলিয়াই হউক, বা সভাবসিদ্ধ উদারতার জন্যই হউক, এরূপ অবস্থায় অবিশ্বাস করে না। আমি অনেকবার যুদ্ধের সময় তাহাদের তাঁবুতে গিয়াছি; কিন্তু কেহই অবিশ্বাস করে নাই। মাংসবিক্রেতা এই বলিয়া, ত্বরিত পদে শিবির হইতে বাহির হইয়া চলিয়াগেল। কোথায় গেল, কেহ দেখিতে পাইল না। সেনাপতি বুঝিলেন, মাংস বিক্রেতা স্বয়ং মুঞ্জা; কৌশলে তাঁহাকে হরিণমাংস উপহার দিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আত্মসমর্পণ।

রজনীর অন্ধকার অপগত হইয়াছে। এখনও নিশিরশিশিরবিন্দু পর্ব্বতের গাত্র হইতে টুপ্‌টাপ্‌ শব্দে পতিত হইতেছে। সূর্য্যদেব উকিঝুঁকি মারিতেছেন, কোন্ দিক্‌দিয়া উদয় হইবেন, স্থির করিতে পারিতেছেন না। যেদিক্ দিয়া প্রকাশ হইবার চেষ্টা করেন, সেই দিকেই বাধা। হয় অরণ্য, নাহয় পর্ব্বত। শেষে পর্ব্বতলঙ্ঘন এবং অরণ্য উল্লম্ফনই স্থিরীকৃত হইল। গাছেরআগায়, পর্ব্বতেরশিখরে, একটু একটু রৌদ্র দেখাদিল। দেখিতে দেখিতে কিরণমালা, ছড়াইয়াপড়িল। তখন আর দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই। যেখানে সেখানে রৌদ্র। ঘাট মাঠ, বাট, উচ্চ, নিম্ন, সমতল সমস্তই রৌদ্র মণ্ডিত। সমরেন্দ্রের শিবির রৌদ্রভরা। শিবিরেরদিকে একটী লোক আসিতেছে। লোকটীর সর্ব্বাঙ্গ পশু চর্ম্মনির্ম্মিত পরিচ্ছদে আবৃত; মস্তকে রাজপুতের ন্যায় উষ্ণীষ; কটিতটে কোষবদ্ধঅসি; হস্তে ধনুর্ব্বাণ। বীরত্বব্যঞ্জকদেহ, হাস্য-পূর্ণমুখ। লোকটীকে দেখিলে, নির্ভীক এবং তেজোপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। একাকী আসিতেছে; সঙ্গে জনপ্রাণী নাই। শিবিরদ্বারে আসিলে, প্রহরী বাধা দিল। সশস্ত্র বীরপুরুষকে যাইতেদিবে কেন? আত্মপ্রকাশ করিতে হইল। কহিল—সেনাপতি মহাশয়কে সংবাদ দাও—যে মুঞ্জা ভীল আসিয়াছে। প্রহরী চমকিয়াউঠিল। মোগলসৈন্য যে মুঞ্জাকে সিংহব্যাঘ্র অপেক্ষা অধিক ভয়করে, যাহারজন্য মোগল শিবির শূন্য হইতেচলিয়াছে, সেই মুঞ্জা আসিয়াছে? সেনাপতির

নিকট সংবাদ প্রদত্ত হইল। তিনি আসিতে অনুমতি করিলেন। মুঞ্জা মন্থর গমনে শিবিরে প্রবেশকরিয়া, সেনাপতির চরণপ্রান্তে অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া বলিল—সেনাপতি মহাশয়! এই মুঞ্জাভীল আত্মসমর্পণ করিল; আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। সেনাপতি মুঞ্জার এই অদ্ভুত আচরণে অবাক্ হইয়ারহিলেন। তিনি তাহার বলবিক্রমের সবিশেষ পরিচয় পাইয়াছেন। মোগল শিবিরে যাহার জন্য হাহাকার পড়িয়াছে, সেই মুঞ্জার আত্ম সমর্পণ? সেনাপতির বিস্ময়ের সীমা নাই। তিনি মুঞ্জার মনের ভাব বুঝিবার নিমিত্ত বিদ্রূপচ্ছলে কহিলেন—মুঞ্জারাজা! মোগল পরাক্রমের পরিচয় পাইয়া কি ভীত হইয়াছ? মুঞ্জা বিষধরসর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিয়াউঠিল—মোগলপরাক্রমে ভয়? অসম্ভব কথা! মুঞ্জা কাহাকেও ভয় করে না।

সমরেন্দ্র—

তবে এ আত্মসমর্পণ কেন?

মুঞ্জা—

আত্ম সমর্পণ করিব না? যিনি আমার প্রাণদাতা, রক্ষাকর্ত্তা, পরম দয়াবান্, তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিব না? এতদিন জানিতে পারি নাই, চিনিতে পারি নাই, বলিয়া করি নাই। আর করিনাই, একটু বিক্রমের পরিচয় দিবার জন্য। মুঞ্জা যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতেছে না; মোগল পরাক্রমে ভীত হইয়া শরণাপন্ন হইতেছে না; সে আত্মসমর্পণ করিতেছে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত। আর করিতেছে—প্রাণদাতার মহত্ত্ব, বীরত্ব এবং উদারতার জন্য। মনে নাই দয়াময়! আজ আট বৎসরের কথা—ষোড়শবর্ষীয় ভীলবালক, আগ্রার রাজপথে, দুরাত্মা মোগলসৈন্যের মেন্যায় আক্রমণে মরিতে বসিয়া ছিল।

কে তাহাকে উত্তোলিত তরবারির আঘাত ব্যর্থ করিয়া বাঁচাইয়া ছিল?

কে মূর্ছাপন্ন মুঞ্জাকে বক্ষে করিয়া তাহার জ্যেষ্ঠতাতের নিকট লইয়া গিয়াছিল? কে তাহার তরবারির ক্ষত স্বহস্তে বন্ধন করিয়া দিয়াছিল? কে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া ছিল?

তুমি। তুমি দয়াময় সমরেন্দ্রনারায়ণ তাহাকে বাঁচাইয়াছিলে। তোমার জন্যই আজ মুঞ্জার এত প্রতাপ। তোমার জন্যই সমস্ত ভীলরাজ্য মুঞ্জার করতলে। তোমার জন্যই রাজপুতনার রাজন্যগণ মুঞ্জার ভয়ে কম্পিত। প্রাণদান না পাইলে মুঞ্জার নাম কে জানিত? পৃথিবী হইতে সে নাম বিলুপ্ত হইত।

মুঞ্জার দুই চক্ষে অবিরল ধারা বহিতেছে; কথার জড়তা হইতেছে; মুঞ্জা আর কথা কহিতে পারিল না। সমরেন্দ্রের চরণতলে বসিয়াপড়িল। সমরেন্দ্রেরও চক্ষুঃ সজল। তিনি মুঞ্জার অসাধারণ মহত্ত্ব এবং কৃতজ্ঞতা দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন। আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; মুঞ্জাকে সাদরে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন—ধন্য তুমি মুঞ্জারাজা! তোমার অসাধারণ ব্যবহার দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। এই জন্যই তুমি এত উচ্চ। এই জন্যই সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাট্ তোমার বলবীর্য্যে ব্যতিব্যস্ত এবং বিচলিত হইয়াছেন। মুঞ্জা কাঁদিতে লাগিল। সমরেন্দ্র তাহার হস্ত ধারণ করিয়া আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে উপযুক্ত আসনে বসাইলেন। কহিলেন—তোমায় সসম্মানে বাদসাহার নিকটে লইয়া যাইব। স্বাধীন নৃপতির সম্মান দেওয়াইব। ইহাতে যদি তুমি সম্মত হও, তবে লইয়া যাইব। নতুবা নহে। মুঞ্জা সম্মতি জানাইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মুঞ্জার সম্মান।

মুঞ্জা আগ্রায় আসিয়াছেন। সসৈন্যে সানুচরে আসিয়াছেন। শেফালি আসিতে চাহিয়াছিল, মুঞ্জা স্বীকৃত হন নাই। সেও আর দ্বিরুক্তি করে নাই। এখন আর সে শেফালি নাই। এখন স্বামীর নিতান্ত বশবর্ত্তিনী শেফালীকা স্বামীর তুষ্টিকুষ্টি বুঝিয়া চলিতে শিখিয়াছে। মুঞ্জার অবস্থিতির জন্য আগ্রানগরে বৃহৎঅট্টালিকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেনাপতি রাজা বিক্রমজিৎ, আগ্রার অদূরে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনয়ন করিলেন। ফলতঃ মুঞ্জার সম্মানের শেষনাই। সেই একদিন জ্যেষ্ঠতাতের সহিত নগণ্যজঘন্য ভাবে আসিয়াছিলেন, আর আজ এই মহাড়ম্বরে সম্বর্দ্ধনা। মুঞ্জা উভয় আগমনের তুলনা করিলেন; এবং বুঝিতে পারিলেন যে মহামতি সমরেন্দ্রনারায়ণই এই সম্মানকর অভ্যর্থনার মূল। মুঞ্জা দরবার গৃহে নীতহইলে, রাজা তোডর্ম্মল্ল অভিবাদন করিয়া, দরবারস্থলে লইয়া গেলেন। মুঞ্জাকে দেখিবার জন্য ঠেলাঠেলি হইতে লাগিল। বাদসাহাও কৌতূহল নিবারণের নিমিত্ত, আড়চক্ষে দৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। রাজা বিক্রমজিতের নিকট মুঞ্জা, দরবারের আদপ্‌কায়দা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তদনুসারে রীতিমত কুর্নিস করিয়া, একখানি সুবর্ণ থালে বাদসাহার সম্মুখে উপহার স্থাপন করিলেন। মুঞ্জার প্রদত্ত উপহারে ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ছিল না। উহা অরণ্য এবং পর্ব্বতজাত বিবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থে পরিপূর্ণ।

স্বর্ণথালে একথান মোহর, কতকগুলি স্বর্ণরেণু, কঠিন কঠিন পীড়ার নানাবিধ অব্যর্থ বনজাতঔষধি, মৃগনাভি, এবং গিরিমাটিজাত বিবিধ রঙ্গের গুঁড়া প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাভিন্ন পৃথক একপ্রস্থ ব্যাঘ্র ও হরিণের চর্ম্ম এবং হস্তিদন্ত প্রভৃতি নগরদুর্ল্লভ, গিরিবনজাতদ্রব্য থালার সঙ্গে স্থাপিত হইল। বাদসাহ মোহরটী মাত্র স্পর্শ করিয়া, অন্যান্য দ্রব্যগুলি এক এক করিয়া দেখিলেন এবং ঔষধি গুলির প্রত্যেকের বর্ণনা শ্রবণ করিলেন।

নকিব ফুকারিল—

মুঞ্জারাজার প্রদত্ত উপহার সাহানসাহা সাদরে গ্রহণকরিলেন; আর মুঞ্জারাজাকে মহারাজা উপাধি প্রদত্ত হইল। রাজপুতানার রাজাদিগের তুল্য সম্মান মুঞ্জা মহারাজা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি রাজধানাতে প্রবেশ করিলে, নাকাড়া ধ্বনি হইবে ও নহবৎ বাজিবে; আর তিনি রাজধানীতে উপস্থিত থাকা সময়ে, নাকাড়া বাদ্যধ্বনির সহিত গমনাগমন করিতে পারিবেন। সেনা সেনাপতিগণ তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিবে; না করিলে সামরিকবিচারে দণ্ডিতহইবে। মুঞ্জামহারাজকে জাল কিরীচ, কোমরবন্ধ এবং পাগ্‌ড়ি প্রদত্ত হইল। ঐ কিরীচপ্রভৃতিতে সাচ্চাকাজ এবং এক এক খান মূল্যবান্ হীরক বসান থাকিবে। নকিবের কথা শেষ হইলে—মুঞ্জা কুর্ণিস করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—সাহান্-সাহার প্রদত্ত উপাধি এবং উপহার প্রাপ্তহইয়া নফর কৃতার্থ হইল; কিন্তু যে মহাত্মার প্রভাবে মুঞ্জাভীল আজ ব্যাঘ্র হইয়া পোষা কুকুর হইয়াছে, তাঁহার হস্ত হইতে সম্রাট্ প্রদত্ত এই সম্মানকর প্রসাদ প্রাপ্ত হইলে সে পরম গৌরব জ্ঞান করিত।

বাদসাহ অসভ্যভীলের এই সভ্যজনদুর্ল্লভ সরলতা এবং আদপ্

কায়দা দেখিয়া আনন্দের সহিত তাঁহার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

সমরেন্দ্র আসিলেন, এবং নকিবের ন্যায় উচ্চ চিৎকার করিয়া বলিলেন—দিনদুনিয়ারমালিকসাহানসাহা মঙ্গামহারাজার রাজভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া সম্মান বৃদ্ধির জন্য তাঁহাকে এই স্বর্ণমুক্তাখচিত, হীরক মণ্ডিত জাল কিরীচ, কোমরবন্ধ এবং উষ্ণীষ প্রভৃতি প্রদান করিলেন। ইহাতে মুঙ্গামহারাজার সম্মান শতগুণে বৃদ্ধি হইল। মুঙ্গা অবনত মস্তকে বাদসাহপ্রদত্ত উপহার গ্রহণকরিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কাজি কেরামতউল্লা।

তারাসুন্দরী, রতিকান্ত রায়ের আগ্রার বাটীতে আনীতা হইয়াছেন। এ সংবাদ রায়মহাশয় রাজা তোডর্মল্লকে দিয়াছেন; এবং আর এক দিবস সাক্ষাৎ করিয়া, অপহরণ সম্বন্ধে বিচার প্রার্থনা করিয়াছেন।

তোডর্মল্লের নিদেশমতে প্রধান কাজির নিকট রায়মহাশয় ফরিয়াদী হইয়াছেন। বিচারের দিন নির্দ্দিষ্ট হইলে, রায়মহাশয় হাজির হইলেন। পরিচারকবর্গ মধ্যে যাহারা অপহরণ ব্যাপারের মাতব্বর সাক্ষী, তাহারা সঙ্গে চলিল। বিধুমুখীদাসীকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সম্ভ্রান্ত ঘরওয়ালা বলিয়া তারাসুন্দরীর হাজিরা মহকুপ্ হইল। যাহাকে লইয়া

মোকদ্দমা, তাহার হাজিরা কি করিয়া মহকুপ্ করা যায় বলিয়া, বিচারক আপত্তি করিলেন।

উকীল সরকার উঠিয়া বলিলেন—

কাজি সাহেব! আমার মক্কেল একজন বিশেষ সম্ভ্রমশালী ব্যক্তি। ইনি বঙ্গদেশের রাজা উপাধিধারী এবং উচ্চ দরের জমিদার। ইঁহার বংশমর্য্যাদার পরিচয় আমরা রাজা তোডর্মল্লের পত্রানুসারে পাইতেছি। অতএব ইঁহার কন্যাতুল্যাতারাসুন্দরীদেবীকে পর্দানসিন্ বলিয়া আদালতে হাজির হইবার দায় হইতে অব্যাহতি দিবার আজ্ঞা হয়।

আচ্ছা, হাজিরা মহকুপ করা গেল বলিয়া, কাজি সাহেব বিচার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

কাজিসাহেবমৌলভিকেরামতউল্লা বহুদিবস হইতে আরগ্রার কাজিয়তি বিচারালয়ে বিচারকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। সুবিচারক বলিয়া, তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতিও আছে। তাঁহার বয়স অধিক হইলেও এই প্রতিপত্তির কারণে বাদসাহার নিকট বিদায় পাইতেছেন না।

আদালতগৃহে লোক ধরে না।

মেয়ে চুরীর মোকদ্দমা বলিয়া একটা রব উঠিয়াছে। সকলে বলিতেছে—বাঙ্গালা দেশের একজন বড়লোকের মেয়ে চুরী হইয়াছিল; চোর ধরা পড়িয়াছে; তাহারই মোকদ্দমা।

কেহ বলিতেছে—সেলিমসাহার হুকুমে মেয়েটাকে লইয়াআসিয়াছে; চুরী আবার কোথায়?

কেহ বলিতেছে—চুরীই বল, আর ডাকাতিই বল, যখন সেলিমসাহা ইহার মধ্যে সংস্থষ্ট, তখন আর কি বিচার হইবে? আসামীত খালাস হইয়াই আছে।

অন্যব্যক্তি বলিল—আক্‌বর বাদসাহার আমলে ও কথাটি বলিবার যোনাই। তাহাহইলে সেলিমসাহা কোন্‌কালে মেহেরউন্নিসাকে বিবাহ করিতে পারিত। আর কাজিকেরামতউল্লাও ভয় পাইবার লোক নহে। সমরেন্দ্র এবং সুজনসিংহ সাক্ষীস্বরূপ আহূত হইয়াছেন। সীপাহী সীতারামকে গাজিপুর হইতে তলিয়া করিয়া আনাহইয়াছে। ইহাব্যতিত কানপুরের ফৌজদার, থানার জমাদার, নৌকারমাঝি মাল্লা, সরকারি তাঁবুবরদার প্রভৃতিও সাক্ষী হইয়া আসিয়াছে। বিধুমুখী, দৌলতরামের সাক্ষীশ্রেণী মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

প্রথমে ফরিয়াদী রাজারতিকান্তরায়ের জবান্‌বন্দী হইল। পরে একে একে ফরিয়াদী পক্ষীয় সাক্ষীদিগের এজেহার হইতে লাগিল। কানপুরের ফৌজদার, ঘটনার পরদিন প্রাতঃকালে মেয়েচুরীর তদন্ত করা ও পরে অনেক অনুসন্ধান করা স্বীকার করিলেন। থানার জমাদারও ঐ কথা বলিল। পরিচারকগণ সকলেই চুরীর কথা বলিল; তবে প্রত্যক্ষ্যভাবে কেহ চুরী হইতে দেখিয়াছে, এ কথা বলিতে পারিলনা। রতিকান্তরায় মহাশয় কাহাকেও মিথ্যা বলিতে উপদেশ দেন নাই। যে যাহা জানে ঠিক তাহাই বলিবে, এই তাঁহার আদেশ। মাঝি মাল্লারাও প্রাতঃকালে গোলযোগ শুনিয়াছে বলিল। সীতারাম কিছু বলিতে চাহে না; কিন্তু উকীলের চেষ্টায় এবং কাজিসাহেবের কড়ামেজাজ দেখিয়া, সে কোন কথা গোপন রাখিতে পারিল না। তাহার সাক্ষে এই প্রমাণ হইল যে, জহরী দৌলতরাম, লোকের দ্বারা তাহার সহিত এই অপহরণ কার্য্যের বন্দোবস্ত করে। সে এবং বিধুদাসী একত্রে এই কার্য্যের সহায়তা করিয়াছে। বিধু, পানীয়জলের সহিত কি একটী ঔষধের গুঁড়া মিশাইয়াদিয়া, তারাসুন্দরীকে অজ্ঞান করিয়াছিল। এই মেয়েচরী কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য পুরস্কার স্বরূপ সীতারামকে হাজার

টাকা দিবার কথা হয়। পাঁচশত টাকা পূর্ব্বে এবং পাঁচশত পরে। তদনুসারে সে হাজার টাকা পাইয়াছে। ফরিয়াদীপক্ষের এজেহারাদি শেষ হইলে, আসামীর এজেহার আরম্ভ হইল; আসামী দৌলতরাম সকল কথাই অস্বীকার কবিল। সে কহিল—মেয়েটীকে একটী সওদাগরের নিকট খরিদ করিয়াছিল। আমির, ওমরা, সাহাজাদা যে কেহ হউক অধিকমূল্য দিয়া তাহাব নিকট হইতে গ্রহণ করিবে, এই উদ্দেশ্যে সে খরিদ করিয়াছিল বলিল। সে সীতারাম প্রভৃতির সহিত কোন বন্দোবস্ত, নিজে বা লোকদ্বাবা করেনাই, চৌর্য্যসম্বন্ধে কিছুই অবগত নহে, এই প্রকার এজেহারে বলিল। সাহজাদা সেলিমসাহার জন্য লইয়াছিল কিনা, জিজ্ঞাসা করায় কহিল—যে কোন নির্দ্দিষ্টব্যক্তিব জন্য খরিদ করেনাই। তাহার অনেকগুলি সাক্ষীর এজেহার হইল। সকলেই বলিল দৌলতবাম বড় ধর্ম্মভীরু। চুরী তাহার পক্ষে অসম্ভব।

দৌলতবাম যে সময় সওদাগবের নিকট হইতে মেয়েটীকে খরিদ করে, তখন ঐ সকল সাক্ষী উপস্থিত ছিল বলিয়া স্বীকার করিল। একজন সাক্ষী তামা, তুলসী ও গঙ্গাজল হাতে করিয়া, শপথ কবিতে বড গোল করিল। বলিল—আমি শপথ কবিব না।

আদালত—

কেন শপথ করিবে না?

সাক্ষী—

ধর্ম্মাবতার! আমাকে মিথ্যাকথা শিখাইয়াছে। আমি শপথ করিয়া মিথ্যা বলিতে পারিব না।

আদালত—

অপর সাক্ষীদিগকে শিখাইয়াছে কি না বলিতে পার?

সাক্ষী—

একটী বাঙ্গালী স্ত্রীলোককে অনেক কথা শিখাইতে শুনিয়াছি। অপর সাক্ষীর কথা বলিতে পারি না। সাক্ষীকে বিদায় দেওয়া হইল এবং বিধু-মুখীর তলব হইল।

আদালত—

তুমি এই চুরীর মোকদ্দমা সম্বন্ধে কি জান?

বিধুমুখী—

আমি তোমাদের কোন কথা বুঝিতেপারিতেছি না; কি করিয়া উত্তর দিব?

একজন দোভাষা আসিয়া আদালতের সওয়াল, বাঙ্গালা করিয়া বুঝাইয়া দিল।

আদালত—

তুমি কি জান?

বিধু—

আমি সব জানি।

আদালত—

সব জান কিরূপ? আচ্ছা বলিয়া যাও।

বিধু—

না-না আমি কিছুই জানি না।

আদালত—

এবেটী বড় বজ্জাত, ইহাকে আচ্ছা করিয়া শিখাইয়া লইয়া আইস; একটু জব্দ না হইলে সত্য কথা বলিবে না।

হাকিমের স্বর বড় কর্ক্কশ। বিধু, ভয়ে এবং ক্রোধে এইবার যাহা মনে আসিল তাহাই বলিতে লাগিল।

আদালত—

তুমি চুরীর সময় তাঁবুতে উপস্থিত ছিলে ?

বিধু—

ছিলাম।

আদালত—

তবে তোমার মনিবকে চুরীর খবর দাও নাই কেন ?

বিধু—

চুরী কেন হবে ? তারা আপন ইচ্ছায় গিয়াছিল।

আদালত—

আপন ইচ্ছায় যার তার সঙ্গে চলিয়া গেল ? অসম্ভব কথা।

বিধু বুঝিল কথাটা অসম্ভবই হইয়াছে। তখন হাকিমের বিশ্বাসের জন্য একটু বাঁধুনি করিয়া বলিল—যাহারা লইয়া গিয়াছিল, তাহারা আমাদের পরিচিত। তাহারা পাটনা সহর হইতে আমাদের সঙ্গ লইয়াছিল। উহারা তারাকে রাজরাণী করিয়া দিবে বলে। তাহাতেই তারা স্বীকৃতা হয়।

আদালত—

কোন্ রাজার রাণী করিয়া দিবে বলিয়াছিল ?

দৌলতরাম, অর্থ দিয়া বিধুকে ভাঙ্গাইয়া নিজপক্ষ ভুক্ত করিয়াছিল এবং যাহাতে তাহার ও সেলিমসাহার নাম গোপন থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ করিয়া শিক্ষা দিয়াছিল।

কিন্তু অতিবুদ্ধি বিধুমুখী আদালতের সওয়ালে উভয়েরই নাম

করিয়া বসিল। বলিল—দৌলতরাম বলিয়া পাঠাইয়াছিল, যে তারা-সুন্দরীকে সেলিম সাহার বেগম করিয়া দিবে।

আদালত বিধুকে বিদায় দিয়া রায় লিখিতে বসিলেন।

এই সময়ে আদালত গৃহে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। সেনাপতি সমরেন্দ্রনারায়ণ সহসা মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। সুজনসিংহ প্রভৃতি তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মোকদ্দমার রায়।

এই মোকদ্দমা অতিশয় জটিল। আবার আর একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহা অতি সহজ। মোকদ্দমা মনুষ্যচুরীর। ফরিয়াদী এবং আসামী উভয়পক্ষের মানিত সাক্ষী বিধুমুখীর এজেহারে চুরী পরিষ্কাররূপে প্রমা-নিত হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, চুরী করিল কে? দৌলতরামকে চুরী করিতে কেহই দেখে নাই এবং উহা কর্ত্তৃক চুরী হইবার কোন প্রমাণ ফরিয়াদি পক্ষ দেয় নাই বা দিবার চেষ্টাও করে নাই। প্রহরী সীতারাম মাত্র বলিয়াছে, যে সে দৌলতরামের নিকট টাকা পাইয়া, চৌর্য্য কার্য্যে সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু সে-ও দৌলতরামকে জানে বা তাহার নিকট হইতে টাকা লইয়াছিল, এমন কথা বলে নাই; দৌলতরামের লোকের সহিত তাহার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল এইরূপ এজেহার দিয়াছে।

দৌলতরাম নিজে বলে যে, সে একজন সওদাগরের নিকট মেয়েটীকে খরিদ করিয়াছিল। সে ঐ মেয়েটীকে বড়লোকের নিকট বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবে, এই উদ্দেশ্যে সওদাগরের নিকট হইতে খরিদ করিবার কথা বলে। দৌলতরামের নিজ এজেহারে এবং সেনাপতি সমরেন্দ্রনারায়ণ ও সুজনসিংহের সাক্ষে কন্যাটী দৌলতরামের বাটীতে থাকা প্রমাণ হইয়াছে। এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐরূপ সুন্দরী যুবতী রমণী অপহরণ করিবার জন্য আগ্‌রা সহরে কতকগুলি আড্ডা হইয়াছে। ঐ সকল আডডার অসৎ লোকেরা অসৎ চরিত্র বড় লোকের পাপ পিপাসা নিবারণার্থ ভাল ভাল লোকের সুন্দরী এবং অল্পবয়স্কা কন্যা চুরী করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। ঐ দুষ্টচরিত্র দস্যুগণ প্রত্যক্ষভাবে ঐ সকল কন্যা আনিয়া বড়লোকদিগকে দেয় না। উহারা আবার কতকগুলি সাধুতার ভাণকারী ব্যবসায়ীকে বিক্রয় করে। ঐ সকল ব্যবসায়ীর নামপ্রতিপত্তি থাকায় লোকে উহাদিগকে অবিশ্বাস করিতে পারে না। দৌলতরাম একজন সেই প্রকারের লোক। ফলতঃ দৌলতরাম চুরী না করিলেও চোরা জিনিস খরিদ করিয়াছে। অতএব চোরের অপেক্ষা তাহার অপরাধ লঘু নহে। আমি এই জন্য উহাকে আদর্শদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম। দৌলতরামের পাঁচ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত ফাটক ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা হইল ; জরিমানার টাকা না দিতে পারিলে উহাকে আরও এক বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত মিয়াদ ভোগ করিতে হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, এই মোকদ্দমায় এমন কোন নাম প্রকাশ পাইয়াছে, যাহাতে সুবিচারের বাধা হইতে পারে। কিন্তু এপক্ষ যখন শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক এই দায়িত্বপূর্ণ বিচারকের পদ গ্রহণ করিয়াছে, তখন স্বয়ং সাহান্‌শাহার নাম কোন মোকদ্দমায় জড়িত থাকিলেও বিচার সম্বন্ধে ইতঃস্ততঃ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। জগদীশ্বর এপক্ষের বিচারকার্য্যে সহায় হউন।

মৌলভি কেরামতউল্লা।

প্রধান কাজি।

ফৌজদারী আদালত। আগ্‌রা রাজধানী।

হিজরী ৯৮২ অব্দ ১৯ শাবান।

২য় দফা—

প্রভুকন্যা অপহরণের সহায়তা জন্য সীপাহী সীতারামকে এবং ঐ প্রকার অপরাধের সাহায্য ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য বিধুমুখী দাসীকে, স্বতন্ত্র বিচারার্থ ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা গেল। সপ্তাহ পরে উহাদিগের নামিত মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ করা যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কঠিন পীড়া।

বিচার শেষ হইল। দৌলতরাম দণ্ড প্রাপ্ত হইল। অপহৃতাতারা ঘরে ফিরিল; কিন্তু বিজয়কুমারের কোন উদ্দেশ হইল না। রায়মহাশয় বিজয়ের অন্বেষণে যারপরনাই চেষ্টা করিলেন। অবশেষে সকলে হতাশ হইলেন। হতাশ হইলেন না কেবল তারাসুন্দরী; আর হতাশ হইলেন না শশীমুখী। শশী বুঝাইবার জন্য তারার ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তারাসুন্দরী বিছানায় মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছেন। অপহৃতা তারা ফিরিয়া আসিয়া অবধি যেন কেমন কেমন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সে সুন্দর গোলাবী গৌর মিশ্রিত বর্ণে কে যেন কালী ঢালিয়া দিয়াছে। মুখের সে লাবণ্য নাই; কেশের সে পারিপাট্য নাই। ধূলিধূসরিত অঙ্গে, মলিন বেশে তারাসুন্দরী পবনতাড়িতা, সহকার বিচ্যুতা লতাসুন্দরীর ন্যায় শয্যার এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছেন। তারা! তারা! দিদি কাঁদিতেছ? ছি দিদি! এত শিক্ষা দিলাম; তাহার ফল কি এই হইল। বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ। বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে; উন্নতির অবস্থায় দোষীকে ক্ষমা এবং সভামধ্যে বাকপটুতা প্রদর্শন করিবে; আর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বিক্রম প্রকাশ করিতে হইবে। এইত সংসারীর পক্ষে বিশেষ কার্য্যকারী উপদেশ।

সেই জন্য এখনও বলিতেছি, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। হতাশ হইবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। কথায় আছে, "যে যাহাকে চায়; সে তাহাকে পায়।" তোমার প্রবলবাসনার নিকট কোনশক্তিই বলপ্রকাশ করিতে পারিবে না। স্বামীদর্শনেচ্ছা যদি প্রবলতার সহিত তোমার মনে উঠিয়া থাকে, তবে অচিরে তোমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আমি সন্ন্যাসিনী। আমি বৃথা বৃথা বহুকথা বলি না। অতএব যাহা বলিতেছি তাহা দার্শনিক ভাবেই গ্রহণ কর, আর আধ্যাত্মিক ভাবেই বিবেচনা কর, সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিও না।

তারা —

দিদি! তোমার কথা বিশ্বাস করিব না? তা দিদি! এতদিনত এত প্রবল সাহস দেও নাই। আজি কি সাহস দিবার কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত হইয়াছে?

শশী— .

সে পরে বলিব। এখন উঠিয়া আমার সঙ্গে এস; রায় মহাশয় ডাকিতেছেন। বলিয়া, শশীমুখী তারার চিবুক ধরিয়া আদর করিতে গেলেন। দেখিলেন, তারার গা গরম হইয়াছে; চক্ষুঃ ছল ছল করিতেছে। উঠিয়া কাজ নাই দিদি! তোমার জ্বর হইয়াছে; বলিয়া, শশী রায় মহাশয়কে সংবাদ দিতে গমন করিলেন।

রাত্রিতে তারার জ্বর প্রবল হইল। সঙ্গে সঙ্গে বিকার। প্রবল পিপাসা। শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা। জ্ঞানের লেশ নাই। রায় মহাশয় আসিলেন; দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। উপযুক্ত চিকিৎসক আনাহইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পীড়া উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। রাজা বিক্রমজিতকে বলিয়া, বাদসাহের চিকিৎসক হাকিম আলিখাঁকে আহ্বান করা হইল। হাকিমআলিখাঁ রোগিনীর আপাদ

মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—ইঁহার মানসিক কষ্টের কোন কারণ আছে কি? হাকিম চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তাঁহার চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকমতে। তাঁহার চিকিৎসা শুদ্ধ ঔষধের ও পথ্যের উপর নহে। দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থা এবং বয়স ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তিনি চিকিৎসা করিয়া থাকেন। তিনি মধ্যবিদ্ বা দরিদ্র ব্যক্তিকে যে রোগে নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা করেন, বাদসাহ প্রভৃতিকে সেই রোগে দুগ্ধ মাংস এবং অন্ন দিয়া থাকেন। শুদ্ধ হাত দেখিয়া এবং নাড়ী টিপিয়া তাঁহার চিকিৎসা নহে; তাঁহার নিকট রোগের অবস্থা, রোগের পূর্ব্বহইতে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতে হয়।

হাকিম আলি কহিলেন—রোগ বড় কঠিন নহে। মানসিক বিকারের শান্তি করিতে পারিলে, এ রোগ অতি সত্বর আরাম হইয়া যাইবে। সম্রাটের অন্যতর হাকিম মজফরখাঁকেও আনয়ন করা হইল। মজফর ভয় দেখাইলেন। বলিলেন—রোগিণীর যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে আরোগ্যের আশা অতি অল্প। ঔষধের গুণে যদি এ ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, তবে বাঁচিবার সম্ভাবনা।. তাঁহার সহিত হাকিম আলিখাঁর আগুন জল সম্বন্ধ। আলিখাঁ যাহা বলিবেন, তাঁহাকে তাহার বিপরীত বলিতেই হইবে। আলিখাঁর কথিত মানসিক বিকারের কথা তিনি হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন।

রজনীতে প্রলাপ বৃদ্ধি হইল। কয়েকদিন রোগিণী সময়ে সময়ে ভুল বকিতেছিল; অদ্য প্রলাপের বিরাম নাই। শশী ডাকিলেন—তারা! তারা! কি বলিতেছ? তারার সংজ্ঞা নাই। অথচ প্রলাপরও বিরাম নাই।

তারা প্রলাপে বলিতেছেন—

কই নাথ! কই তব সে মোহন সাজ।
যে সাজে তারার হৃদে করিছ বিরাজ॥

হৃদাসনে দেখি যাহা,
প্রত্যক্ষ না দেখি তাহা,
তবে কি তুমি না মোর হৃদি অধিরাজ ?

তারার দুই চক্ষে বারিধারা পড়িতে লাগিল। ডাকিলে সংজ্ঞা নাই। তারা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন।

আবার প্রলাপ—

সেই মুখ, সেই চোখ, সেই মধুস্বর।
অথচ হবেনা কেন মোর প্রাণেশ্বর ?
লুকায়েছ সেই রূপ,
স্বরূপে কেন বিরূপ,
কোথা সে মোহন মূর্ত্তি প্রাণমুগ্ধকর ?
দহিতে তারার প্রাণ,
কেন এত আকিঞ্চন,
কেন গো ছলনা এত হৃদয়-ঈশ্বর ?

বড় তৃষ্ণা বলিয়া তারা হাঁ করিলেন। শশিমুখী বেদানাররস মুখে সিঞ্চন করিলেন, আর বলিলেন—লক্ষ্মী দিদি! অত বকিতে নাই। বকিলে পীড়া বৃদ্ধি হইবে।

শশিমুখীর কথা এবার তারার কর্ণে প্রবেশ করিল। কহিল—দিদি! আর প্রাণে কাজ কি? যদি প্রাণের প্রাণকে না পাইলাম, তবে প্রাণ থাকিলেই কি? আর গেলেই কি? তারা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

আবার প্রলাপ—

যেই বেশে থাক তুমি, চিনেছি তোমায়।
জীবনের প্রাণ তুমি যাইবে কোথায় ?
যেই বেশে থাক তুমি,
তুমিই আমার স্বামী,
বিজয়কুমার বেশ দেখাও আমায়।

এইবার একটু তন্দ্রার আবেশ আসিল—

পুনর্ব্বার প্রলাপ—

সেই বেশ সেই বেশ, সেই বেশে, মন।
যে বেশে তারার হৃদে কর বিচরণ ॥
জানামি তোমায় আমি,
হৃদয়ের অধিস্বামী,
তথাপি মম সর্ব্বস্ব (রাম) কমললোচন।
বিজয়কুমার মূর্ত্তি মোর আকিঞ্চন ॥

নাথ! তুমি যদি সেই নও, তবে মোকদ্দমার দিন আদালতমধ্যে মূর্চ্ছিত হইলে কেন? সেই দিন হইতে স্পষ্টরূপে তোমাকে বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি কোন বিশেষ অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য তোমাকে ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইয়াছে। তা নাথ! তারার উদ্দেশ পাইয়াও সে বেশ পরিত্যাগ করিতেছ না কেন? অভাগিনীকে দেখা দিতেছ না কেন? তারার উপর ঘৃণা হইয়াছে; তারার অজ্ঞাতবাসে সন্দেহ হইয়াছে। নতুবা তারাগতপ্রাণ আমার হৃদয়েশ্বর এত বিলম্ব করিবেন কেন? বুঝিয়াছি—আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। শশী দিদি! শশী দিদি! জল দাও, বড় তৃষ্ণা। দিদি! হাকিম কি বলিলেন? শীঘ্র জ্বালাজুড়াইতে পারিব কি? আর যে সহ্য হয় না।

শ্যামা পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছিল, তারার কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আবার হাকিমআলি আসিয়া তারাকে দেখিলেন। বলিলেন—আপনারা করিতেছেন কি? এখনও মানসিক পীড়া শান্তির উপায় করিলেন না; ইঁহার শারীরিকপীড়ার অনেক শান্তি হইয়াছে: কিন্তু যে প্রকার দেখিতেছি তাহাতে শীঘ্রই পাগল হইবার সম্ভাবনা। ঐ দেখুন, দুই চক্ষুঃ জবাফুলের মত রক্তবর্ণ হইয়াছে। মাথাও বোধ হয় অত্যন্ত উষ্ণ হইয়াছে। যাহা হউক আমি এক্ষণে একটী ঔষধ দিতেছি, তাহাতে রোগের প্রভাব অনেক কমিয়া যাইবে। কিন্তু যাহা বলিলাম তাহা না করিলে শীঘ্রই উন্মত্ততা আসিবে।

রায় মহাশয় আসিয়া কহিলেন—হাকিম সাহেব! আপনার রোগনির্ণয় ক্ষমতা অদ্ভুত। আপনার চিকিৎসাও অদ্ভুত। আমরা উহার মানসিক পীড়ার কারণ অবগত আছি। যে কারণে সহসা এই পীড়া হইয়াছে, তাহাও অবগত আছি। মানসিক পীড়াশান্তির নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাইতেছে।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসিনী।

যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রযাতি।
যদেব মনসা নগণিতং তদিহমভ্যুপেতি॥
প্রাতর্ভবামি বসুধৈবচক্রবর্ত্তী।
সোঽহং ব্রজামি বিপিনে জটিলস্তপস্বী॥

এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে করিতে, একটী জটাজূটধারিণীপীতবসনা সন্ন্যাসিনী সমরেন্দ্রনারায়ণের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

সমরেন্দ্র, সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া, প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসিনী, সেনাপতি সাহেবের জয় হউক বলিয়া, হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সমরেন্দ্র, বসিবার নিমিত্ত আসনপ্রদান করিয়া করযোড়ে কহিলেন, দেবি! আপনাব দর্শনে পবিত্র হইলাম। এক্ষণে অধমের প্রতি কি আদেশ জানিতে পাবিলে কৃতার্থ হই।

সন্ন্যাসিনী—

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥

যাহার মন বশীভূত হয়, সেই ব্যক্তি মনের বশীভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বিস্তর উপভোগ করিলেও শান্তি অর্থাৎ চিত্তপ্রসাদলাভ করিতে পারে। সেই জন্য বলি অত উতলা হইলে চলিবে কেন? রাগদ্বেষাদি বশীভূত করিতে চেষ্টা কর; বিপদে ধৈর্য্যালম্বন করিতে শিক্ষা কর। তাহা হইলে আর অনর্থক কষ্ট পাইতে হইবে না।

সমরেন্দ্র—

আপনি কি বলিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

সন্ন্যাসিনী—

অন্তরের অগ্নি ধূ ধূ জ্বলিতেছে; একটু সমতা করিলে ভাল হয় না?

সমরেন্দ্র—

আপনি কি অন্তর্যামিনী? অথবা আপনি যখন বিষয়তৃষ্ণা বিরাগিনী সন্ন্যাসিনী, তখন আপনার পক্ষে অসম্ভব কি আছে?

সন্ন্যাসিনী—

অত তেজে আগুন জ্বলিতেছে, দেখিতে পাইব না কেন? অন্তর্যামিনী না হইলেও এ আগুন দেখা যায়।

সমরেন্দ্র—

ভগবতি! এ অনল নির্ব্বাপনের কি কোন উপায় নাই?

সন্ন্যাসিনী—

থাকিবে না কেন? তুমি একটু ধৈর্য্য ধারণ করিলেই ইহার উপায় হয়।

সমরেন্দ্র—

বল দেবি! কি উপায়ে আমি শান্তি পাইতে পারি? আমার জীবনের লক্ষ্য, সুখের আশা, চিরদিনের মত অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে। এখন আমি পথভ্রান্তপথিকের ন্যায় দিক্‌হারা, লক্ষ্যহারা, জ্ঞানহারা হইয়া বেড়াইতেছি। এ জীবনে আর সুখ হইবে না; স্বচ্ছন্দ পাইব না; শান্তি মিলিবে না।

সন্ন্যাসিনী—

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥

শান্তিলাভ হইলে প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির সর্ব্বদুঃখ নষ্ট হয় এবং বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তুমি মনের শান্তি হারাইয়া বুদ্ধি হারাইতে বসিয়াছ। সেই জন্য কষ্ট পাইতেছ। নতুবা তোমার সকলি আছে; কিছুই যায় নাই; কিছুই নষ্ট হয় নাই।

সমরেন্দ্র—

সব আছে? কিছুই যায় নাই?

সন্ন্যাসিনী—

না কিছুই যায় নাই। যেমন ছিল তেমনি বিশুদ্ধ, বিমল এবং পবিত্র ভাবেই আছে।

সমরেন্দ্র—

কি ছিল? কি নাই?

সন্ন্যাসিনী—

পরীক্ষা? অবিশ্বাস? চাতুর্য্য?

সমরেন্দ্র—

দেবি! ক্ষমা করুন। আমার মতিস্থির নাই।

সন্ন্যাসিনী—

অরিমিত্রমুদাসিনং ত্রিবিধং স্যাদিদং জগৎ।
ব্যবহারসুনিয়তং দৃশ্যতে নান্যথা পুনঃ॥

প্রিয়াপ্রিয়াদিভেদস্তু নিয়তস্ফুটম্।

এই সংসারে কেহ কাহার প্রিয় বা অপ্রিয় নাই; কেহ কাহারও শত্রুও নহে, আবার কেহ কাহারও মিত্র নহে। জীব, মনের ভ্রান্তিতে ঐমত বিবেচনা করিয়া থাকে মাত্র।

সমরেন্দ্র—

দেবি! আমি কামনাবাসনারবশবর্ত্তী বুদ্ধিবিহীনবদ্ধজীব। আমার ধর্ম্মভাবের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। অতএব আমাকে বেদ বেদাঙ্গ প্রতিপাদ্য উচ্চঅঙ্গের উপদেশ দিলে কোন কার্য্য হইবে না। অনুগ্রহ করিয়া সরল এবং সাধারণভাবে আমার হৃদয়যাতনা নিবারণ করুন।

সন্ন্যাসিনী—

তুমি চতুরতা করিতেছ এবং আত্মগোপন করিতেছ বলিয়া, আমিও সেই পথে যাইতেছি। ধরা দিতেছি না। নতুবা এতক্ষণ সরলভাবে সকল কথা বলিতে পারিতাম। বলিয়া—অনুচ্চস্বরে একটী গান গাহিলেন;

কেন এত বিড়ম্বনা, কেন এ লাঞ্ছনা।
যে তোমার অনুগত, কেন তারে এ যাতনা॥

হৃদে ধরে যত্ন করে,
তবপদ পূজা করে,
সে মরে মরমতাপে, একবার দেখ না॥

এইবার সমরেন্দ্রের চমক্ ভাঙ্গিয়াছে। এইবার শশিমুখীকে চিনিতে পারিয়াছেন। আর আত্মগোপন করা উচিত নহে, বিবেচনা করিয়া সমরেন্দ্র কহিলেন—শশিমুখি! আমি তোমাকে সন্ন্যাসিনীরসাজে এতক্ষণ চিনিতে পারি নাই। তা তুমিত প্রকৃত সন্ন্যাসিনীই বটে। আমার বোধ হয় তোমরা আমার সে দিবসের মূর্চ্ছা দেখিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছ?

শশী—

আমরা ধরিবার পূর্ব্বে যে ধরিবার সেই ধরিয়াছে। এই বলিয়া, সমরেন্দ্রের প্রতি তারার ভাল বাসার উদ্রেক, তজ্জন্য শশীর তিরস্কার, তারার আত্মগ্লানি ইত্যাদি বিশদরূপে বর্ণনা করিলেন। পরিশেষে তারার সাংঘাতিক পীড়া, হাকিমের রোগনির্ণয়, উন্মাদ হইবার সম্ভাবনা প্রভৃতি সমস্তই বলিলেন। সমরেন্দ্র নীরবে সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন; কোন কথা বলিলেন না। যে তারার নখাগ্রে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইলে, সমরেন্দ্র প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হন না; আজি তাঁহার সেই প্রাণাধিকা তারাসুন্দরী জীবনমরণের সন্ধিপথে দণ্ডায়মানা; এখনও সমরেন্দ্র নীরব!

কেন সমরেন্দ্র নীরব রহিলে কেন? সন্দেহ হইয়াছে? নিষ্কলঙ্ক তারার চরিত্রে সন্দেহ হইয়াছে? কই সন্দেহেরত বিশেষ কারণ দেখিতে পাই না? এক সন্দেহ এই হইতে পারে যে, ঐশ্বর্য্য—আকাঙ্ক্ষিণী তারাসুন্দরী বিলাসবাসনার বশবর্ত্তিনী হইয়াছেন। বিধুদাসীর সাক্ষ্য দ্বারা ঐপ্রকার সন্দেহ তোমার মনোমধ্যে উদয় হইতে পারে। কিন্তু বিধুমুখী কতদূর সত্যপরায়ণা তাহা তাহার কার্য্য, ব্যবহার এবং এজেহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে। তারাসুন্দরী, সেলিমের অনুরাগিণী হইয়াছিলেন বলিয়া যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তবে সে, সিংহাসন চরণে ঠেলিয়া দিল কেন? দৌলতরামপত্নী কত সুন্দরীকে প্রলোভনে ভুলাইয়াছে; কিন্তু তারাকে কোন প্রলোভনে মুগ্ধ করিতে পারিল না কেন? তারাকে ভুলান দূরের কথা, সে—স্পর্শমণি তারামণির সংস্পর্শে পাপ ভুলিয়া বিবেকদংশনে কাতরা হইয়া সুজনসিংহের শরণ লইল। তাহাতেইত তারার উদ্ধার হইয়াছে। তুমিইত তাহার উদ্ধারসাধন করিয়াছ।

সুজনসিংহের নিকটে ত তারার দেবীচরিত্রের কথা শুনিয়াছ। বল সমরেন্দ্র ঐসকল কথা সত্য কি না? ঐ সকল কথার উত্তর দিয়া তুমি তারাকে যাহা ভাবিতে হয় ভাবিও। আর একটী কথা এই বলি যে, নিজ হৃদয়কে একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, তারা কি? তারা যদি তোমার অন্তরের কেহ না হয়, তবে উত্তর পাইবে না। আর তারা যদি তোমার অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপিণী হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই উত্তর পাইবে। উত্তর এই পাইবে যে, তারা খাঁটী সুবর্ণ। তোমার আত্মার সহিত একসূত্রে গাঁথা তারাকে জানিবার জন্য এদিক্ ওদিক্ করিতে হইবে কেন? অন্তরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারতন্ত্রে আঘাত কর; ঝন্ ঝন্ থন্ থন্ স্বরে তোমাকে নিগূঢ় তত্ত্ব বলিয়া দিবে। এখন যাও, না হয় ছদ্মবেশেই একবার

যাও। একবার তাহার অবস্থা দেখিয়া আইস। তুমি সমরেন্দ্রভাবে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছ; অতএব এই বেশেই যাও; এই বেশই তোমার ছদ্ম-বেশের কার্য্য করিবে। তুমি তারাসুন্দরীর উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া, রায়মহাশয় তোমার যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিবেন; হরসুন্দরীদেবী এবং শ্যামাপ্রভৃতি শতমুখে তোমার প্রশংসা করিবেন। কে যেন এই প্রকার বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। সমরেন্দ্র অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে দৈববাণীস্বরূপ এই সকল কথা শ্রবণ করিলেন। পরে বলিলেন—শশী দিদি! চল একবার তারাকে দেখিয়া আসি। আবার সেই দৈববাণী! কি? তারাকে দেখিয়া আসি? আমার তারাকে, আমারঅন্তরের অন্তর তারারত্নকে দেখিয়া আসি, একথা তোমার মুখ দিয়া বাহির হইল না? যে তারা তোমার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী, যে তারা তোমার পদারবিন্দভিন্ন সমস্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে, যে তারা তোমার জন্য প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছে, তাহার উদ্দেশে একটীমাত্র প্রিয়সম্ভাষণ তোমার রসনা হইতে বাহির হইল না? হায় রে স্বার্থপর সংসার! এই কি ভালবাসার প্রতিদান! এই কি স্বার্থত্যাগের পুরস্কার! আচ্ছা যাও সমরেন্দ্র! যাইবামাত্র তাহার নিঃস্বার্থ অনুরাগের এবং বিশুদ্ধতার জ্বলন্ত নিদর্শন দেখিতে পাইবে। তাহাতেও বিশ্বাস না হয়, শেষ উপায় বলিয়া দিব। সমরেন্দ্র কলের পুতুলের ন্যায় শশিমুখীর অনুগমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আসন্ন অবস্থা।

সদর বাটীতে রায়মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রায়মহাশয় যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—সেনাপতি মহাশয়! তোমাদের এত যত্ন ও পরিশ্রম বিফল হইল। তারা বুঝি আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া পলায়। সমরেন্দ্রের আর কঠোরতা নাই। তাঁহার জীবনসহচরী তারা, তাঁহার অন্ধকারের আলোক তারা, তাঁহার সংসারের একমাত্র আশা ভরসা তারা, ফাঁকি দিবে? তবে কি লইয়া সংসার? কি লইয়া জীবন? তাঁহারও এই সঙ্গে সব ফুরাইবে। সমরেন্দ্রের হৃদয়ে প্রবল ঝটিকা বহিতেছে। যাও বাবা! অনেক কষ্টে তাহার উদ্ধার করিয়াছ; একবার শেষ দেখা দেখিয়া আইস; বলিয়া, রায়মহাশয় শশীকে লইয়া যাইতে বলিলেন। সমরেন্দ্র ছায়ার ন্যায় শশীর পশ্চাৎগামী হইলেন। হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে! চক্ষে জল আসিতেছে! প্রাণের ভিতর কেমন করিতেছে! আত্মপ্রকাশ আশঙ্কায় অনেক কষ্টে চক্ষুজল নিবারণ করিলেন, কিন্তু পা আর উঠে না।

তারার একটু জ্ঞান হইয়াছিল। এখন আবার ভুল বকিতেছেন। তারা বলিতেছেন—তুমি যে বেশেই থাক, আর যে দেশের লোক বলিয়াই পরিচয় দাও, তুমিই আমার বিজয়কুমার। তাহা না হইলে আমার হৃদয়ের এত আকর্ষণ হইবে কেন? প্রাণকান্ত! একবার সেই মনোমোহন বিজয়কুমার বেশে আমাকে দেখা দাও। আমার হৃদয়মন্দিরের দেবতার বেশে সম্মুখে দাঁড়াও। আমি তোমার এবেশ দেখিতে পারি না। তুমি আমাকে

উদ্ধার করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাকে শতশত ধন্যবাদ দেওয়া আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; কিন্তু তাই বলিয়া প্রাণের এত আকর্ষণ হয় কেন? প্রাণের আকর্ষণ হইয়াছে বলিয়াই বুঝিয়াছি যে, তুমি আমার হৃদয়ের দেবতা। আমি নিত্য যে দেবতাকে আরাধনা করি, তুমিই আমার সেই দেবতা। কিন্তু আমি এমূর্ত্তির পূজা করিতে পারি না; তাহাতে আমার অধর্ম্ম।

সমরেন্দ্র, তারার বিবর্ণ এবং বিশীর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া ধৈর্য্যশূন্য হইয়াছেন। তাহার উপর আবার এই প্রলাপ শুনিয়া একবারে চৈতন্যশূন্য হইয়া পড়িলেন। তিনি তারার নিকট যাইতে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার তারার নিকট যাইবেন, তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবী তারাকে সান্ত্বনা দিবেন, আদর করিবেন, ইহাতে দোষ কি? সমরেন্দ্র আত্মহারা। শশিমুখী তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—কর কি? এই কি সময়? আত্ম দমন কর। ধৈর্য্যবলম্বন কর। চল, আর এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে। বলিয়া সমরেন্দ্রকে বাহিরে লইয়া আসিলেন। সমরেন্দ্র বাহির বাটীতে আসিয়া শুনিলেন, স্বামী পরমানন্দপরমহংসদেব হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়াছেন। গতকল্য তাঁহার ঋষির আশ্রমে আসিবার কথা ছিল। সমরেন্দ্র অপার জলধিমধ্যে কূল পাইলেন। মনে মনে বলিলেন—আর আশঙ্কা নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—:*:—:*:—

অভয়বাণী।

সমরেন্দ্রের আর গৃহে যাওয়া হইল না। একখানি একাগাড়ী ভাড়া করিয়া প্রয়াগধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনও বেলা ঝিকিমিকি করিতেছে। আর বিলম্ব না করিয়া একখানি নৌকা দেখিয়া "ঝুসির পরমহংসদেবের ঘাটে তুলিয়া দিবে" বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। মাঝী একবার মুখের দিকে চাহিয়া পুরস্কারের আশা বুঝিতে পারিল এবং কালবিলম্ব না করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। সমরেন্দ্র মনে করিতেছেন, কতক্ষণে পরমহংসদেবকে দেখিবেন। সমরেন্দ্রের এত সত্বরতা কেন? পরমহংসদেবের নিকট হইতে আধ্যাত্মিক ঔষধি লইয়া তারার ও তাঁহার রোগশান্তি করিতেহইবে বলিয়া, তাঁহার এত সত্বরতা। নৌকা পরপারে পঁহুছিল। সমরেন্দ্র মাঝীকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়া, স্বামিজীর আশ্রমে উপনীত হইলেন। দেখিলেন—শ্বেতশ্মশ্রু জটাজূটধারী দিব্য কান্তি মহাপুরুষ, অচল পর্ব্বতের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। শিষ্য, অনুশিষ্য প্রভৃতি কেহই নিকটে নাই। সমরেন্দ্র চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন। স্বামিজী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—বিজয়কুমার আসিয়াছ? একি? স্বামীত তাঁহাকে যোগেন্দ্রনারায়ণ বলিয়া জানিতেন। ব্রহ্মচারী যোগজীবন তাঁহাকে ঐ নামে স্বামিজীর নিকট অভিহিত করিয়াছিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে অনেকবার ঐ নামেই সম্বোধন করিয়াছেন। পরে রাজা বিক্রমজিত, স্বামিজীর অনুমতি অনুসারে সমরেন্দ্রনারায়ণনামকরণ করেন। তাহার পর হইতে স্বামিজী তাঁহাকে সমরেন্দ্র বলিয়াই

সম্বোধন করিয়া আসিতেছেন। আজ হঠাৎ বিজয়কুমার নামে অভিহিত করিলেন কেন? অথবা মহাপুরুষের অবিদিত কি আছে? সমরেন্দ্র মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

স্বামী, সমরেন্দ্রনারায়ণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বলিলেন—যোগজীবন, তোমার পরিচয় না দিলেও তুমি যে কে, তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু সে সময় পরিচয় ও নাম গোপন প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া, তোমার প্রকৃত নাম প্রকাশ করি নাই। এক্ষণে নাম প্রকাশের সময় হইয়াছে; এইজন্য প্রকৃত নামে তোমাকে সম্বোধন করিলাম।

সমরেন্দ্র—

দেব! আপনার অজ্ঞাতই বা কি আছে? আর আপনার অসাধ্যই বা কি আছে?

স্বামিজী—

পাগল আর কি? মিথ্যামিথ্যা সন্দেহের অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছ। যাহাকে সন্দেহ করিতেছ, সে পরিশুদ্ধা, পবিত্রা এবং পতিপরায়ণা।

সমরেন্দ্র—

মহাত্মন্! দেব! প্রভো! আজ আমি সুশীতল হইলাম। আজি আমার হৃদয়ের স্বচ্ছন্দতা ফিরিয়া আসিল। আমি এতদিন জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ হইতেছিলাম। কিন্তু দেব! তারাআমার আসন্নমৃত্যুর অবস্থায় অবস্থিত। তাহার পীড়াশান্তির কি হইবে?

স্বামী—

বৎস! তোমার নির্বুদ্ধিতায় তারার এই বিষম পীড়া হইয়াছে। তুমি তাহাকে জানিতে পারিয়াও যখন তাহার উদ্দেশ করিলে না, তখন হইতেই তাহার পীড়ায় সূত্রপাত। স্বামীগতপ্রাণা রমণীর স্বামী-অদর্শন বড়ই ক্লেশের কারণ। তুমি যে তাহাকে সন্দেহ করিয়াছ, তাহা সে এখনও

জানিতে পারে নাই। তাহা জানিতে পারিলে তাহার প্রাণরক্ষা করা দুষ্কর হইত। যাহাহউক এখন আর কোন আশঙ্কার কারণ নাই। তোমার পরিচয় ক্রমে ক্রমে সে যেন পায়। একবারে যেন দেখা দিও না। তাহাহইলে হিতে বিপরীত হইবে। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিয়াছ, ইহাতে আমি সন্তোষলাভ করিলাম। আরও দুই একটী প্রত্যক্ষ উপায়ে তোমার সন্দেহভঞ্জন করিবার ইচ্ছা আছে। যদি কৌতূহল হয়, দেখিতে পার।

সমরেন্দ্র—

ভগবন্! তারার অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া আসিয়াছি।

স্বামিজী—

তোমার তারা আর রোগশয্যায় নাই। সে উঠিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। শশীর নিকট তোমার সংবাদ শুনিয়া, তাহার পীড়া প্রায় আরোগ্য হইয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, তোমার দর্শনে দূর হইবে। স্বামিজীর অভয়বাণীতে সমরেন্দ্রের সমস্ত ভাবনা দূর হইল। তিনি প্রত্যক্ষ উপায়ে সন্দেহ ভঞ্জনের কৌতূহলে, সেদিবস ঝুসির পাহাড়ে রহিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—*⁐°⁐*—

ভাগ্যবিচার।

পরমহংস পরমানন্দ স্বামীর অনেক গুলি শিষ্য এবং অনুশিষ্য আছেন। তাঁহারা স্বামীর সঙ্গ ছাড়িতে চাহেন না। স্বামিজী নিম্নতলে আসিলে, তাঁহারা সকলেই তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করেন। কিন্তু পরমহংসদেব শ্রীনগর পার হইলে, আর কাহারও সঙ্গে যাইবার অধিকার নাই। শিষ্যগণ স্বামিজীর অবতরণ আশা করিয়া, কেহ শ্রীনগরে কেহবা হরিদ্বারে অবস্থান করেন। এই শিষ্যপরম্পরামধ্যে কেহ জ্যোতিষ তত্ত্ব, কেহ আধ্যাত্মিকতত্ত্ব, কেহ ন্যায়দর্শন, কেহ কেহবা গীতাভাগবতাদির আলোচনায় সময় ক্ষেপণ করেন। সন্দেহ হইলে স্বামিজীর নিকট মীমাংসা করিয়া লয়েন। ইহা ভিন্ন বেদবেদান্ত প্রভৃতিরও অনুশীলন হইয়া থাকে। কেবল তন্ত্রশাস্ত্র ও হঠযোগের আলোচনা করিতে স্বামিজীর নিষেধ। তিনি বলেন—উহার আলোচনায় কতকগুলি অলৌকিক ক্ষমতার বৃদ্ধি হয়। কিন্তু সেই ক্ষমতাতেই যোগী যোগভ্রষ্ট হইয়া, অপার দুঃখসাগরে নিপতিত হয়। স্বামিজীর আদেশমতে আজ ব্রহ্মচারী সর্ব্বানন্দস্বামী, সমরেন্দ্রনারায়ণের হস্তরেখা দেখিয়া কোষ্ঠীবিচার করিবেন এবং ভূত, ভবিষ্যৎ বলিয়া দিবেন। কোষ্ঠীবিচারের পরে হস্তচালনা বিদ্যা প্রদর্শন করিবেন।

সমরেন্দ্র, সর্ব্বানন্দস্বামীর নিকট উপবেশন করিলেন। স্বামী, হস্ত দেখিয়া একে একে সমস্ত গ্রহগুলি নির্ণয় করিয়া খড়ী দিয়া একটী জন্ম-কুণ্ডলী অঙ্কিত করিলেন এবং তাহা হইতে সমরেন্দ্রের শারীরিক, মানসিক

এবং বৈষয়িক প্রত্যেক বিষয়ের বিশদবর্ণনা করিলেন। ঐ বর্ণনা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গেল। এমন কি, তিনি যে দ্রব্য ভোজন করিতে ভাল বাসেন, যাহা করিতে আনন্দ অনুভব করেন, তাহাও বলিয়া দিলেন। পরে জীবনের যে যে বয়সে, যে সকল প্রধান প্রধান ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহারও উল্লেখ করিলেন। তাঁহার মাতার মৃত্যু, পিতার দেশত্যাগ, বিদ্যাশিক্ষা, বিবাহ, বিদেশগমন, দস্যুকর্ত্তৃক আঘাত, সম্রাট্-দরবারে সম্মান প্রভৃতি ঘটনা সুন্দররূপে বলিলেন। সমরেন্দ্রের বিস্ময়ের অবধি নাই। সর্ব্বানন্দস্বামী কহিলেন—সমরেন্দ্র! এইবার তোমার ভবিষ্যৎ এবং পত্নীচরিত্র বর্ণনা করিব। তোমার ভবিষ্যৎ বড় পরিষ্কার, বড় আশাপূর্ণ। সে সময়ও আগত-প্রায়। তুমি ধন, মান, ঐশ্বর্য্যে স্বদেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। রাজদরবারে বিপুল সম্মান পাইবে; যুদ্ধবিগ্রহে বিজয় লাভ করিবে; রাজা মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হইবে, দীন, দরিদ্র, আতুরকে আশ্রয় দিবে। সংসারে তোমারন্যায় ভাগ্যবান্ আর কে আছে? আর তোমার পত্নী, রূপবতী, গুণবতী এবং ধর্ম্মশালিনী। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে এমন পত্নীলাভ করিয়াছ। এই পত্নীর ভাগ্যেই তোমার ঐ ভাবী উন্নতি। অগাধবিদ্যাবুদ্ধি এবং প্রগাঢ়জ্ঞানসম্পন্না হইয়াও তোমার পত্নী সরলা ও বালিকাবৎ; তবে কিছু প্রখরা ও চঞ্চলা। সে চাঞ্চল্যও আর নাই। প্রখরতাও খর্ব্ব হইয়াছে। এখন ধীরা, স্থিরা ও গম্ভীরা হইয়াছেন এবং এই রূপই থাকিবেন। এমন পতি-পরায়ণা রমণী দুর্ল্লভ। পত্নী সম্বন্ধে দেখিতেছি তুমি বড়ই ভাগ্যবান্।

সহসা গোল উঠিল—সাহজাদাসেলিমসাহা মহাপুরুষের নিকট আসিয়াছেন। সর্ব্বানন্দস্বামী গণনা শেষ করিয়া, সেই দিকে গমন করিলেন। মহাপুরুষ কহিলেন—সর্ব্বানন্দ! করকোষ্ঠী, গণনা শেষ হইয়াছে; এক্ষণে হস্তচালনা বিদ্যাদ্বারা সাহজাদার অভীষ্টফল বলিয়া

দাও। তাহা হইলে সেলিম ও সমরেন্দ্র উভয়েরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সর্ব্বানন্দ স্বামী যে আজ্ঞা, বলিয়া, সেলিমসাহার সহিত আশ্রমনিকটবর্ত্তী অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সমরেন্দ্র প্রভৃতিকে কহিলেন—তোমরা সঙ্গে আইস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হস্তসঞ্চালন বিদ্যা।

ঝুসির ক্ষুদ্র অরণ্যে একখানি অন্ধকারময় কুটীরে সেলিমসাহা অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় আছেন। সম্মুখে সর্ব্বানন্দস্বামী। সমরেন্দ্র প্রভৃতি কুটীরের বাহিরে দণ্ডায়মান। সর্ব্বানন্দস্বামী সেলিমসাহার শরীরে নিজ দক্ষিণ হস্ত সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন।

হস্ত, ক্রমে ধীরভাব পরিত্যাগ করিয়া, দ্রুতবেগে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। সেলিম, প্রথমে অঙ্গুলী সহিত স্বামিজীর হস্ত, পরিষ্কাররূপে দেখিতে লাগিলেন। পরে কেবল অঙ্গুলী; এবং তৎপরে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মাত্র। পরিশেষে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে সেলিমের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিল। এখন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান লোপ হইতে লাগিল; কিন্তু অন্তর্জ্ঞান সতেজ হইয়া উঠিল। সেলিম এখন কাষ্ঠপুত্তলিকা। গম্ভীরস্বরে সর্ব্বানন্দস্বামী বলিতে লাগি-লেন—"সেলিমসাহা! এখন তোমার শারীরিক শক্তি কিছুমাত্র নাই। এ পার্থিব জগতে এখন তুমি জড়। তোমার পূর্ব্বপুরুষ বাবরসাহ, হুমায়ুন সাহ প্রভৃতি এইরূপে অন্ধকারময় কবরে চিরনিদ্রিত। তুমিও একদিন

তাঁহাদিগের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ধন, ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতা সঙ্গে যাইবে না। আজি যে অসীম ক্ষমতাবলে সম্রাটের নিম্নেই আসন পাইয়াছ, এবং পরিণামে সম্রাটের আসনে উপবিষ্ট হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, তখন তাহার কিছুই থাকিবে না। তাই বলিতেছি, উপরে সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দিলে, তোমার বিশেষ অনিষ্ট হইবে। সাবধান সেলিমসাহা! সাবধান! মিথ্যা বলিতে চেষ্টা করিও না। তাহা হইলে তোমার অভীষ্টসিদ্ধ হইবে না এবং জিজ্ঞাস্য বিষয়ে প্রকৃত উত্তর পাইবে না।" এই প্রকার উপদেশ দিবার পরে, স্বামী পুনর্ব্বার সেলিমসাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—সাজাদা সেলিমসাহা! বল দেখি কতগুলি রমণীকে বলপূর্ব্বক অন্তঃপুরচারিণী করিয়াছ?

সেলিমসাহা—

আমি অনেকগুলি রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু বলপূর্ব্বক বা ইচ্ছারবিরুদ্ধে কাহাকেও অন্তঃপুরে গ্রহণ করি নাই। তাহাহইলে সের আফ্‌গানের পত্নী, এতদিনে আমার অঙ্কলক্ষ্মী হইতে পারিত। তাহার ইচ্ছা নাই দেখিয়া, আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াও বলপ্রকাশ করি নাই।

সর্ব্বানন্দস্বামী—

আচ্ছা, আগ্‌রা নগরীতে বেগম সংগ্রহ করিবার একটী দল আছে কি না? আর তাহারা নানা স্থান হইতে তোমাকে বেগম সংগ্রহ করিয়া দেয় কি না?

সেলিমসাহা—

আগ্‌রা নগরে ঐ প্রকার দল আছে কি না, আমি তাহা অবগত নহি। সম্ভবতঃ থাকিতে পারে। তবে দৌলতরাম প্রভৃতি মহাজন, অর্থলোভে আমাকে সুন্দরী রমণী আনিয়া দেয়।

সর্ব্বানন্দস্বামী—

অল্প দিবস হইল তারাসুন্দরী নাম্নী একটী বাঙ্গালী স্ত্রীলোক, তোমার আদেশমতে অপহৃতা হইয়াছিল কি না ?

সেলিম—

আমি কখন কাহাকে কোন রমণী আনিতে আদেশ করি নাই। উহারা সুন্দরী স্ত্রীলোক আনয়ন করিয়া আমাকে দেখায় ; মনোমত হইলে অর্থ দিয়া আমি গ্রহণ করি।

সর্ব্বানন্দ—

এই বাঙ্গালী স্ত্রীলোকটীকে তোমাকে দেখাইয়া ছিল কি ?

সেলিম—

না। তবে আমাকে সে স্ত্রীলোকের কথা বলিয়াছিল।

সর্ব্বানন্দ—

তুমি তাহাকে গ্রহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলে কি ?

সেলিমসাহা—

অবশ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু বলপ্রকাশ করিয়া, অথবা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে লইতে স্বীকৃত হই নাই।

সর্ব্বানন্দ—

সে তোমার ভাবী সিংহাসন লোভে প্রলোভিতা হইয়া, আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৌলতরামের নিকট আগমন করিয়াছিল কি না ?

সেলিম—

মিথ্যাকথা। অতি মিথ্যা। আমি কখন কোন রমণীকে আমার অন্তঃপুরচারিণী হইতে অস্বীকার করিতে দেখি নাই ; সকলেই সাগ্রহে আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। অস্বীকার করিয়াছে কেবল এই

বাঙ্গালী রমণী। শুধু অস্বীকার নহে ; ঘৃণার সহিত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে।

দৌলতরাম যদি ঐ প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া থাকে, তবে সে পাষণ্ডের কার্য্য করিয়াছে। আমার এ প্রকার আদেশ বা উপদেশ ছিল না।

সর্ব্বানন্দ—

শুন সমরেন্দ্র! সেলিমসাহার কথাগুলি শুন। সেলিমসাহার হৃদয় এখন কাচস্বচ্ছসুনির্ম্মল। এখন উঁহার কথায় একবিন্দুও মিথ্যার সংস্রব থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তুমি অমূলক সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া, গুণবতী সতীর অমূল্যজীবন নষ্ট করিতে বসিয়াছিলে। যাও, হৃদয় হইতে সন্দেহাগ্নি দূর করিয়া নির্ম্মল হৃদয়ে, সেই দেবীর নিকট গমন কর। তোমার মঙ্গল হইবে।

সাহজাদা সেলিমসাহা! নিদ্রা যাইতেছ কি ?

সেলিম—

আমার দশা কি করিয়াছেন ? আমি নিদ্রিতও নহি এবং জাগরিতও-নহি।

সর্ব্বানন্দ—

আচ্ছা, দুই একটী প্রশ্নের উত্তর দাও। তারপর তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধির কথা হইবে।

সেলিম—

বলুন। আমি প্রস্তুত আছি।

সর্ব্বানন্দ—

তোমার পিতার প্রিয়মিত্র এবং সভাসদ্ আবুলফাজলকে কে হত্যা করিয়াছে ?

সেলিম—

আমিই তাঁহার প্রাণনাশের মূল। তবে আমি নিজ হস্তে তাঁহাকে হত্যা করি নাই ; অনুগত লোকের দ্বারা করাইয়াছি।

সর্ব্বানন্দ—

তজ্জন্য কি অনুতাপ হইয়াছে ? না এখনও আনন্দ অনুভব করিতেছ ?

সেলিম—

সন্ন্যাসীঠাকুর! তাহার জন্য আমি যারপরনাই অনুতপ্ত ও দুঃখিত হইয়াছি। সে কথা মনে হইলে, আমাকে সহস্র বৃশ্চিকের জ্বালা ভোগ করিতে হয়। আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই, যে তিনি পিতার এতাদৃশ প্রিয়পাত্র ছিলেন। যখন দেখিলাম, পিতা তাঁহার জন্য তিনচারিমাস শয্যাগত হইলেন, তখন আমার অনুতাপের সীমা থাকিল না। সেই অবধি আমি বাদসাহের কোপনয়নে পতিত হইয়াছি। আর তাহার জন্যই আজি আমাকে আপনাদের নিকট আসিতে হইয়াছে।

সর্ব্বানন্দ—

সেলিমসাহা! তোমার হৃদয়ে যখন অনুতাপের অনল জ্বলিয়াছে, তখন তোমার দুর্ভাগ্য দূর হইয়াছে। আবুলফাজলের মৃত্যুর পর হইতে শত্রুপক্ষ সাহস পাইয়া, তোমার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে। তাহারা এখন তোমার ন্যায্য প্রাপ্য সিংহাসন অন্যকে দিবার চেষ্টা করিতেছে। সম্রাটের সমক্ষেও এ প্রস্তাব করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু আর ভয় নাই। তোমার সমস্ত বিপদ দূর হইয়াছে। পিতার হৃদয়ে পুত্রবাৎসল্য ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন কাহার সাধ্য তোমাকে বঞ্চনা করে ? একটী কথা বলিয়া দিতেছি এই যে, নিজ পুত্রের প্রাণরক্ষা করিও। সে, অন্যের হস্তের পুত্তলিকা মাত্র। তাহা হইতে তোমাকে অনেক ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে ; তত্রাচ বলিতেছি—পুত্র-

শোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করিও না। তোমার জীবদ্দশায় যখন তাহার প্রাণ-বিয়োগ হইবে, তখন অকারণ পুত্রহত্যা করিয়া, কেন পাতকের ভাগী হইবে। যাও তোমার অভীষ্টসিদ্ধ হইবে। স্বামিজীব সহিত এখন আর সাক্ষাৎ হইবে না।

সেলিমশাহা, সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সমরেন্দ্রনারায়ণ, সর্ব্বানন্দস্বামীব পদধূলী গ্রহণ করিয়া স্বামিজীর সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করিলেন। সর্ব্বানন্দস্বামী কহিলেন—তোমার অবারিত দ্বার। তখন সমরেন্দ্র, মহাত্মার চরণে প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

পরমানন্দস্বামী—

বাবা! তোমাব সন্দেহ দূর হইয়াছে?

সমরেন্দ্র—

দেব! সম্পূর্ণরূপে দূব হইয়াছে। দেবতা যাহার সহায়, তাহার মনে কি গ্লানি থাকিতে পারে? আজি দেবতার কৃপায় দুইটী প্রাণীর প্রাণরক্ষা হইল।

পরমানন্দস্বামী—

বৎস! তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ শুভ সময় উপস্থিত। দুইচারি দিবস মধ্যে, পার্থিব সুখের চরম উৎকর্ষ লাভকরিয়া তুমি সর্ব্বাংশে সুখী হইবে। আগ্‌রা হইতে চলিয়া যাইবার সময়, আর একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও; গুটিকতক উপদেশ দিব। আর প্রিয় শিষ্য রতিকান্তকে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে বলিবে। আমি এখন কিছু দিবস ঝুসিতে থাকিব।

সমরেন্দ্র, "গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য" বলিয়া, পুনর্ব্বার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পীড়ার পর।

তারাসুন্দরীর জ্বর বিকার আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। এখন পথ্য করিয়াছেন; শরীরে কিঞ্চিৎ বলাধানও হইয়াছে। কিন্তু সময়ে সময়ে মস্তিষ্কের ভাবান্তর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তারার বাল্য চাঞ্চল্য ফিরিয়া আসিয়াছে। সে চঞ্চলতা যখন আসে, তখন লজ্জার বাঁধন ছিঁড়িয়া যায়। গুরুজন আগমনেও সে চঞ্চলতার নিবৃত্তি হয় না। বহুদর্শী চিকিৎসক, হাকিমআলিসাহেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে। তারার মস্তিষ্কবিকারের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তবে এ বিকার, পূর্ণ উন্মাদের অবস্থা নহে। সময়ে সময়ে উত্তেজনার ভাব মাত্র। হাকিমআলির উপদেশ মতে মানসিক পীড়ার শান্তির ব্যবস্থা না করিলে, তারা প্রকৃত উন্মাদিনী হইয়া যাইত। বুদ্ধিমতী শশিমুখী বিজয়কুমারের সংবাদ দিয়া, তারার পীড়ার শান্তি করিয়াছেন। সেই অবধি সে ধরিয়া বসিয়াছে, বিজয়কুমারকে দেখিবে। এ যেন তাহার শিশুর আব্দার। ইহাতে লজ্জার কথা কি আছে, সে তাহা বুঝিতে পারে না। তারা বিদ্যাবতী; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার বিদ্যার পরিচয় কেহ পায় নাই। এইবার তাহার হৃদয় খুলিয়া গিয়াছে; যখন যাহা মনে আসিতেছে, বলিয়া যাইতেছে। কখন সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতেছে; কখন আপনা আপনি ভাষা রচনা করিতেছে; কখন গান গাহিতেছে। উত্তেজনার ভাব চলিয়া গেলে, আবার সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থা। তখন আর সে তরঙ্গ থাকে না, তখন তাহার

সেই ধীরা, স্থিরা, গম্ভীরা মূর্ত্তি দর্শন করিলে "কে বলিবে যে এ সেই তারা।"

উত্তেজনার সময় তারা গাহিতেছে—

খেলাবার সাথী মোর যৌবনের সখা।
শশী দিদি! দয়া করে একবার দেখা॥
করেছি বিরক্ত কত,
চঞ্চলতা শত শত,
এক দিন নাহি মুখে বিরক্তির রেখা।
পাব কি সে দেবতার একবার দেখা?
কতই যতন তাঁর,
পরিমাণ নাই তার,
সুমিষ্ট সম্ভাষ তাহে কত সুধামাখা॥
দিদিগো তাহার তরে শুধু প্রাণ রাখা।

তারা পুনর্ব্বার গাহিল—

দেখাও দেখাও দিদি সেই দেবতায়।
জীবন যৌবন প্রাণ সঁপিয়াছি যায়॥
যার জন্ম প্রাণ রাখা,
দেখাগো দেখাগো দেখা,
তারার জীবনপাখী উড়িয়ে পলায়।
শশী দিদি! দয়া কর, ধরি তব পায়॥
তুমিত রাখিলে প্রাণ,
দেখাইবে কথা দান,
করিয়ে এখন কেন ভুলাও আমায়।
দেখাও আনিয়ে মোর সই দেবতায়॥

তারা বড় চঞ্চলতা প্রকাশ করিতে লাগিল। শশিমুখী অনেক বুঝাইলেন। রায়মহাশয় আসিলেন; ভ্রুক্ষেপ নাই। কেবলই চঞ্চলতা।

বড় অশান্ত মেয়ে! ছি! অমন করিতে আছে কি? বলিয়া, হরসুন্দরী প্রবেশ করিলেন।

তারা একটু শান্ত হইল। আবার চঞ্চলতা। বলিল—মা! তিনি আসিতেছেন কি? কে? বিজয়? হাঁ মা! এখনি আসিবেন। তুমি একটু শান্ত হও; তবে তিনি আসিবেন। বলিয়া, হরসুন্দরী দেবী তারাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

তারা, একটু শান্ত হইয়া বলিল—মা! যদি তিনি আসেন, তবে আর আমি অশান্ত হইব না।

তারা, শান্ত হইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই পারিল না।

গাহিয়া উঠিল—

আসিবার আশে আর কতক্ষণ থাকিব।
অনন্ত আশার আশে আর নাহি ভুলিব॥
ছুটে যাব ফুটে রব,
আকাশের তারা হব,
এ ঘোর দুঃখের ভার আর নাহি বহিব।

শশিমুখী আসিয়া, আদর করিয়া, কহিলেন—ছি দিদি! গুরুজনের সম্মুখে অমন ধৃষ্টতা করিতে আছে কি?

তারা—

কল কল নাদে নদী সিন্ধু পানে ধায়।
পাহাড় পর্ব্বত বাঁধে বাধা নাহি পায়॥

আমিও চলেছি তথা,
প্রাণপতি আছে যথা,
বিজয় সাগর বিনা না দেখি উপায়।
দিওনা দিওনা বাধা ধরি তব পায়॥

হরসুন্দরী—

মা! শশি! বিজয়কুমারকে আনিতে লোক পাঠান হয়েছে কি? মেয়েটার যাতনা যে আর দেখা যায় না মা!

শশিমুখী—

মা! তিনি ঝুসি পাহাড়ে স্বামিজীর নিকট গমন করিয়াছেন। রাজা বিক্রমজিতের গৃহে লোক গিয়াছিল। তাঁহার ঝুসি গমন শ্রবণ করিয়া, তখনি দ্রুতগামী অশ্বারোহী সিপাহী ন্যায়মহাশয় পাঠাইয়াছেন। আমার বোধ হয় বিজয়কুমার আগত প্রায়।

তারা—

কেন প্রাণ আন্‌চান্‌ করেগো তারার।
আঁখির বিরাম নাই প্রবল ধারার॥
কেন নাহি সুখ পাই,
যে দিকে ফিরিয়ে চাই,
আঁধার—আঁধার ঘোর হেরি অনিবার।

বিজয়কুমার—

এই যে চরণে বাঁধা বিজয় তোমার।

তারা, একবার বিজয়কুমারের দিকে দৃষ্টিপাত করিল; আর দেখিতে পারিল না। নয়ন মুদ্রিত হইয়া আসিল। চীৎকার করিয়া তারাসুন্দরী মূর্চ্ছিতা হইল।

তারা! তারা! আমার হৃদয়-আকাশের পূর্ণশশী! আমার যাতনার, বেদনার একমাত্র জুড়াইবার স্থান! আমার সংসার সমুদ্রের একমাত্র তরণি! আমার সর্ব্বস্বধন তারা! তোমার এমন অবস্থা হইয়াছে! বলিয়া, বিজয় তারাকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যুগলমিলন।

তারাসুন্দরী এখন প্রকৃতিস্থা। আর পীড়ার কোন লক্ষণ নাই। তারা, আবার সেই ধীরা, স্থিরা। বিজয়কুমারকে পাইয়া গম্ভীরতা নাই। বিজয়কুমার দেশত্যাগ করিবার পর হইতে, তারার গম্ভীরতা আসিয়াছিল। বিজয়কুমারকে পাইয়া সে গম্ভীরতা চলিয়া গিয়াছে। তারার মুখে হাসি ফুটিয়াছে। বায়ুভরে আন্দোলিতশ্বেতশতদলের শোভা সে হাসিতে মাখান রহিয়াছে। গৃহশূন্য দুঃখদারিদ্রে-জর্জ্জরিত বিজয়কুমার যে, এ সুখ পাইবেন, ইহা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই।

বিজয়কুমার—

তারা! আর কখন তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। তুমি তখন উৎসাহ দিয়াছিলে বলিয়াইত, যাইতে পারিয়াছিলাম; নতুবা তোমাকে ছাড়িয়া সুরলোকের স্বর্গভোগেও আমার ইচ্ছা নাই।

তারা—

নাথ! তাই বলিয়া কি যুগ যুগান্তরের মত ভুলিয়া থাকিতে হয়? যদি জানিতাম যে, এত দীর্ঘদিনের জন্য ভুলিয়া থাকিবে, তাহা হইলে কখনই ছাড়িয়া দিতাম না।

বিজয়—

কি করি? সময় উপস্থিত না হইলে, যাইতে পারি না। বাঙ্গালাদেশের এক্ষণে কি অবস্থা, তোমার পিতার প্রতি পাঠানদিগের কি প্রকার ব্যবহার, তাহা সমস্ত অবগত হইয়াও অমন কথা কেন বলিতেছ? এই বলিয়া—বিজয়কুমার, দস্যুহস্তে পতন হইতে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা তারার নিকট বর্ণনা করিলেন। মুঞ্জামহারাজার ঘটনাবলীও বাদ রাখিলেন না। মুঞ্জা-মহারাজার কথায় তারা বড় আনন্দ পাইলেন। শেফালীকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিজয়কুমার দেখাইতে সম্মত হইলেন।

তারা—

নাথ! এসুখ কি স্থায়ী হইবে? কে যেন বলিতেছে—হতভাগিনী! তোমার এসুখ থাকিবে না। আবার কি কালমেঘে এ সুখচন্দ্রিমা ঢাকিয়া দিবে? নাথ! তুমি নিকটে থাকিলে আমি সকল ক্লেশ সহ্য করিতে পারি। আমি রাজ্য চাহিনা; অর্থ বা সম্পত্তি চাহিনা; কেবল তোমাকে চাহি। বিধাতা এ সুখেওকি আমাকে বঞ্চিতা করিবেন?

বিজয়কুমার—

তারা! আমাদের দুঃখের দিন অতীত হইয়াছে। আর দুঃখ আসিবে না। মহাপুরুষ পরমানন্দস্বামী প্রত্যাদেশ করিয়াছেন—অচিরে আমরা পরমসুখে সুখী হইব। মনুষ্যজন্মে সংসারে যে উচ্চ সুখ পাইবার সম্ভাবনা, তাহাই আমরা উপভোগ করিতে পারিব। সে সময়ও আগতপ্রায়।

তারা, মহাপুরুষের চরণে, উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিলেন—মহাপুরুষের বাক্য অব্যর্থ।

নবম পরিচ্ছেদ।

দরবার।

আগ্‌রা নগরীতে দরবার হইবে। দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালা জয়ের বন্দোবস্ত করাই এ দরবারের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সঙ্গে মুঞ্জা মহারাজাকে জায়গীর প্রদান ও একজন মনসব্‌দারের পদ ও সম্মান বৃদ্ধি করা হইবে। আর্ব্বলী পর্ব্বতের নিম্নভূমির অরণ্যমধ্যস্থ একদল বন্যজাতি প্রবল হইয়া যোধপুরের নিকটবর্ত্তী বাদসাহের অধিকৃত স্থানে অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। বাদসাহ তাহাদের দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া, মুঞ্জামহারাজকে তাহাদিগকে দমন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। মুঞ্জামহারাজা তাহাদের প্রতাপ সমূলে খর্ব্ব করিয়া, বাদসাহদরবারে সংবাদ প্রদান করেন। বাদসাহ তাহাতে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হন। সেই উপকারের প্রতিদান জন্য, মুঞ্জাকে এই জায়গীর দান; আর একজন মনসব্‌দারের প্রধান সেনাপতি অপেক্ষা সৌভাগ্য ঘটিবার সম্ভাবনা। গুজব এইরূপ যে, সামান্য মনসব্‌দার রাজাধিরাজ হইবে। বাদসাহের ভাবভঙ্গিতে এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সে ব্যক্তির নাম কেহ অবগত নহে। সকলেই উৎসুকনেত্রে ভাগ্যচক্রের এই অপূর্ব্ব লীলা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে দরবারগৃহ লোকে লোকারণ্য হইল। রাজপুতানার এবং অন্যান্য স্থানের রাজন্যবর্গ আগমন করিয়াছেন; আর আসিয়াছেন ভীলপতি মুঞ্জামহারাজ। সমরেন্দ্রনারায়ণ (বিজয়কুমার) এই দরবার সভায় উপস্থিত আছেন। আমরা এখন হইতে সমরেন্দ্রনারায়ণকে বিজয়-কুমার বলিয়াই অভিহিত করিব। ইনি এক্ষণে সুদ্ধ তারাসুন্দরী ও রায়-মহাশয়দিগের নিকট বিজয়কুমার নহেন। সম্রাট্‌দপ্তরে বিজয়কুমার নামে পরিচিত হইয়াছেন।

নকিব ফুকারিয়া উঠিল—

দিন দুনিয়ার মালিক সাহান্‌সাহার হুকুমমতে বাঙ্গালাজয়ের বন্দোবস্ত নিমিত্ত রাজা রতিকান্তরায়ের কর্তৃত্বে দেশীয় জনসাধারণের সংগৃহীত সৈন্য-দলের সেনাপতি বলিয়া, মনসব্‌দার বিজয়কুমার, ওরফে সমরেন্দ্রনারায়ণকে স্বীকার করা গেল। যুদ্ধের উপস্থিত খরচের কারণ, দেশীয় প্রতিনিধি রাজা রতিকান্তরায়ের হস্তে পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা দিবার হুকুম হইল। বিজয়কুমারের রাজভক্তির বিশেষত্ব অবগত হইয়া এবং তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও শৌর্য্যবীর্য্যের পুরস্কার স্বরূপ, তাঁহাকে বাঙ্গালাদেশের অন্তর্গত সদর জিলার সাদিপুর পরগণায়, পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা আয়ের জায়গীর প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে মহারাজা উপাধি প্রদত্ত হইল। মহারাজা বিজয়কুমার, ডংকা ও নাকাড়া ব্যবহার করিতে পারিবেন। বিজয়কুমার সামান্য অবস্থা হইতে মহারাজা হইলেন; অতএব তাঁহার আশু ব্যয়সংকুলান ও রাজসম্মান বজায় রাখিবার জন্য সরকার হইতে চল্লিশ হাজার টাকা তাঁহাকে প্রদান করা গেল। এই টাকা বাঙ্গালা যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে দেওয়া হইবে। উমাশঙ্কর রায়চৌধুরার যাবতীয় জমিদারী বিজয়কুমারকে দিবার হুকুম হইল। বিজয়কুমার, রাজা তোডর্ম্মল্ল এবং বিক্রমজিতের লোক বলিয়া, মানসিংহ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া, মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন—সামান্য ব্যক্তির

প্রতি সমুদ্রবৎ অনুগ্রহ! কথা বাদসাহের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তিনি কোন কথা না কহিয়া, নকিবের প্রতি কটাক্ষ করিলেন। নকিব, বাদসাহের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, জাঁহাপনার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। যখন যিনি বাঙ্গালার নবাব হইবেন, জাঁহাপনার পঞ্জা-স্বাক্ষরিত এই হুকুমনামা মান্য করিয়া চলিবেন; অন্যথা বিশেষরূপে দণ্ডিত হইবেন। মানসিংহ লজ্জায় অধোবদন হইলেন। বিজয়কুমার চিতোরযুদ্ধে সমরেন্দ্ররূপে সম্রাটের প্রাণরক্ষা করেন। সেই অসীম উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ যে, এই অসাধারণ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতেছেন, ইহা রাজা তোডর্ম্মল্ল এবং বিক্রমজিৎ প্রভৃতি সম্রাটের দুই একটী নিতান্ত বিশ্বস্ত অনুচর ভিন্ন আর কেহই অবগত নহে। সম্রাট্ গুপ্তাঘাত করিয়া জয়মল্লের প্রাণবধ করিতে গিয়া বিশেষ বিপন্ন হন, সে বিপদে নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইত। বিজয়কুমার সেই বিষম বিপদে আততায়ীর হস্ত হইতে সম্রাটের প্রাণরক্ষা করেন। বাদসাহ প্রকাশ্যভাবে তাঁহার গুণবত্তার ঘোষণা করিতে অপারক হইয়া, কৃতজ্ঞতার অনুরোধে বিজয়ের এই অসীম উন্নতি বিধান করিয়াছেন। সুতরাং জনসাধারণ বিজয়কুমারের এই অভাবনীয় উন্নতি দর্শনে চমৎকৃত হইল। মানসিংহ ইহার বিন্দু-বিসর্গও অবগত ছিলেন না; সেইজন্য তিনিও যারপরনাই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন—

নকিব আবার বলিতে লাগিল—

মহারাজা বিজয়কুমার, সাহান্‌সাহার অধীনে, জায়গীরদার ও জমীদার হইলেন; অতএব রাজভক্তি প্রদর্শন করিবেন ও সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী হইবেন। আবশ্যক হইলে স্বয়ং বা সৈন্যসামন্ত দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহের কার্য্যে, সরকারের সাহায্য করিবেন। ইহাতে তাঁহার যে ব্যয় হইবে, তাহা তাঁহাকে নিজ হইতে বহন করিতে হইবে। তবে প্রার্থনা করিলে বিজয়কুমার

বাঙ্গালার নবাবের নিকট একবৎসর মিয়াদে উদ্ধ সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা অগ্রিম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

রাজারতিকান্তরায় বিষয়কার্য্য হইতে অবসরগ্রহণে ইচ্ছুক হওয়ায়, তাঁহার জমিদারী তাঁহার জামাতা বীরেন্দ্রনারায়ণকে দেওয়া গেল। বীরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা উপাধিও প্রদান করা হইল; আর বর্ত্তমান যুদ্ধে বিজয়কুমারের অধীনে তাঁহার সহকারী সেনাপতিত্বপদ মঞ্জুর করা গেল। সকলে সমস্বরে "কেরামত, কেরামত" করিয়া উঠিল। কেহ কেহবা দিল্লীশ্বরহবা জগদীশ্বরহবা রবে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বিজয়কুমার কুর্ণিস করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন; এবং রুমাল দ্বারা দুইহস্ত আবদ্ধ করিয়া বাদসাহ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। বাদসাহ ঈষৎ হাস্য করিয়া একবার কটাক্ষ করিলেন। বিজয় পুনর্ব্বার সম্মুখ হইতে কুর্ণিস করিতে করিতে পশ্চাতে ফিরিয়া আসিলেন।

নকিব, আবার উঠিয়া বলিতে লাগিল—ভীলপতি মুঞ্জামহারাজা সাহান্‌সাহার বিশেষ সন্তোষসাধন করায়, দিনদুনিয়ার মালিক জাঁহাপনা তাঁহাকে যোধপুরের নিকটবর্ত্তী সরকারীভূমি, জায়গীরস্বরূপ প্রদান করিলেন।

ভীলরাজ, কুর্ণিস করিতে করিতে বাদসাহের নিকট উপস্থিত হইলেন। বাদসাহ পূর্ব্বোক্তরূপে ঈষৎ হাস্যের সহিত কটাক্ষ করিলে, মুঞ্জামহারাজ কুর্ণিস করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলেন। দরবার ভঙ্গ হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

—*—

উৎসব।

আজি মুঞ্জামহারাজার আগ্রার ভবনে নৃতগীত মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। তারাসুন্দরীর সহিত শেফালীর আলাপপরিচয় উদ্দেশ্য করিয়াই, এই মহোৎসবের আয়োজন। তারাসুন্দরীর শেফালী দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, বিজয়কুমার মুঞ্জামহারাজাকে সংবাদ দিয়াছিলেন। সেই সংবাদ অনুসারে মুঞ্জা, শেফালীকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছেন। মুঞ্জা অদ্যকার এই উৎসব উপলক্ষে, আগ্রায় অনেকগুলি লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। রাজা তোডর্ম্মল্ল, বিক্রমজিৎ, সুজনসিংহ, রতিকান্তরায়, হরসুন্দরী দেবী, শ্যামা, তারা, শশিমুখী এবং রায় মহাশয়ের পরিচারকবর্গ প্রায় সকলেই আগমন করিয়াছেন। হরসুন্দরীদেবী আসিতে পারেন নাই। আর আইসেন নাই মহারাজা মানসিংহ। মুঞ্জা দুঃখিত হইবেন বলিয়া, বিজয় বহু পূর্ব্ব হইতে আসিয়া কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন

ভীলরমণীগণ ফুলসাজে সজ্জিতা হইয়া স্বর্গের অপ্সরামূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ফুলের বলয়, ফুলের হারপ্রভৃতি ফুলের সমস্ত অলঙ্কারই তাহারা পরিধান করিয়াছে। কেহ কেহ ফুলের মুকুটও পরিয়াছে। মুকুট পরিধান করিয়াছে শেফালিকা এবং তাহার সখী বিজলী। আর মুকুট রক্ষিত হইয়াছে, শ্যামা ও তারার জন্য। শশিমুখীকে মুকুট পরিতে বলিলে, হাসিতে হাসিতে শশী সেস্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্যামা কিছুতেই মুকুট পরিতে স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তারা-সুন্দরীকে বলপূর্ব্বক মুকুট পরিধান করান হইয়াছে।

সর্ব্বালঙ্কারবিভূষিতা তারাসুন্দরী আজ অলঙ্কারের সহিত পুষ্প-মুকুট পরিধান করিয়া, অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছেন। শেফালী ও বিজলী নৃত্য করিবার জন্য তারা ও শ্যামাকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছে।

বাঙ্গালীর মেয়ে নৃত্য জানে না ; বরং দুই একটা গান গাহিতে পারে। স্ত্রীলোকের নৃত্যের প্রথা বাঙ্গলায় নাই ; রাজপুতনায় আছে ; হিন্দু-স্থানের অন্যান্য প্রদেশেও আছে। এইরূপ অনেক আপত্তি তারাসুন্দরী করিলেন। কিন্তু তাঁহার কথা শুনে কে ? শেফালী তারাকে পাইয়া অবধি কোথায় যে রাখিবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না।

সে কখন গলা জড়াইতেছে ; কখন বক্ষে টানিতেছে ; কখন পার্শ্বে বসাইতেছে। আদরের সীমা নাই। সে তারাকে কখন দিদি, কখন ভগ্নী, কখন সই—যখন যাহা মনে আসিতেছে, তাহাই বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। তারাকে পাইয়া তাহার বড়ই আনন্দ হইয়াছে। এমন সুখের সংমিলন, তাহার আর কখন হয় নাই। তাহার ইচ্ছা, সমস্ত রাত্রি নৃত্যগীতের আমোদে কাটাইয়া দেয়। শশিমুখী পলায়ন করিলেন ; শ্যামা নৃত্য করিতে স্বীকার করিলেন না। তারা কিছুতেই ছাড়াইতে পারিলেন না ; অর্থচ নৃত্য করিতেও জানেন না। তারা বড়ই সঙ্কটে পতিতা হইয়াছেন।

এইসময়ে শেফালী, মুঞ্জামাহারাজ ও বিজয়মহারাজকে ফুলসাজে সজ্জিত করিয়া লইয়া আসিল। উভয় মহারাজাকেই শেফালীর অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল। তারাকে নৃত্য করিতে হইবে শুনিয়া, বিজয়কুমার হাসিয়া আকুল হইলেন।

শেফালী বুঝিল তারা প্রকৃতই নৃত্য করিতে জানে না। তখন সে দুইখানি সিংহাসন আনিয়া, বিজয় এবং তারাকে পুষ্পমুকুটে শোভিত

করিয়া বসাইল এবং আপনারা সেই সিংহাসন বেষ্টন করিয়া নৃত্যগীত করিতে লাগিল।

মুঞ্জা কহিল—তবে আমি কি করিব? তারা বলিল, ইচ্ছা হয় আমাদের সঙ্গে নৃত্যগীতে যোগ দাও; নতুবা ঐ রাজা রাণীর পদতলে বসিয়া স্বর্গের শোভা দর্শন কর।

স্বর্গের শোভাই বটে! বিজয়ের আজ রাজবেশ। মুঞ্জার উৎসবে আসিতে হইবে বলিয়া, রাজাবিক্রমজিৎ আজি বিজয়কুমারকে নিজহস্তে রাজবেশে সজ্জিত করিয়াছেন। আর তারাব জন্য রাজরাণীর পরিচ্ছদ পাঠাইয়া দিয়াছেন। তারাসুন্দরীও সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিয়াছেন।

রাজা তোডর্মল্ল, বিজয় ও তারার বেশ দেখিয়া বড় প্রীতিলাভ করিলেন। বলিলেন—মানসিংহ আসিত ত বড়ই ভাল হইত। হিংসায় জ্বলিয়া মরিত, আর আমি হাসিতাম।

শেফালী সেই রাজারাণীর চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, আর গাহিতে লাগিল—

বামে শোভে তারারাণী, দক্ষিণে বিজয়।
দেখ্‌বি কেহ স্বর্গ শোভা আয়! আয়। আয়!॥

সারাৎসারা, পরাৎপরা,
তড়িৎ সুন্দরী তারা,
দেখ দেখ রাজারাণী ঐ শোভা পায়।
মুঞ্জা শেফালিকাভাসে আনন্দ ধারায়॥

রাজারাণী দেখ আসি,
মোরা বড় ভালবাসি,

কেবা নাহি বাসে ভাল, এ দৃশ্য দেখিতে হায়!
ভীল-রাজারাণী মত্ত অতুল শোভায়॥

আবার নাচিতে নাচিতে—

উঠ মুঞ্জা ধর ফুল রাজারাণী পায়।
সাজাইয়া দেহ, মনে খেদ নাহি রয়॥
আন ফুল আন ত্বরা,
সাজাও বিজয়, তারা,
ঢাল ফুল, দেহ ফুল যেথা যত রয়।
ফুলের পাহাড় করি সাজাও দোঁহায়॥

মুঞ্জা এবং শেফালী উভয়ে যেখানে যত ফুল ছিল আনিয়া, রাজদম্পতীকে ফুলময় করিয়া তুলিল।

তখন শেফালী আবার গাহিল—

বিজলী আরতি কর নাচিয়া নাচিয়া।
রাজারাণী দুইজনে বেড়িয়া বেড়িয়া॥
হবেনা এমন ভাগ্য,
কোথা পাব হেন যোগ্য,
কুসুম চন্দন দেহ অঞ্জলি পুরিয়া।
জ্বাল ধূপ, জ্বাল দীপ. যতন করিয়া॥

মুঞ্জা, সুমধুর বন ফল এবং নগর সুলভ বিবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্যে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বিদায় করিলেন। মুঞ্জা শেফালীর সরল ব্যবহার এবং ভীলগণের বিনয় ও শিষ্টাচারে সকলে মোহিত হইলেন। বিজয় এবং তারা ভিন্ন অপর ব্যক্তিগণ গৃহে গমন করি-

লেন। শেফালী কোন মতে তারাকে ছাড়িতে চাহে না। অগত্যা বিজয়কুমারকে মুঞ্জারভবনে থাকিতে হইল।

প্রাতঃকালে আবার বিদায়ের সময় উপস্থিত। শেফালী, তারাকে ছাড়িবেনা। অনেক সাধ্য-সাধ্যনায় বিদায় দিতে সম্মত হইল। তারা, রাজা বিক্রমজিৎপ্রদত্ত মণিময় অলঙ্কার এবং রাজরাণীর পরিচ্ছদের একটী পুটলী করিয়া শেফালীর নিকট গিয়া কহিলেন—সখি! আমাকে একটী ভিক্ষা দিতে হইবে। শেফালী হাসিয়াই আকুল। বন্য ভীলরমণী সুসভ্য রাজরাণীকে কি ভিক্ষা দিবে? তাহার আছেই বা কি? আর দিবেই বা কি? তারা কহিলেন—বল সখি! আমি যাহা চাহিব তাহা দিবে? আমার কথা রাখিবে? সরলা শেফালী চিরদিনই, স্বভাবের ক্রোড়ে পালিতা; সংসারীর চক্র সে কিছুই বুঝে না। কথা রাখিব বলিয়া, সত্যবদ্ধা হইল; সে যেমন বলিয়াছে কথা রাখিব, আর তারা সেই পুটলিটী তাহার হস্তে দিয়া কহিল—সই? ভাল বাসার চিহ্নস্বরূপ এই গুলি অঙ্গে ধারণ করিতে হইবে। ইহাতে আমার বড়ই সন্তোষ হইবে। সত্যবদ্ধা শেফালী, দ্বিরুক্তি না করিয়া আদরের সহিত সেইগুলি গ্রহণ করিল। বিজয় দেখিলেন, তারা চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া জিতিয়া গেল। তিনিও তাড়াতাড়ি রাজ-পরিচ্ছদ, মুক্তামালা, এবং উষ্ণীষশোভিত সমুজ্জ্বল হিরকমণি, মুঞ্জার সম্মুখে রাখিয়া কহিলেন—সখে! শেফালী তারার মান রাখিয়াছে। এই সামান্য দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিয়া আমার মান রাখ; নতুবা আমি অতিশয় দুঃখিত হইব। মুঞ্জা বিজয়কুমারের প্রদত্ত দ্রব্যগুলি সযত্নে গ্রহণ করিয়া কহিলেন—সখাদত্ত এই উপহার দিল্লীর বাদসাহপ্রদত্ত খেলাত অপেক্ষাও মুঞ্জার নিকট মূল্যবান্। সখে! মহাত্মন! প্রাণদাতা! মুঞ্জার আরাধ্য দেবতা! অধম মুঞ্জাকে মনে রাখিবে কি?

বিজয়কুমার কহিলেন, সখে! এজীবনে তোমার মত সখাকে ভুলিতে

পারিব না। উভয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। অবশেষে বিজয়কুমার কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্বারোহণ করিলেন। মুগ্ধা অশ্রুধারায় বক্ষঃ ভাসাইয়া দিল। তারারও সেই দশা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

বিজয়কুমার, রাজা বিক্রমজিতের গৃহে দশবৎসর কাল পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া আজি বিদায় লইতে আসিয়াছেন।

বিজয়কুমার—

পিতঃ! অকৃতজ্ঞ সমরেন্দ্র, স্বকার্য্য সাধন করিয়া আজ নিষ্ঠুর হইয়া বিদায় লইতে আসিয়াছে। তাঁহার দুই চক্ষুঃ হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুধারা পতিত হইতেছে।

বিক্রমজিৎ—

বৎস! সুখেব পর দুঃখ, আলোকের পর অন্ধকার চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। তুমি যদি অকৃতজ্ঞ অথবা নিষ্ঠুর হইতে, তাহাহইলে কখনই তোমার এই অভাবনীয় উন্নতি হইত না।

বিজয়কুমার—

পিতা! প্রতিপালক! আশ্রয়দাতা! সমরেন্দ্রের এ আশাতিরিক্ত

উন্নতির মূল কারণ কে? কাহার অনুগ্রহে এ সহায়সম্পত্তিহীন ব্রাহ্মণকুমারের আজ রাজ্যলাভ, যশোলাভ এবং সম্মানলাভ হইল? জানিনা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোন্ পুণ্যবলে এমন সদাশয় এবং করুণাময় দেবতার আশ্রয়লাভ করিয়াছিলাম। জানি না কোন্ সুকৃতিসঞ্চয়ে, শৈশবে পিতৃমাতৃস্নেহ বিচ্যুত হইয়াও পরম করুণার আধার অভিন্ন পিতা মাতা পাইয়াছিলাম।

বিক্রমজিৎ—

বাবা! তুমি আমাদের পুত্র। তোমাকে পুত্র ভাবিয়াই, যাহা কিছু করিতে হয় করিয়াছি। তাহাতে যে বিশেষ কিছু অলৌকিক বা আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছি, তাহা নহে। আমি তোমার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া, পুত্রস্থানীয় করিয়া তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছি। সে প্রতিপালনে যে কিছু স্বার্থ ছিল না তাহা নহে। যদি বল স্বার্থ কি? স্বার্থ আর কিছু নহে—পুত্রস্নেহ। লোকে পুত্রস্নেহে বাধ্য হইয়া যাহা করে, তাহাই করিয়াছি এবং তাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি। জগতে একমাত্র পুত্রের জন্যই লোকে নিজ স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে। আর কাহারও জন্য পারে না। বাবরসাহ নিজ পুত্র হুমায়ুনের প্রাণরক্ষার জন্য, নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সুখ পাইয়াছিলেন বলিয়া, ভারতের সাম্রাজ্য এবং তদুপরি প্রাণ দিয়াছিলেন। আমিও সেইরূপ নিজ সুখের জন্য, তোমার যাহা কিছু করিয়াছি। তবে তোমার সহিত এই পিতাপুত্র সম্বন্ধ, পূর্ব্বজন্মের কোন নিগূঢ় বন্ধনের ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ তুমি অতি যোগ্যপাত্র। বিদ্যাবুদ্ধি বিনয় প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত। তোমার উন্নতি হইবে না ত' হইবে কাহার? পরমহংস যাহার প্রতি কৃপাবান, সে কখন কি অযোগ্য বা অধার্ম্মিক হইতে পারে? আমি তোমারতুল্যপুত্রের পিতা হইয়া আপনাকে ধন্যবোধ করিয়াছি।

বিজয়কুমার—

দেব! আপনি নিজগুণে যাহাই বলুন, আমি আপনাদের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ। এ ঋণের পরিশোধ, ইহজীবনে করিতে পারিব না। আমি পুত্র হইয়া, কেবল নিজকার্য্য উদ্ধার করিয়া চলিলাম; পুত্রের কার্য্য কিছুমাত্র করিতে পারিলাম না। আমি যে ভক্তিভাবে পিতৃচরণে প্রণাম করিব, তাহাও পারিতেছি না।

বিক্রমজিৎ—

অমন কথা বলিতে নাই। তুমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়। পূর্ব্ব জন্মে তুমি আমার পুত্র ছিলে বলিয়া, বিশ্বাস করিলেও এজন্মে তুমি আমার প্রণম্য। ওরূপ কথা বলিলে আমাকে পাপস্পর্শ করিবে।

বিজয়কুমার—

আমি নামটী সম্বন্ধেও গোলযোগ করিয়া ফেলিয়াছি। তাহাতেও আমার সরলতা প্রকাশ হয় নাই।

বিক্রমজিৎ—

আমরা তোমাকে সমরেন্দ্র বলিয়াই জানি এবং সেই নামেই অভিহিত করিব। নাম সম্বন্ধে তোমার কোন প্রতারণা নাই। যোগীদত্ত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া স্বামিজীর অনুমতিক্রমে, আমিই তোমার সমরেন্দ্র নামকরণ করিয়াছি। ইহাতে তোমার দোষ কি? এক্ষণে যাও বৎস! অন্তঃপুরে যাও; তোমার মাতৃদেবীর নিকট বিদায় লইয়া আইস। সেও রাজপুতরমণী; সে নিশ্চয়ই আমার ন্যায় দৃঢ় হইয়া বিদায় দিতে পারিবে। পরে রাজা তোডর্ম্মল্লের নিকট বিদায় লইবে।

জননি! হতভাগ্য সন্তান বিদায় লইতে আসিয়াছে; বলিয়া, বিজয়কুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

বিক্রমগৃহিণী—

এস বাবা! এস। আমি সমস্তই অবগত হইয়াছি। মহারাজের নিকট বিদায় লইয়াছ কি?

বিজয়কুমার—

হ্যাঁ মা বাবার নিকট বিদায় হইয়াছি। মা! অযোগ্য সন্তান কেবল বিরক্ত করিয়াই চলিল। পুত্রের কার্য্য কিছুই করিল না।

বিক্রমগৃহিণী—

বাবা! পুত্র সুখী হইলেই পিতামাতার পরম সুখ। তমি ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া যারপরনাই উন্নতি করিয়াছ; ইহা অপেক্ষা আর আমাদের কি সুখ হইতে পারে? এইত পুত্রের কার্য্য করা হইল। আজ যদি তুমি নগণ্য জঘন্য এবং কদাচারী হইয়া দুর্দ্দশা ভোগ করিতে, তাহা হইলে আমাদের যাতনার শেষ থাকিত না।

বিজয়—

মা! আমার জননী নাই; কিন্তু তোমার অকৃত্রিম স্নেহ পাইয়া আমার সে দুঃখ ছিল না। এখন তোমার অনন্তস্নেহ বিচ্যুত হইয়া কেমন করিয়া থাকিব মা!।

মা! পথের কাঙ্গালকে কুড়াইয়া মানুষ করিয়াছ; সুধু মানুষ নয় মা! তাহাকে রাজরাজেশ্বর করিয়া দিয়াছ। আমি তাহার কি প্রতিদান করিলাম মা!

মা! কেমন করিয়া তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইব মা! আমি এক এক-বার মনে করিতেছি যে, আর সে দেশে যাইব না। বাদসাহ সৈন্যে গুণপণা দেখাইয়া, এইখানেই থাকিয়া যাই। তাহা হইলে আর মাতৃস্নেহ বিচ্যুত হইতে হয় না।

বিক্রমগৃহিণী—

ক্ষেপাছেলে! তাও কি হয়? তুমি বাঙ্গালা দেশের মাথা হইয়াছ। এমন পদ পসার ছাড়িয়া, সামান্য সৈনিক বৃত্তি করিবে? না বাবা! যাও। রাজ—ঐশ্বর্য্য ভোগ কর। আমি রাজমাতা হইয়া পরম সুখিনী হই। তা বাবা! ভাল কথা মনে হইয়াছে। আমার বহুদিন হইতে কাশী, গয়া এবং জগন্নাথজিউর স্থান দর্শন করিবার ইচ্ছা আছে। এক্ষণে তুমি বাঙ্গালাদেশের প্রধান হইলে; অতএব জগন্নাথধাম যাইবার পক্ষে বড়ই সুবিধা হইবে।

বিজয়—

মা! জগন্নাথক্ষেত্র যাইতে হইলে বাঙ্গলা যাইতে হইবে। বলুন সেই সময়ে একবার সন্তানের গৃহে গমন করিবেন?

বিক্রমগৃহিণী—

বাবা! আমি রাজপত্নী ছিলাম, রাজমাতা হইয়াছি। রাজমাতা হইয়া তোমার গৃহে কিছুদিন থাকিব, ইহাত আমার সৌভাগ্য।

বিজয়—

মস্তক অবনত করিয়া কহিলেন—মা। তাহাহইলে আমি বড় সুখী হইব।

বিক্রমজিৎগৃহিণী—

বাবা! জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি পুত্র, পৌত্রাদি লইয়া পরম সুখে রাজত্ব কর।

বিজয়—

আপনার আশীর্ব্বাদ আমার শিরোধার্য্য। আপনার ন্যায় দয়াময়ী মাতার আশীর্ব্বাদে পুত্রের নিশ্চয় মঙ্গল হইবে।

বিক্রমগৃহিণী—

বাবা সমরেন্দ্র! তোমার বউ দিদি তোমাকে প্রণাম করিতেছেন.।

বিজয়—

বউদিদি! আশীর্ব্বাদ করি, আপনার খোকা মহারাজাধিরাজ হইয়া, পিতৃপিতামহের নাম উজ্জল করুক। এই কথা বলিয়া, বিক্রমগৃহিণীকে কহিলেন—মা! সকলের নিকট বিদায় লইলাম; কিন্তু অবোধ খোকাকে কি করিয়া বুঝাইব? তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে যে, আমার বুকের হাড় ভাঙ্গিয়া যাইবে মা!

বিক্রমগৃহিণী—

আহা! খোকা তোমাভিন্ন জানে না। তাহাকে বুঝান বড় দায় হইবে।

বিজয়—

মা! আমার এখনও সন্তান হয় নাই; কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সন্তান বাৎসল্য যে কি, তাহা খোকাকে লইয়াই বুঝিয়াছি; আমি সকলকে বুঝাইলাম; কিন্তু খোকাকে কি করিয়া বুঝাইব?

বিক্রমবধূ—

ঠাকুরপো! তারাসুন্দরীকে আর একদিন আনিবে না? সেই একদিন মাত্র আসিয়াছিল।

বিজয়—

বউদিদি! তারা আপনাদের; আর এ বাড়ীও তারার। তাহাকে আনিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতেছেন কেন? তারাকে যখন ইচ্ছা হইবে আনিবেন।

এই বলিয়া, বাহিরবাটীতে যেখানে খোকা খেলা করিতেছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, বিজয়কুমার খোকাকে কোলে করিয়া চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন—বাবা! আমি কিছুদিনের জন্য বাড়ী যাইব। খোকা সে কথা বিশ্বাস করিল না। বলিল—তুল্ কাকামতায়! এইত তোল্

বালী ; তুই আবাল বালী যাইবি কি ? বিজয়কুমার সজল নয়নে খোকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

খোকা—

কাকামতায় ! তোল্ চথে জল কেন ? তুই কি কাঁদচিস্ ?

বিজয়—

হ্যাঁ বাবা ! আমি বাড়ী যাইব তাই কাঁদচি।

খোকা—

আবাল বলে বালী দাব। এইত তোল্ বালী।

এ তোল বালী, আমাল বালী, বাবাল বালী, দাদামতাল বালী। খুড়াভাইপোর এইরূপ অভিনয় হইতেছে, এমন সময়ে রাজা তোডর্ম্মল্ল বাটীর ভিতর হইতে সদরে আসিলেন। তিনি খোকাকে দেখিয়া কহিলেন— খোকা শালা কি কচ্ছিস্ ?

খোকা—

দাদামতায় ! কাকামতায় বড় বোকা ; বলে বালী দাব। এইত ওল বালী। আবাল বালী কোথায় ?

তোডর্ম্মল্ল—

হ্যাঁ দাদা ! তোমার কাকার আর একটী বাড়ী আছে। সেইখানে যাবেন। আবার এসে তোমাকে আদর কর্‌বেন, কোলে নেবেন। খোকা চারিবৎসরের শিশুমাত্র। এতক্ষণ কাকামশাইএর বাড়ী যাওয়া বুঝিতে পারে নাই। এইবার রাজা তোডর্ম্মল্লের কথায় বুঝিল যে, সত্য-সত্যই তাহার কাকামশাই আর একটী বাড়ীতে যাইবেন। তখন সে দৃঢ়ভাবে বিজয়কুমারের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—তা হবেনা। আমি যেতে দিব না।

"তোডর্ম্মল্ল—

তুমি ঘুমুলে যাবে।

খোকা—

আমিত ঘুমুব না। জেগে থাক্‌ব।

হ্যাঁ দাদামতায়! তুমি আমাকে দাঁতওয়ালাহাতী দিবে বলে থিলে তা দিলে না? বলিয়া—তোডর্ম্মল্লকে বিরক্ত করিতে লাগিল।

তোডর্ম্মল্ল—

দাঁতওয়ালাহাতী পাইনি দাদা! এবার পেলে আগে তোমাকে পাঠায়ে দিব।

খোকা—

না তোমাল মিথ্যে কথা। আজই দিতে হবে।

তোডর্ম্মল্ল—

আচ্ছা আজই দিব। তুই তোর দিদিকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারবি? তাহলে আজই দিব।

খোকা—

তা পাল্‌বো।

তোডর্ম্মল্ল—

আচ্ছা তবে তাকে ডেকে আন্।

খোকা তাহার দিদিকে ডাকিতে গেল।

বিজয়কুমার—

আমি মহারাজের নিকট বিদায় লইতে যাইতেছিলাম। বাবা ও মায়ের নিকট বিদায় লইয়াছি। খোকার নিকট বিদায় লইতেছিলাম।

তোডর্ম্মল্ল—

সমরেন্দ্র! তোমার এই উন্নতিতে আমরা যারপরনাই সুখী হইয়াছি। যদিও তোমাকে বিদায় দিতে ক্লেশ পাইতে হইবে, কিন্তু তোমার সুখ-সৌভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা সে কষ্টের শান্তি করিতে পারিব। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি ধর্ম্মপথে থাকিয়া এই সুখসমৃদ্ধি উপভোগ কর।

বিজয়—

মহারাজ! আমার যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা আপনাদের দ্বারা। আপনারা পথের ভিখারীকে ধরিয়া রাজপদ দিয়া দিলেন।

তোডর্ম্মল্ল—

সমরেন্দ্র! তুমি পথের ভিখারীই হও, আর যাহাই হও, সর্ব্বাংশে এই উচ্চপদের যোগ্যপাত্র। আমরা তোমার এই উন্নতির পৃষ্ঠপোষক বটে, কিন্তু মানসিংহ ভিন্ন, কে তোমার পৃষ্ঠপোষক নহে? সম্রাট্‌দরবারের প্রায় সকলেই তোমার উন্নতিতে সুখী। অসুখী কেবল মানসিংহ। বেচারা ঈর্ষায় দগ্ধ হইতেছে। তুমি আমাদের লোক বলিয়াই, উহার এত ঈর্ষা। আমি কিন্তু উহার দুর্দ্দশা দেখিয়া বড় আনন্দ পাইয়াছি। দুঃখের বিষয় এই যে, বোধ হয় মানসিংহ আবার বঙ্গের মসনদে উপবেশন করিতে যাইতেছে।

বিজয়—

বঙ্গাধিপ বিরূপ থাকিলে আমাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে।

তোডর্ম্মল্ল—

অসুবিধা কিসের? তুমি অবশ্য উহার পদোচিত সম্মান রাখিয়া চলিবে। কিন্তু জানিও যে মানসিংহ পদমর্য্যাদায় যত উচ্চ হউক না কেন,

সম্রাটের প্রিয় পাত্র নহে। মানসিংহ মনেমনে সম্রাটের বিদ্বেষী। সম্রাট্ও উঁহাকে সেই ভাবেই দেখিয়া থাকেন। সাহজাদা সেলিমসাহারও সেইরূপ ভাব। আর একটী কথা জানিও যে দরবারে দুইটী দল আছে। একটী মানসিংহের আর একটী আমাদের। আমরা রাজভক্ত এবং রাজহিতাকাঙ্ক্ষী; কিন্তু মানসিংহ তাহা নহে। উহার আন্তরিক চেষ্টা, বর্ত্তমান সম্রাটের জীবনান্ত হইলে, নিজভাগিনেয় সুলতান খস্রুকে বাদসাহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহাতে বাদসাহ কিম্বা সেলিমসাহা কি সন্তুষ্ট হইতে পারেন? যাহা হউক যদি কখন কোন বিপদ বা আশঙ্কার সূচনা দেখিতে পাও, তবে তৎক্ষণাৎ আমার নিকট সংবাদ দিবে; তোমার সমস্ত বিপদ নিরাকৃত করিয়া দিব। এক্ষণে বাঙ্গলা গমনে বিলম্ব না করিয়া, অচিরে সমস্ত আয়োজন কর। উপস্থিত বঙ্গবিজয়ে বাদসাহ সমভিব্যাহারে আমার যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। যদি যাওয়া হয়, তবে কার্য্য ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, তোমাকে অনেক বিষয় শিক্ষা ও উপদেশ দিব। এক্ষণে খোকা আসিতে না আসিতে পালায়ন করি; সে আসিলে আবার হাঙ্গামা করিবে। তোডর্ম্মল্ল পালায়ন করিলেন।

খোকা।

দাদামতাই! দিদি আস্তে চায় না। দাদামতাই পালিয়েছে বুঝি? দাদামতাই থালা বলোহুত্তু। বলিয়া—খোকা, বিজয়কুমারকে জড়াইয়া ধরিল। বিজয়কুমার খোকাকে কোলে করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে ভুলিবার পাত্র নহে। বিজয় যত আদর করেন, সে তত দৃঢ় বন্ধনে তাঁহার গলাধরিয়া বলে,—না কাকামতাই আমি তোমাকে থালিব না। আমি তোমালে থেলে থাক্‌তে পালবোনা। আমাল মন কেমন কল্‌বে। আহা এসংসারে শিশুর প্রেম কি অপূর্ব্ব পদার্থ! এ প্রেমে স্বার্থপরতা নাই; প্রতারণা নাই;

কুটিলতা নাই; আত্ম গোপন চেষ্টা নাই; কেবল সরলতা, কেবল কোমলতা। সে সৌজন্যের জন্য ভাল বাসে না; কর্ত্তব্যতার অনুরোধে ভাল বাসে না; সে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না বলিয়া, ভাল ভাসে। তাহার ভালবাসা দেখাইবার জন্য নহে; মোহ জালে আবদ্ধ করিবার জন্য নহে। সে সরল প্রাণে ভাল বসে। যাহাকে ভাল বাসে, শয়নে স্বপনে তাহাকে দেখিতে থাকে।, অদর্শনে কাতর হয়। বিজয় অনেক চেষ্টা করিলেন; কত নূতন খেলনা দিবার কথা বলিলেন; হাতী ঘোড়ার প্রলোভন দেখাইলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। রাজা বিক্রমজিৎ বুঝাইলেন; তাঁহার পত্নী বুঝাইলেন। কিছুতেই শিশু বিজয়ের কোল ছাড়িল না। খোকার মাতা লইতে আসিলেন। সে চিৎকার করিয়া উঠিল। এতক্ষণে বুঝিল, যে ইহারা তাহার ভালবাসার কাকা-মতাইকে বলপূর্ব্বক পৃথক করিবার চেষ্টা করিতেছে। তখন সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিজয়কুমার বলিলেন—আমি এখন কিছুতেই যাইতে পারিব না। আমার বাঙ্গলা যাওয়া হউক, আর না হউক, খোকাকে কাঁদাইয়া কিছুতেই যাইতে পারিব না। খোকা কাকামতাইয়ের কোলে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল। সকলে মনে করিল, এইবার বিজয়কুমার যাইতে পারিবেন। কিন্তু যেমন বিজয়কুমার উঠিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আর অমনি খোকা কাকামতাইগো, যেওনাগো বলিয়া—কাঁদিয়া উঠিল। বিজয়কুমার আবার বসিলেন। ক্রোড়ে ঘুমন্ত শিশু। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া, শিশু প্রগাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইল। তখন খোকার জননী আসিয়া তাহাকে লইয়া গেলেন। বিজয় চক্ষুর জল মুচিতে মুচিতে উঠিলেন। সকলের নিকট হৃষ্টচিত্তে বিদায় লইয়াছেন। কিন্তু খোকার নিকট বিপরীত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মহাত্মার উপদেশ।

বাজা বতিকান্তবায় আগ্‌বাব কার্য্য শেষ কবিয়া, বাঙ্গালা গমনেব উদ্যোগী হইলেন। বাদসাহদববাব হইতে তাঁহার ও বিজয় মহারাজার জন্য নব্বই সহস্র নগদ মুদ্রা আসিল। ইতিমধ্যে বায়মহাশয আব একবাব রাজা তোডম্মল্ল ও বিক্রমজিতেব সহিত সাক্ষাৎ কবিযা লইলেন। বিজয়-কুমাবও বন্ধুবান্ধবদিগেব নিকট বিদাযগ্রহণ করিলেন। মুঞ্জামহাবাজা ও সুজনসিংহেব নিকট বিদায় লইতে বড় ক্লেশ পাইলেন। সবল স্বভাব মুঞ্জা বালকেব ন্যায় বোদন কবিতে লাগিলেন। সুজনসিংহও চক্ষুঃজলে বক্ষঃ ভাসাইয়া দিলেন। বিজয়কুমাব নানাপ্রকাব প্রবোধবাক্যে মুঞ্জাকে সান্ত্বনা করিলেন।

সুজনকে কহিলেন—ভাই! তোমাব সহিত আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি শীঘ্রই তোমাকে বাঙ্গালার প্রধান সেনাপতিব সহকাবীরূপে দেখিবার আশা করিতেছি। রাজা তোডর্ম্মল্ল আমাকে উক্ত আশা পূর্ণ হইবাব সম্ভাবনাব কথা বলিয়াছেন।

সুজনসিংহ ও মুঞ্জা মহারাজাকে বিদায় দিয়া, বিজয়কুমাব বায়মাশয়েব সহিত মিলিত হইলেন। এবাবে স্থলপথে গমনই স্থিবীকৃত হইল। মৃজানকি ও বেজবাহাদুব মোনাযেম খাঁব সহকারীরূপে প্রেবিত হইলেন। সঙ্গে বিংশতিসহস্র মোগল ও রাজপুতসৈন্য চলিল। অবশিষ্ট সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজাতোডর্ম্মল্লেব সহিত বাদসাহ স্বয়ং গমন কবিবেন, এইমত বন্দোবস্ত যইল।

বিজয়কুমার সৈনিক বেশে সজ্জিত হইলেন। বাদসাহদত্ত জাল কিরীচ, কোমরবন্ধ এবং উষ্ণীষ ধারণ করিয়া, আজ তাঁহার অপূর্ব্ববেশ। সেই বেশে একবার তারার নিকট যাইবার ইচ্ছা হইল। তারাসুন্দরী, দেখিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন—"তথাপি মমসর্ব্বস্ব রাম কমল লোচন"। বিজয় তারার নিকট পরাজিত হইয়া, শ্যামা যেখানে আছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। শ্যামা, অপরিচিত সৈনিক পুরুষ দেখিয়া ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল। শ্যামার চিৎকারে শশীমুখী আসিয়া জালকিরীচ বাঁধা সৈনিক পুরুষকে দেখিয়া কহিলেন—মহাশয়! আমাদের মহারাজাবিজয়কুমারবাহাদুর অপরিচিত পুরুষকে বাটীর মধ্যে দেখিলে, অনর্থ করিবেন, অতএব আপনি শীঘ্র পলায়ন করুন। বিজয় কুমার লজ্জিত হইয়া কহিলেন—শশী দিদি! আর শ্লেষের প্রয়োজন নাই। আমি এখনি যাইতেছি। দেখিতে দেখিতে শিবিকা ও শকটে প্রাঙ্গনভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সর্ব্বাগ্রে একদল অশ্বারোহী ও কয়েকদল পদাতি সেনা, মধ্যভাগে স্ত্রীলোকদিগের শিবিকা; তৎপরে টাকার গাড়ি এবং রায়মহাশয়ের শিবিকা চলিল। সর্ব্বাগ্রে বিজয়কুমার ও বেজবাহাদুর অশ্বারোহণে যাইতে লাগিলেন। নকিখাঁ সকলের পশ্চাতে রহিলেন। প্রয়াগধামে উপস্থিত হইলে, রায়মহাশয়ের আদেশে, শিবির সন্নিবেশিত হইল। রায়মহাশয়, বিজয়কুমার, হরসুন্দরী প্রভৃতি সকলেই স্বামীদর্শনে পদব্রজে গমন করিয়া, ঝুসিতে উপস্থিত হইলেন।

স্বামীজি সকলকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন—সকলে উপবেশন কর, আমি গুটিকতক কথা বলিব। তাঁহারা স্বামীজির চরণরেণু গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিলেন।

স্বামী—

বৎস রতিকান্ত! এইবার তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। কামনা

অপূর্ণ বা অর্দ্ধপূর্ণ থাকিলে, তপস্যার পথে গমন করা বিড়ম্বনা। যে ব্যক্তি সেরূপ করে, সে দুইদিক্। নষ্ট করে। তাহার না হয় তপস্যা, না হয় সংসার।

দেহেন্দ্রিয়েষু নিয়তাঃ কর্ম্মগুণাঃ কুর্ব্বতে স্বভোগার্থং।
নাহং কর্ত্তা নমমেতি জ্ঞানতঃ কর্ম্মনৈব বধ্নাতি॥
মণিরত্নমালা॥

জীব কর্ম্মফলানুসারে, দেহধারণ করিয়া সেই কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করে। আমি কর্ত্তা নহি এবং কোন বস্তু আমার নহে, এইরূপ জ্ঞান হইলে, জীব আর কর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ হয় না।

অন্য শরীরেণ কৃতং কর্ম্ম ভবেৎ যেন দেহ উৎপন্নঃ।
তদবশ্যং ভোক্তব্যং ভোগাদেব ক্ষয়োঽস্য নির্দ্দিষ্টঃ॥
মণিরত্নমালা॥

কর্ম্ম করিলেই ভোগ করিবার নিমিত্ত আবার শরীর ধারণ করিতে হয়। কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে, আর শরীর ধারণ করিতে হয় না; অর্থাৎ আর জন্ম হয় না।

না ভূক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্মং কল্পকোটীশতৈরপি।
শ্রুতি॥

ভোগ না হইলে শতকোটী কল্পেও কর্ম্মের ক্ষয় হয় না।

অপূর্ণ বাসনার দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জীব বারবার ক্লেশ ভোগ করে।

তোমার বাসনা সম্পূর্ণ নিজস্বার্থ জড়িত না হইলেও যখন উহাতে আত্মপ্রসাদ ও আত্ম চরিতার্থতার সংশ্রব আছে, তখন উহা নিতান্ত নিরাপদ নহে। বৎস! বাসনা যে প্রকারই উহক উহা হয় দমন, না

হয় ভোগ করিতে হইবে। ভোগের অপেক্ষা সহজ উপায় আর নাই। শাস্ত্রেরমতে কর্ম্মের ভাল মন্দ নাই। স্বর্গ ও নরক উভয়ই সমানরূপে ঘৃণিত।

পুণ্যকর্ম্মনি বৈ স্বর্গং নরকং পাপ কর্ম্মণি।
কর্ম্মবন্ধময়ী সৃষ্টির্নান্যথা ভবতি ধ্রুবম্॥
শিবসংহিতা॥

পুণ্য কর্ম্ম করিলে স্বর্গ আর পাপ করিলে নরক ভোগ হয়। মহাত্মা-দিগের মতে উভয়ই দুঃখের কারণ অর্থাৎ উভয় কর্ম্মফলেই আবার শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ॥
সাংখ্যকারিকা॥

সাংখ্যমতেও ঐরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম করিলে স্বর্গ নরকে গমন হয়। অর্থাৎ উহাদের কিছুই ভাল নহে। কেবল জ্ঞানই মোক্ষের হেতু। অজ্ঞানতা থাকিলে বন্ধন হয় অর্থাৎ পুনঃপুন জন্ম মরণ দশা ভোগ করিতে হয়।

সাংখ্য আরও বলিয়াছেন যে —

কিং পুনরীদৃশেন তত্ত্ব সাক্ষাৎ কারেণ সিধ্যত্যতীত আহ।

পুরুষ কর্ম্মশূন্য যখন হইবে; এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে ধর্ম্মাধর্ম্ম সপ্তরূপ পরিশূন্য প্রকৃতিকে উদাসীন ভাবে যখন দর্শন করিবে; তখন তাহার জন্ম মরণ নিবৃত্তি হইবে। অর্থাৎ আর জন্মাদি হইবে না।

পাতঞ্জলদর্শনকার বলিতেছেন যে—

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষ বীজক্ষয়ে কৈবল্যম্।
পাতঞ্জলদর্শনম্॥

যখন বৈরাগ্যহেতু বিবেক জ্ঞানেও বিরক্তি হয় তখন মুক্তি হয়।

বৎস! আমার সংসারী শিষ্যবর্গের মধ্যে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছ। অতএব তোমার অধঃপতন হইবে, ইহা আমি কি করিয়া দেখিব? যাহা হউক আর বৃথা কালহরণ না করিয়া শীঘ্রই সংসার হইতে বিদায়গ্রহণ কর। তবে আমার আদেশে আর একটী কর্ম্ম তোমাকে করিতে হইবে। তোমাদের সৌভাগ্যফলে, সে সুযোগ উপস্থিত হইতেছে। অতি ত্বরায় গৌড়নগরে মহামারি উপস্থিত হইবে। তাহাতে গৌড় চিরদিনের মত ধ্বংস হইয়া যাইবে। অসংখ্য মনুষ্য এই দুর্নিবার মহামারিতে প্রাণত্যাগ করিবে। এই দুরন্ত সংক্রামক পীড়ায়, জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া ভগবানের সন্তোষ সাধন কর। হরসুন্দরী, শশী, এবং আমার সন্ন্যাসীশিষ্যদলের অনেকেই তোমার সাহায্যকারী হইবে। বিজয়, বীরেন্দ্র, প্রভৃতি সংসারী শিষ্যগণও এই সময়ে বহুপুণ্য অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

মা হরসুন্দরী! তোমাকে আর কি বলিব? স্ত্রীলোক হইয়া তুমি যে উন্নতি করিয়াছ, অনেক জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষেও তাহা করিতে পারে না। তুমি সংসারে থাকিয়া, বাসনা জয় করিয়াছ। সাংসারিক দুঃখ দারিদ্র্যে তোমাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। তুমি স্বামীপুত্রের নিরুদ্দেশে অভিভূতা হও নাই; কন্যা অপহৃতা হইলেও কাতরা হও নাই। তোমার কার্য্য শেষ হইয়াছে।

অনেন বিধিনা সর্ব্বাংস্ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ শনৈঃ শনৈঃ।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেব্যবতিষ্ঠতে॥

মনুসংহিতা॥

দারাপুত্রাদি সকল বিষয়হইতে ক্রমে ক্রমে মমতা পরিত্যাগ করিয়া ও মানাপমানাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া, ব্রহ্মে অবস্থান করিবে। গৌড়ভূমির

উপস্থিত কার্য্য শেষ করিয়া আমার নিকট আসিলে, সমাধির উপযুক্ত স্থান হিমালয়ের নির্জ্জন গুহা দেখাইয়া দিব এবং যে প্রকারে সমাধি করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধেও বিশেষ উপদেশ দান করিব।

অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।

পাতঞ্জল দর্শনম্।

উভয়দিকে প্রবাহবিশিষ্ট চিত্তনদী, যাহাতে প্রবাহশূন্য হয়, এই প্রকারে নিরোধ করিতে হইবে। অর্থাৎ বারম্বার অনুষ্ঠান করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে; এবং বৈরাগ্যের আশ্রয় লইয়া চিত্তবৃত্তিকে দমন করিলে সমাধি শিক্ষা হইবে।

বৎসে শশিমুখি! তুমি নির্লিপ্ত শতদলপত্র। তোমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। তোমার যোগ, যাগ, তপস্যা আর কিছুই নাই। আমি আজন্মসন্ন্যাসী হইয়া যাহা করিতে পারি নাই; তুমি বালিকা বয়সেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছ। তোমার মত ভাগ্যবতী আর কে আছে? পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে আজি তুমি মুক্ত।

তুমি যাহা কর তাহাই শোভা পায়। সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, লইয়া যথেচ্ছ ক্রীড়া করিবার শক্তি তোমার হইয়াছে।

অশ্নন যদ্বা তদ্বা সংবীতোয়েন কেনচিচ্ছান্তঃ।
যত্র ক্বচন চ শায়ী বিমুচ্যতে সর্ব্বভূতাত্মা॥

মণিরত্নমালা।

আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। শয়ন ভোজনাদিতে তাঁহার কোন বিধি নিষেধ নাই।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ যিনি কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া আসক্তিশূন্য চিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না।

রাগ দ্বেষবিনির্ম্মুক্তঃ সম লোষ্ট্রাশ্ম কাঞ্চনঃ।
মুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী, ত্যক্ত সংসারবাসনঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ।

যাঁহার রাগ দ্বেষ নাই, যাঁহার প্রস্তর ও সুবর্ণে সমান জ্ঞান, যাঁহার সংসার বাসনা নাই, তিনিই মুক্ত।

পাপের অগ্নি, সুখের উল্লাস, দুঃখের দংশন, তোমার নিকট মাথা তুলিতে পারে না। তোমার মাটি, খাঁটীতে প্রভেদ জ্ঞান নাই; কাচ কাঞ্চনে বিভেদ নাই; লৌহ সুবর্ণে ইতরবিশেষ নাই; তোমাকে আর উপদেশ দিবার কিছুই নাই। তুমি অবিদ্যারূপিণী মায়াশক্তিকে জয় করিয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের জ্বলন্ত উদাহরণস্বরূপা হইয়াছ। কামনা বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া আত্মারাম হইয়া বিচরণ করিতেছ। তোমার এখন বসুধৈব কুটুম্বকং।

বৎস বিজয়কুমার! তোমার কার্য্য অনেক। তুমি এই সংসারক্ষেত্রে সংসার পদ, মান, ঐশ্বর্য্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছ; যশঃ গৌরব এবং পাণ্ডিত্যে প্রধান হইয়াছ; বিনয়, শিষ্টাচার ও সৌজন্যে অদ্বিতীয় হইয়াছ; দেখিও জ্ঞান, ভক্তি এবং ধর্ম্মচর্চ্চায় যেন খর্ব্ব না হও।

নোপকারাৎ পরোধর্ম্ম স্বদেশস্য বিশেষতঃ।

মনে করিয়া আত্মীয়, স্বজন, প্রজা এবং দেশের লোকের উপকার করিবে। পরে ঐ উপচিকীর্ষা বৃত্তি বর্দ্ধিত করিয়া, বসুধৈব কুটুম্বকং করিয়া কর্ম্মজীবনের শেষাঞ্জলি প্রদান করিবে।

বৎস! তপস্বীজীবন অপেক্ষা গৃহীজীবন নিকৃষ্ট মনে করিও না। গৃহী যদি সংসারসমুদ্রের প্রলোভন তরঙ্গমালা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া,

কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তবে সে শীঘ্রই ভগবানের চরণারবিন্দ লাভ করিতে পারে।

মৌনাদ্ধি স মুনির্ভবতি নারণ্যবসনান্মুনিঃ।
অক্ষরং তত্তু যো বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥

সনৎসুজাতীয় ভাষ্যম্।

অরণ্যে বাস করিলে মুনি হয় না। মুনিলক্ষণের সম্পূর্ণতা থাকিলে অর্থাৎ আত্মদর্শন যিনি লাভ করিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি।

স্ত্রীপুত্রের সন্তোষসাধন করিতে হইবে; বন্ধুবান্ধবের তুষ্টিবিধান করিতে হইবে; দীন দরিদ্রের উপকার করিতে হইবে; অথচ কাহারও মায়ায় আবদ্ধ হইবে না। কর্ত্তব্য বলিয়া কার্য্য করিয়া যাইবে। এরূপ গৃহী, বাসনার আকর্ষণ ভয়ে ভীত হইয়া দূর, সুদূরে পলায়নকারী সন্ন্যাসী হইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। তাই বলিতেছি, ভগবানের কার্য্য করিতেছি মনে করিয়া, স্বার্থ এবং বাসনা বর্জ্জন পূর্ব্বক সংসারের কার্য্য করিয়া যাইবে। এইরূপে বাসনা ও স্বার্থ বিরহিত হইয়া যদি কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফেল, তাহাতেও পাপস্পর্শ হইবে না। তবে সেরূপ স্থলে বিশেষ উন্নতির অপেক্ষা করে।

কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে, নিজ বিবেকবুদ্ধিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে। বিবেক যাহা বলিবে তাহাই করিবে।

তারকং সর্ব্ব বিষয়ং সর্ব্বথা বিচারমক্রমং চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্।

বিবেক হইতে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাদ্বারা সর্ব্ব বিষয় বুঝিতে পারা যায়।

এই বিবেকশক্তির একবার অবমাননা করিলে, আর তাহার সাহায্য পাইবে না। তখন পদে পদে বিবেকবিহীন কার্য্য করিয়া, তুমি পাপসাগরে ডুবিয়া যাইবে। উপস্থিতপ্রায় গৌড়ের মহামারীতে জ্ঞান, বুদ্ধি এবং অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে।

বৎসে শ্যামা ও তারা! তোমাদিগকে দুইটী কথায় উপদেশ দিব ভগবানে মতি রাখিবে এবং স্বামীভক্তি করিবে। উমাকান্ত, কৃতকার্য্যের অনুশোচনায় এখন অনুতপ্ত। তিনি তাহাই করিতে থাকুন। তাঁহার আর কোন কার্য্য নাই। ইহাতে তাঁহার বর্ত্তমানে সুখ এবং পরিণামে উন্নতি। উমাকান্তের সহধর্ম্মিণী শৈলজাসুন্দরী নিতান্ত সরলা। তাঁহার জ্ঞানকাণ্ডে কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। অতএব তাঁহার পক্ষে যাগযজ্ঞ ব্রতনিয়মাদি কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন। ইহাতে তাঁহার বুদ্ধি মার্জ্জিত এবং ভক্তি প্রবলা হইবে। পরিণামে সেই প্রবলা ভক্তি, গভীর জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পথ দেখাইয়া দিবে।

দায়ুদখাঁর কন্যা সিরাজুকে তোমরা সম্মান ও যত্ন করিবে। যবনী বলিয়া ঘৃণা করিও না। তিনি মানবীরূপিণী দেবী। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তিনি শাপভ্রষ্টা। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া জগৎ চমৎকৃত হইবে। যাও, তোমরা নির্ব্বিঘ্নে বাঙ্গালা দেশে চলিয়া যাও। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

সকলে সাষ্টাঙ্গে স্বামীচরণে লুণ্ঠিত হইয়া, বাঙ্গালা গমনে অগ্রসর হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মোগল পতাকাতলে।

সম্রাট্‌প্রেরিত সৈন্যসামন্ত এবং সরঞ্জামসহ রাজারতিকান্তরায় রাজমহলে উপস্থিত হইয়া, শিবির সন্নিবেশ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। বীরেন্দ্রনারায়ণও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্রাট্‌ প্রদত্ত উপাধি ভূষিত হইয়া তিনিও এখন রাজা। রায় মহাশয়ের প্রতি এই অভিযানের কর্ত্তৃত্ব ভার ন্যস্ত থাকিলেও তিনি সম্রাট্‌ নিযুক্ত সুযোগ্য এবং সুদক্ষ সেনাপতি বিজয় মহারাজকে, সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন; সেইজন্য প্রধান প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারীদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। বীরেন্দ্রও এই সমবেত সৈনিক মণ্ডলীমধ্যে উপস্থিত আছেন।

রতিকান্ত—

বৎস বিজয়কুমার! উপস্থিত অভিযান সম্বন্ধে তোমাদের অভিমত পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমরা অদ্য সমবেত হইয়াছি। আমি মনে করিয়া ছিলাম, সেনাপতি মোনায়েমখাঁর সহিত সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা টাণ্ডা অবরোধ করিয়া দায়ুদখাঁকে ধৃত করিতে পারিব। কিন্তু শুনিতেছি দায়ুদ পাটনা নগরে দুর্গদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতেছে। আর মোনায়েমখাঁও পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এদিকে বাদসাহও রাজা তোডর্ম্মল্ল প্রভৃতির সহিত জল পথে বাঙ্গালা আগমন করিতেছেন। আমার মতে সম্রাটের আগমনের পূর্ব্বেই—তোমাদের কিছু সমর নৈপুণ্য প্রদর্শন করা উচিত। মোনায়েমখাঁ উপস্থিত নাই; সম্রাট্‌ এখনও বহুদূরে আছেন; এসময়ে যাহা কিছু করিতে পারিবে তাহাতে তোমার ও

তোমার সহকারী বর্গেরই সুযশঃ বিস্তৃত হইবে। এক্ষণে তোমার ও তোমার সহকারীবর্গ বীরেন্দ্র প্রভৃতির অভিমত জ্ঞাত হইবার ইচ্ছাকরি।

বিজয়কুমার—

মহারাজ! আপনার অভিজ্ঞতা অতুলনীয়। উপস্থিতক্ষেত্রে আপনার উপদেশ সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া টাণ্ডা আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করি।

বেঙ্গবাহাদুর এবং নকিখাঁ—

সম্রাটের আগমন অপেক্ষা করিলে ভাল হয় না ?

বীরেন্দ্র—

মহারাজ! কাপুরুষ দায়ুদখাঁ বেগমপুরীর (পাটনা) দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ; তাহার যুদ্ধ করিবার ক্ষমতামাত্র নাই। কিন্তু তাহার সৈন্যসামন্ত অকর্ম্মণ্য বা অসার নহে। পাঠানগণ—দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যুদ্ধ করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছে। দায়ুদের কর্ম্মঠ এবং সুদক্ষ সেনা-পতির অধিকাংশই টাণ্ডা নগরীতে অবস্থান করিতেছে। আর কতকগুলি তেরিয়াগলির দুর্গম পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে। শত্রু পক্ষকে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিতে না দেওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য। বাদসাহবাহাদুরের আগমন প্রতীক্ষায় যাঁহারা অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, করিতে পারেন। কিন্তু আমার ইচ্ছা আমি আমার নিজ সৈন্য লইয়া, টাণ্ডা আক্রমণ করি। আর বিজয়মহারাজের ও যখন সম্মতি আছে, তখন তাঁহাকেও তেরিয়া গলির গিরিসঙ্কটে অবস্থিত পাঠান সর্দ্দারগণকে আক্রমণ করিতে উপদেশ প্রদান করা হউক। দায়ুদখাঁকে সহস্তে নির্যাতন করা আমার আন্তরিক ইচ্ছা। ভগবান্ কি আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন ? বলিয়া, বীরেন্দ্রনারায়ণ রাজার আদেশ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

রতিকান্ত—

বৎস! বীরত্ব প্রকাশে বাধা দিতে ইচ্ছা করি না। তোমার যাহা অভিরুচি হয়, করিতে পার।

বীরেন্দ্র আনন্দমনে টাণ্ডা গমনে প্রস্তুত হইবাব জন্য গমন করিলেন।

বিজয়—

অনুমতি হইলে আমিও গিরিসঙ্কটে গমন করি।

রতিকান্ত—

বৎস! খ্যাতি প্রতিপত্তিব প্রকৃত সুযোগ পবিত্যাগ না করিয়া, এই বিপদসঙ্কুল কার্য্যে অগ্রসব হইতেছ দেখিয়া, আমি যাবপরনাই আনন্দলাভ কবিলাম। আশীর্ব্বাদ করি যুদ্ধ জয় করিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন কর।

এক্ষণে একটী প্রার্থনা এই যে, বৃদ্ধকে আর কার্য্যে ব্যাপৃত না রাখিয়া বিদায় দাও। তুমি ধন, মান, জ্ঞানে শ্রেষ্ঠতা লাভ কবিয়াছ; শৌর্য্য, বীর্য্য এবং পবাক্রমে পবাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছ; অতএব আমি তোমাব প্রতি সমস্ত ভাব অর্পণ করিয়া নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান করিতে ইচ্ছা কবিতেছি। স্বামিজীর আদেশ অনুসারে আরও কিছুদিন এ প্রদেশে থাকিতে হইবে। আর কর্ম্ম কবিবার ইচ্ছা নাই। আমার কর্ম্ম এক প্রকার সাঙ্গ হইয়াছে। স্বদেশের মায়ায় এতদিন কর্ম্মশূন্য হইতে পারি নাই। সে কার্য্য যথাসাধ্য এক প্রকার সম্পন্ন করিয়াছি। এক্ষণে তোমার এবং বীরেন্দ্র প্রভৃতি সুযোগ্য সন্তানের প্রতি, দেশের ভার সমর্পণ করিয়া, ভগবানের চরণ সাধনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

বিজয়—

মহাত্মন্! আপনাকে উপদেশ দেওয়া, কিম্বা আপনার আদেশের প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তবে উপস্থিতক্ষেত্রে আমার

এই নিবেদন যে, আমি ও বীরেন্দ্র স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিলে, অবশিষ্ট সৈন্যসামন্তগণ কাহার নেতৃত্বে এখানে অবস্থিতি করিবে? সেনা এবং সামরিক কর্ম্মচারীগণ স্বভাবতঃই দুর্দ্দান্ত ও দুরন্ত হইয়া থাকে। উপযুক্ত অধিনায়কের অধীনে না থাকিলে তাহারা ঘোর অত্যাচার করিবে।

তখন নকী খাঁ ও বেজবাহাদুর প্রভৃতি উঠিয়া কহিলেন—রাজা! যদি বিজয়মহারাজা ও বীরেন্দ্ররাজা, যুদ্ধকার্য্যে গমন করেন, তবে আমরা নিষ্কর্ম্মা বসিয়া কি করিব? আমাদিগকেও বিভাগ করিয়া, উভয়ের সমভিব্যাহারে প্রেরণ করুন।

বীরেন্দ্র—

আমি কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করি না। আমি নিজ সৈন্য লইয়া একাকী গমন করিব।

রতিকান্ত—

বীরেন্দ্র! তোমার সৈন্যসম্প্রদায়ের অধিকাংশই নূতন শিক্ষিত, অতএব আমারমতে বাদসাহের সুশিক্ষিত এবং সুদক্ষ সৈন্যসেনাপতির সাহায্য লওয়া তোমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

বীরেন্দ্র, মস্তক অবনত করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন রায় মহাশয়, সেই সামরিক সৈন্যসেনাপতিবর্গকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, দুইজনের সমভিব্যাহারী করিয়া দিয়া, হরসুন্দরী, শ্যামা, তারা এবং জীবন ও গৌরীকে লইয়া নিজালয়ে গমন করিলেন। বিজয়, গিরিসংকটে এবং বীরেন্দ্র টাণ্ডায় প্রস্থান করিলেন।

টাণ্ডা অবরুদ্ধ হইয়াছে। পাঠানসর্দ্দারগণ প্রাণান্ত পণ করিয়া, রাজধানী রক্ষা করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছে। বীরেন্দ্রেরও বিরাম নাই। তিনিও নিজজীবন পণ করিয়া টাণ্ডাগ্রহণে অগ্রসর। চিরশত্রু দায়ুদের রাজধানী গ্রহণ করিতে না পারিলে তাঁহার মনের শান্তি নাই। তাঁহার শ্রান্তি নাই;

ক্লান্তি নাই; জীবনের আশঙ্কা নাই। যেখানে বিপদের সম্ভাবনা, সেই খানেই বীরেন্দ্র; যেখানে পরাজয়ের আশঙ্কা, সেইখানেই বীরেন্দ্রের অভয়বাণী। সৈন্যগণ বীরেন্দ্রের এই অভয় এবং উৎসাহবাক্যে উত্তেজিত হইয়া উল্লাসের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। কিন্তু বীরেন্দ্রের ন্যায় অসাধারণ এবং উৎসাহশীল নেতা তাহাদের নাই। তত্রাচ বিলাসী পাঠান, বিলাসলালসা পরিবর্জ্জন করিয়া একমাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছে; আর পারিল না; যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। নগর বীরেন্দ্রের হস্তে পতিত হইল। বীরেন্দ্রের সচ্চরিত্রতার এবং নিরপেক্ষতার প্রসিদ্ধি আছে; তত্রাপি বিজয়ীসৈন্যের এই জয়োল্লাস সহসা দমন করা কঠিন হইল। সৈন্যগণ নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যাচার করিতে লাগিল। আক্রান্ত নগর বিজিত হইলে সামরিকবিধি অনুসারে সৈন্যগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য লুণ্ঠন করিতে পারে। সেই নিমিত্ত বীরেন্দ্রনারায়ণ তাহাদের নগর প্রবেশে বাধা প্রদান করিলেন না। হিন্দু সৈন্যগণ লুণ্ঠন করিয়া প্রত্যাবৃত হইল; কিন্তু মুসলমান সৈনিকেরা অমানুষ অত্যাচার আরম্ভ করিল। দুর্ব্বৃত্ত হিন্দু সৈনিকও যে ইহাদের সহিত যোগ না দিয়াছিল এমন নহে। নবাবপুরীতে রোদনের রোল উঠিল। সিরাজুবেগম, এই অত্যাচারের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া বীরেন্দ্রের শিবিরে বিশ্বস্ত অনুচর প্রেরণ করিলেন।

বীরেন্দ্র, বিশ্রাম করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে, নবাবনন্দিনীর পত্রিকা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বীরবেশে সজ্জিত হইয়া, সহকারীবর্গ সমভিব্যাহারে উন্মত্তের ন্যায় নগরে গমন করিলেন। লুণ্ঠনের নিবৃত্তি হইল; অত্যাচার দূরীভূত হইল। তিনি স্তুতি, বিনতি করিয়া, পুরস্কার এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া, অত্যাচারগ্রস্তদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। ঘোষণা করিয়া দিলেন—যেকেহ নগরবাসীর প্রতি সামান্যমাত্র অত্যাচার

করিবে, সে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। সৈন্যগণ, সন্ত্রস্ত এবং চকিত হইয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল।

এইবার বীরেন্দ্রনারায়ণ, নবাবপুত্রীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দর্শন-ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। সিরাজু অবিলম্বে দর্শন দিলেন। কহিলেন— রাজা! আপনার কৃপায় অত্যাচার হইতে নগরবাসী রক্ষা পাইয়াছে। তজ্জন্য আপনাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি। এক্ষণে আমার প্রতি কি অনুমতি?

বীরেন্দ্র—

নবাবনন্দিনি! কর্ত্তব্যতার অনুরোধে যুদ্ধ করিয়াছি এবং নগর গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমি কৃতঘ্ন নহি; আমি আপনার কৃত উপকারের কণামাত্রও এজীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না। এক্ষণে আমার অনুরোধ এই যে, আপনি আর এ শত্রুপুরীতে অবস্থান না করিয়া অন্য কোন নিরাপদ স্থানে গমন করুন। আপনি আপনার ধনসম্পত্তি, দাসদাসী এবং অনুচর প্রভৃতি যাহা কিছু সমভিব্যাহারে লইতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাই লইতে পারিবেন; আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত না হইবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার আদিষ্ট রক্ষীসৈন্য আপনার সঙ্গে থাকিবে।

সিরাজু—

মহাশয়! আপনি অতি মহান্ এবং অতি উচ্চ। আজি শত্রুকন্যার প্রতি এই অসাধারণ উদারতা প্রদর্শন করিয়া, জগতে আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। আমাকে পাটনায় পিতৃশিবিরে পাঠাইয়া দিলে চির-উপকৃত হইব।

বীরেন্দ্র তাহাই হইবে, বলিয়া—সিরাজুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দায়ুদখাঁর সহিত যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। মোনায়েমখাঁ, রাজা তোডর্ম্মল্ল এবং সম্রাট্ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এই যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছেন। এ প্রকার যুদ্ধ আক্‌বরসাহার শাসনে চিতোর আক্রমণ ভিন্ন অন্য কোন স্থানে হয় নাই। বিজয়কুমার এবং বীরেন্দ্রনারায়ণ যারপরনাই পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। দায়ুদখাঁ কটকে পলায়ন করিলেও পাঠানগণ প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু বিজয় ও বীরেন্দ্রের প্রতাপে মস্তক অবনত করিয়া প্রভুর পথাবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। দায়ুদ উপায়ান্তর না দেখিয়া, কেবল মাত্র উড়িষ্যা গ্রহণ করিয়া সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

সম্রাট্, সৈন্যসেনাপতিদিগকে যথোপযুক্ত পুরস্কৃত করিলেন এবং বিজয়ও বীরেন্দ্রকে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি বীরেন্দ্রের টাণ্ডা গ্রহণ এবং বিজয়ের তেরিয়াগিরিসংকটের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে কহিলেন—এরূপ বীরপুরুষ আমার সৈন্যে আছে জানিলে, আমি ক্লেশস্বীকার করিয়া বাঙ্গালায় আসিতাম না। তিনি রায়মহাশয়ের অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু সাক্ষাৎ পাইলেন না। পরিশেষে মোনায়েমখাঁর হস্তে শাসনভার সমর্পণপূর্ব্বক আগ্‌রা প্রত্যাগমন করিলেন। বিজয়তারা এবং শ্যামা বীরেন্দ্র স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশে রাজারাণী রূপে বিরাজিত হইয়াছেন। রতিকান্তরায় স্বামিজীর আদেশপালন জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সুশীলার সংসার।

গৌড়ের অনতিদূরবর্ত্তী উপনগরে সুশীলার ক্ষুদ্রভবন শোভা পাইতেছে। শিল্পীর কারুকার্য্য নাই; বিলাসিতার নাম গন্ধ নাই; ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ নাই; অথচ পরম শোভায় শোভিত হইয়া এই ক্ষুদ্র ভবন রমণীয় সৌন্দর্য্যবিস্তার করিতেছে। সে সৌন্দর্য্য কি? গৃহিণীর দয়া, মায়া, সৌজন্য এবং অসাধারণ পতিভক্তি; আর আদর্শ গৃহিণীপণা।

গৃহিণী সুশীলাসুন্দরীর পরিশ্রম ও যত্নে কেশবলালের মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহগুলি যেন হাস্য করিতেছে। পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন উঠান, চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে মেঝে এবং সেইরূপ সদরবাটীর বসিবার একখানি ক্ষুদ্র ঘর ইত্যাদি যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই সুশীলাসুন্দরীর গৃহিণীপণা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। দেওয়ালের কোন স্থানে একটী ছিদ্র নাই, কোথাও একটু অপরিষ্কারের চিহ্ন মাত্র নাই; বাস্তর বহুদূরবর্ত্তী স্থানেও একটু আবর্জ্জনা নাই।

কেশবলাল, নবাববাটীর পারসীদপ্তরে মহাফেজের কর্ম্ম করিয়া সামান্য বেতন পান; কিন্তু যাহা পান গৃহিণীর গুণে তাহাই তাঁহার যথেষ্ট। তাঁহার পত্নী, স্বামীর উপার্জ্জিত সেই সামান্য অর্থ হইতে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া বাটীর সীমার মধ্যে আট দশ বিঘা ভূমির চাষ করিয়া থাকেন। সেই চাষের ফসল হইতে তাঁহাদের একপ্রকার সংসার নির্ব্বাহ হয়। কেশবলাল প্রাতঃকালে উঠিয়াই নবাববাটী গমন করেন। তাঁহার প্রত্যাগমনে দ্বিতীয়প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া যায়। বাটীতে আসিয়া স্নানাহার এবং

বিশ্রাম করিয়া আবার গমন করেন; আসিতে রাত্রি হয়। সুতরাং চাষের কার্য্য দেখিবার অবসর তাঁহার হয় না। তিনি দেখুন আর নাই দেখুন, কার্য্য অবাধে এবং সুশৃঙ্খলে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার মজুরেরা মণিবের অনুপস্থিতির জন্য কার্য্যে কোনপ্রকার অবহেলা বা ঔদাস্য করে না। তাহারা তাহাদের নিজের কার্য্যেরন্যায় যত্ন, চেষ্টা এবং পরিশ্রম করিয়া কেশবলালের কার্য্য সমাধা করে। ইহার কারণ সুশীলার দয়া, মায়া এবং সৌজন্য।

সুশীলা, বাৎসল্যস্নেহে তাহাদের অভাব অভিযোগের আব্‌দার শুনিয়া থাকেন; মুখের দিকে চাহিয়া আহারাদির ব্যবস্থা করেন। কেহ কোন দায়ে পড়িলে, "মার কাছে যাই" বলিয়া—দৌড়িয়া সুশীলার নিকট আইসে। কাহারও অর্থদায় হইলে অলঙ্কার বন্ধক দিয়াও সুশীলা তাহার দায় উদ্ধার করেন; আর উপদেশ ও পরিশ্রমের ত কথাই নাই। প্রাণ-পণে পরিশ্রম করিয়াও সুশীলা পরের উপকার করিয়া থাকেন। শুদ্ধ মজুরেরা কেন, গ্রামের সকল লোকই সুশীলার অনুগত। সকালে, বিকালে সুশীলার বাটীতে ছোট ছোট ছেলে মেয়ের হাট বসিয়া থাকে। সুশীলা কাহারও পীড়ার ঔষধির ব্যবস্থা করিতেছেন; কাহারও শিক্ষার বিধান করিতেছেন; কাহাকে বা উপদেশ দিতেছেন। সেই সময়ে মুড়ি, মুড়্‌কি ও নাড়ু দিয়া সকলকে তুষ্ট করিয়া থাকেন। তাহারা সেই সকল খাদ্য, খাইতে খাইতে পরমানন্দে বাটী গমন করে। কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর কেহই সুশীলার দ্বারে আসিয়া রিক্তহস্তে ফিরিয়া যায় না। তিনি তাহা-দিগকে কিছু না কিছু দিয়া বিদায় করিয়া থাকেন। গ্রামের সকলেই সুশীলাকে 'মা ঠাকুরাণী' বা 'সুশীলামাতা' বলিয়া থাকে।

সুশীলা, একদিন সুখের মুখ দেখিয়াছিলেন। দাস, দাসী, যান, বাহন প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্য্যে লালিতা হইয়া একদিন সমাজের শীর্ষস্থানে উপবিষ্ট

ছিলেন। তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না; সম্ভ্রমের সীমা ছিল না। কোন বিশেষ ঘটনায় সে সকল হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে; তাই এই নির্জ্জন বাস; তাই এই কঠোর পরিশ্রম; অদ্যম উৎসাহে পতি পত্নীর এই সংসারলীলা। এই দম্পতীযুগলকে দেখিয়া কে বলিবে যে, ইহারা একদিন রাজ—ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিত হইয়া সমাজের শীর্ষস্থানে বিরাজ করিয়াছিল। পূর্ব্বের ঐশ্বর্য্য স্মরণ করিয়া, সুশীলার মুহূর্ত্তের জন্য মনের বিকার নাই; বরং এই নিঃস্ব অবস্থায় অবাধে পতিসেবা করিতে পাইয়া তাঁহার অপার আনন্দ।

বেলা দেড়প্রহরের সময় নবাব-দরবারের কাছারী বন্ধ হইল। কেশবলাল, সত্বরতার সহিত মহাফেজখানার কাগজপত্র গুছাইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পথ নিতান্ত অল্প নহে; নগর ছাড়িয়া উপনগরে আগমন করিতে হইবে। হস্তী, অশ্ব, শিবিকা ইত্যাদি যান বাহনে গমন করিতেও একদিন যাঁহার ক্লেশের সীমা থাকিত না, আজ তাঁহাকে এই প্রখর রৌদ্রে ক্রোশাধিক পথ অতিক্রম করিতে হইতেছে।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীতপ্রায়। সূর্য্যদেব প্রচণ্ড খরকিরণে পৃথিবী দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলেই শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং জড়বৎ। ঘোর কোলাহলময়ী লক্ষ্মণাবতীও ক্রমশঃ নীরব, নিস্তব্ধ এবং শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। কেশবলাল ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চরণ আর চলিতে চাহিতেছে না। নবনীনিন্দিত কেশবলালের সুকোমলদেহ আর কত কষ্ট সহ্য করিবে? কাছারীর পরিশ্রম, তদুপরি এই সুদারুণ পথক্লেশ, আবার তাহার সঙ্গে গ্রীষ্মের অসহ্য যাতনা। কেশবলালের নয়নে একবিন্দু অশ্রু; আর এক বিন্দু; তৃতীয় বিন্দু পড়িতে না পড়িতে ধারার সৃষ্টি

হইল। ধারা বিগলিত হইয়া কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বক্ষেঃ পতিত হইল। ছি! কেশবলাল! কি করিলে? সে অলোকসামান্য সহিষ্ণুতা পরিত্যাগ করিলে? সুশীলা দেখিয়া কি বলিবে? সেই লোকললাম অনিন্দ্যসুন্দরী সুশীলা যে, তোমারই মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, অবস্থাবিপর্য্যয়ের অশেষকষ্ট এবং নিদারুণ দারিদ্রদশার দুর্ব্বহ যাতনা সহ্য করিতেছে। তুমি কাতব হইলে চলিবে কেন? তোমার কাতরতা দেখিলে, সে রমণীসুলভ কোমল হৃদয় যে, কাতরতার একশেষ প্রদর্শন করিবে। একবার আদর্শপুরুষ শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের কথা স্মরণ কর। তোমার সামান্য অর্থ, সামান্য ঐশ্বর্য্য। তিনি, রাজাধিরাজ হইতে গিয়া বনবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং নির্ব্বিকারে বনবাসের সে কষ্ট সহ্য করিয়া সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সে তুলনায় তোমার ক্লেশ কিছুই নহে বলিলেই হয়। জগদীশ্বর কৃপা করিয়া তোমাকে দেবীরূপিণী সহধর্ম্মিণী প্রদান করিয়াছেন। সে দেবীর সহিত তুমি যে স্থানে অবস্থিতি করিবে, সেই স্থানেই নন্দনকাননেব অনুপম সুখ প্রাপ্ত হইবে। যাও? সাধ্যাসতীর পতিসেবা লাভ করিলে, নিদাঘতপ্ত ক্লিষ্ট দেহ সুশীতল হইবে।

কেশবলাল উত্তরীয় বসনে অশ্রুমোচন. করিয়া, দ্রুতপদে গৃহে গমন করিতে লাগিলেন। অদূরেই বাসভবন দৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু পরিশ্রান্ত নিদাঘার্ত্ত কেশবলালের পক্ষে সেই অদূরবর্ত্তীভবন এখনও যেন বহুদূরবর্ত্তী বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে বাটীর নিকট আগমন করিলেন। দেখিলেন— সুশীলা, যূথবিরহিতা কুররীর ন্যায়, চঞ্চলনেত্রে পথপানে চাহিয়া আছেন। অন্যদিন স্বামীর আগমনে এত বিলম্ব হয় না; দুই প্রহরের বহু পূর্ব্বেই তাঁহার দর্শন পান। আজ এমন হইল কেন? সুশীলার চিন্তার শেষ নাই।

কেশবলাল গৃহে প্রবেশ করিলেন। সুশীলার আনন্দ ধরেনা; ত্বরিতপদে সদরবাটী হইতেই স্বামীর উত্তরীয় বসন এবং আতপত্র গ্রহণ করিয়া অলিন্দে বসাইয়া বীজন করিতে লাগিলেন। সম্মুখে ক্ষুদ্র শিশু "বাবা বাবা" বলিয়া ক্রোড়ে উঠিল। কেশবলালের নিদাঘজ্বালা জুড়াইয়াছে; শ্রান্ত, ক্লান্ত, পিপাসার্ত্ত কেশবলালের সকল যাতনা নিবারিত হইয়াছে। তিনি শিশুর সুকোমলকপোলে পারম্বার চুম্বন করিতেছেন, আর স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছেন।

কেশব কহিলেন—শীলা! আর বাতাস দিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যে রত্ন আমাকে প্রদান করিয়াছ, তাহার স্পর্শে সকল দুঃখ নিবারিত হয়।

সুশীলা, মৃদুহাস্য করিয়া বীজন করিতে করিতে কহিলেন—আজ এত বিলম্ব হইল কেন? আমি বড় ভাবিত হইয়াছিলাম; আর খোকা যেন হাপুগেলা হয়ে কাঁদতে লাগলো। সে প্রত্যহ তোমার আসিবার সময়ে আমার আঁচল ধরে টানাটানি করে; বাহিরে আসিতে চাহে। আজিও সেইমত করিতে লাগিল। কিন্তু তোমাকে দেখিতে না পেয়ে অনবরত কাঁদিয়াছে। সে উঃ করিয়া হাত দিয়া দেখায়, আর কাঁদে। তাহাকে শান্ত করিতে আমাকে বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছে। যাহাহউক এখন স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া, আহার কর; তাহার পরে বিলম্বের কারণ শ্রবণ করিব। বলিয়া—সুশীলা, স্বামীরঅঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তৈলমর্দ্দন শেষ হইলে, সুবাসিত জল আনিয়া স্নান করাইয়া দিলেন। কেশব, পুষ্করিণীতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; কিন্তু সুশীলা কিছুতেই যাইতে দিলেন না। অনন্যোপায়কেশবলাল, সুশীলার কার্য্যে বাধা দিতে পারিলেন না। স্নানের পরে আহ্নিক সমাধা করিতে কেশবলালের অনেকসময় অতিবাহিত হইল। কেশবলাল

নবাবসরকারে কার্য্য করিয়া এবং যবন সংসর্গে মিশামিশি করিয়া. আর্য্য-ভাব বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার আচার, ব্যবহার, ক্রিয়াকাণ্ড সকলই অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই আহ্নিক কার্য্যে এত বিলম্ব। খোকা স্থিরভাবে বাবার আহ্নিক দেখিতেছে, কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না; কিন্তু কেশব আহারে বসিবামাত্র সে উঁ উঁ করিয়া নিকটে আসিল। সুশীলা, রন্ধন-শালা হইতে একটী ক্ষুদ্রপাত্রে শিশুর জন্য খাদ্য আনিয়া তাহাকে খাওয়াইতে বসিলেন। শিশু কিছুতেই খাইবে না; চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কেশবলাল নিজের খাদ্য হইতে কিছু লইয়া মুখে দিতে গেলেন; সে বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল এবং উঁ উঁ করিয়া তাঁহার ক্রোড়দেশ দেখাইতে লাগিল। দেড় বৎসরের শিশুর বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হইয়াছে; কিন্তু কথা বলিবার ক্ষমতা হয় নাই। পিতা বুঝিলেন শিশু কোলে বসিয়া খাইতে চায়। তাহাই করিলেন; শিশুর আনন্দ দেখে কে?

ভোজন সমাপ্ত হইলে, কেশবলাল শয়ন করিয়া, বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সুশীলা তাম্বূল প্রদান করিয়া, পতির পদসেবা করিতে লাগিলেন। শিশু, আবার বায়না ধরিল। সুশীলা, তাহাকে ঘুম পাড়াই-বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; সে তাহাতে রাজি নহে। সে বাবার বক্ষেঃ নিদ্রা যাইবে; বারম্বার হাত দিয়া বাবাকে দেখাইতে লাগিল। কেশবলাল শিশুকে বক্ষেঃ লইলেন। শিশু ঘুমাইল। সুশীলা তখনও পদসেবা করিতে-ছেন, আর এক একবার স্বামীর ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে-ছেন। কেশবলাল পুনঃপুনঃ আহার করিতে অনুরোধ করিতেছেন; কিন্তু সুশীলা "যাই যাই" করিয়া যাইতেছেন না। স্বামীর নিদ্রাকর্ষণ না হইলে তাঁহার যাইবার ইচ্ছা নাই।

কেশব—

সুশীলা! তোমার সেবায় যারপরনাই সুখী হইয়াছি বটে, কিন্তু

যেরূপ আত্মবঞ্চনা এবং ত্যাগস্বীকার করিয়া তুমি আমার সেবা করিতেছ, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমার সে সুখ ঘোর দুঃখে পরিণত হইতেছে। আমি একদিনের জন্যও তোমায় সুখিনী করিতে পারি নাই; অথচ আমার জন্য তুমি জীবনান্ত করিতেছ।

সুশীলা—

স্বামিন্! দেব! সুশীলার সর্ব্বস্বধন! দাসী, কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছে মাত্র; ইহার জন্য প্রশংসা, অপ্রশংসা তাহার কিছুই নাই।

কেশব—

সুশীলা! তুমি এই নরাধমের জন্য যেপ্রকার অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিতেছ, ইহার অর্দ্ধেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া ভগবানের সেবা করিলে তিনি এতদিনে প্রসন্ন হইতেন। মানুষের জন্য এত কেন?

সুশীলা—

দেব! আমিত ভগবানেরই সেবা করিতেছি। আমি কর্ত্তব্য বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া, ভগবান্ জ্ঞানেই স্বামীসেবা করিতেছি। স্বামীকে ভগবান্ জ্ঞান না করিলে আমার স্বামীসেবা অসম্পূর্ণ হইত। আমি তোমার শ্রীচরণে এই ভিক্ষা চাই—যেন আমার স্বামী ও ভগবানে ভেদবুদ্ধি না হয়।

কেশব—

মানবীরূপিণি দেবি সুশীলে! এতদিনে বুঝিলাম, বিধাতা আমাকে অনন্তসুখে সুখী করিবার জন্যই এই দারিদ্রদশায় নিঃক্ষেপ করিয়াছেন। এ আমার দারিদ্র্য নহে; স্বর্গসুখের সোপান। ঐশ্বর্য্যমদে প্রমত্ত থাকিলে তোমার মত দেবদুর্ল্লভ রত্ন চিনিতে পারিতাম না; তাই বিধাতা, সদয় হইয়া আমাকে ঐশ্বর্য্যচ্যুত করিয়াছেন।

বাহির দ্বারে সঙ্গীতের শব্দ শ্রুত হইল।

ভিখারিণী গাহিতেছে—

সবাই বলে অন্নপূর্ণা, তাইতে আমি তোমার দ্বারে।
ক্ষুধায় মরে ভিখারিণী, খেতে দে মা উদর পূরে॥

কাঙ্গালিনী দেখি মোরে,
কেহ না আদর করে,
তোমার রূপ দেখে পেট ভরে গো মা, কথায় পরাণ শীতল করে।

সুশীলা পতিসেবা করিতে করিতে, তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া ভিখারিণীকে আদর করিয়া বসাইলেন এবং রন্ধনশালা হইতে নিজের আহার্য্য অন্ন আনিয়া ভোজনার্থ প্রদান করিলেন। ভিখারিণী মনের সুখে উদর পূরিয়া ভোজন কবিল এবং কায়মনে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

সে আবার গাহিল—

যেমন শীতল কল্লি মোরে—
তেমনি মাগো চিরতরে সুখী হবি এ সংসারে॥

অনাথার আশীর্ব্বাদ,
পূরিবে মনের সাধ,
রাজা হবে তোমার স্বামী, তুমি রাণী রাজার ঘরে॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—*:••:*:••:*—

মহামারি।

কালের বিচিত্র গতি। কাল আসিতেছে, যাইতেছে, আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। কিন্তু অদ্য যে ভাবে আগমন করিল, কল্য আর তাহার সে ভাব নাই। এই পরিবর্ত্তনশীল কালের প্রভাবেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি সংহার চলিয়া আসিতেছে। আজি দেখিলাম তরুণ অরুণের সুবিমল কিরণে সজ্জাভূতা হইয়া যে প্রকৃতি তোমার নিকট অনন্ত সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে, কালের বিচিত্র পরিবর্ত্তনে, কালি আর তাহার সে সৌন্দর্য্য নাই।

তখন নিবীড় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া তাহার ভীতিপ্রদদৃশ্য। আজি যে মন্দমারুতের সুশীতল স্পর্শে শরীর শীতল হইতেছে, কালি তাহার গগনভেদী গর্জ্জনে প্রাণমন কম্পিত। দেখিলাম—রত্নালঙ্কার বিজড়িতা সুন্দরী রমণীর অতুল রূপলাবণ্যে ক্ষণপ্রভা প্রভাশূন্য হইয়াছে; শশধর লজ্জিত হইয়াছে; হাস্য কোলাহলে সৌধকক্ষ মুখরিত হইতেছে; আনন্দের অবধি নাই; সুখের শেষ নাই। কিন্তু দুইদিন পরে দেখি—রত্নরাজি বিচ্যুতা হইয়া, সে স্বর্ণকমলিনী ধূলায় মিশাইয়া গিয়াছে: সে লাবণ্য নাই; সে চাঞ্চল্য নাই; সে হাস্যের তরঙ্গ নাই; সে বিদ্যুদ্দামবিস্ফারিত নয়নের অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য নাই। নিদারুণ বৈধব্যের অসহ্য যাতনা, তাহার সকল শোভা হরণ করিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনপ্রিয় কালের প্রভাবেই আজি গৌড়ের (লক্ষণাবতীর) সেই অবস্থার সূত্রপাত।

অনন্ত ঐশ্বর্য্য শালিনী লক্ষণাবতী গুরু গৌরবে, বঙ্গবিহার উড়িষ্যার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। পালবংস সেনবংশ প্রভৃতি হিন্দুরাজগণ হইতেই ইহার গৌরবের সূত্রপাত। মুসলমান অধিকারে ইহার গৌবব, উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছে। শিল্প বাণিজ্যের বিপুল বিস্তাব, বিবিধ বিদ্যার বিশেষরূপ অনুশীলন এবং মুসলমান নবাবগণের বিলাসিতা ইত্যাদি বিবিধ কারণে নগরীর লোক সংখ্যাব ইয়ত্তা নাই। ধনের আধিক্য, মানের একশেষ, প্রতাপের চূড়ান্ত হইলে যাহা হয়, নগরবাসীগণের তাহাই হইয়াছে। হিংসা দ্বেষ মৎসরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, স্বার্থপবতার আবির্ভাব হইয়াছে, বিলাসিতাব স্রোত বহিতেছে। পাপে ভয় নাই, পুণ্যে রুচি নাই, অধৰ্ম্মে বিকার নাই। সামাজিকশাসন শিথিল হইয়াছে, রাজ শাসনে পক্ষপাত প্রবেশ করিয়াছে। সত্যে অনাদর, মিথ্যায় সমাদর, অত্যাচারে অনুরাগ হইয়াছে। ব্যাভিচারের প্রবলতা, সুবিচারের খৰ্ব্বতা, গুণ গ্রাহিতার অল্পতা হইয়াছে। গুরুর গুরুত্ব নাই; পণ্ডিত মূর্খের ইতর বিশেষ নাই; উচ্চনীচের প্রভেদ নাই। যেন সকলেই পাপ সাগরের প্রবলস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে; এমন বিশৃঙ্খল, এমন অনিয়ন্ত্রিত, ধৰ্ম্মভাব পরিশূন্য অবস্থা গৌড়ে কখনও দেখাযায় নাই। ভগবান্ আর কত সহ্য করিবেন? গৌড়ের পতন অনিবার্য্য।

দুঃসাধ্য সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণে গৌড় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। সৰ্ব্বপ্রথমে ইতর পল্লীতে এই রোগের সূচনা হইয়াছে। একটী, দুইটি, ক্রমে বিশ পঁচিশটী করিয়া লোক, প্রতিদিন শমনসদনে গমন করিতে লাগিল। প্রত্যহ সংখ্যার আধিক্য হইতেছে। সংখ্যা শতমাত্রার উপর উঠিল; ক্রমশঃ সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। এখন আর ইতর ভদ্র বিচার নাই; সকল পল্লীতেই হাহাকার শব্দ। নিদারুণ মহামারি। নগর উৎসন্ন হইল। এ ভীষণ ব্যাধি চিকিৎসার অতীত।

ঔষধে নিবৃত্তি হয় না ; শান্তি সস্ত্যয়নে সমতা পায় না। দেখিতে দেখিতে বৃহৎ বৃহৎ পল্লী জনশূন্য হইল।

কে কাহাকে দেখিবে ? কে কাহার চিকিৎসা করাইবে? সকলেই আপনা লইয়াই ব্যস্ত। সৎকার অভাবে অসংখ্য শবদেহ পথিপার্শ্বে পড়িয়া আছে। এখন আর হিন্দু মুসলমান বিচার নাই ; ব্রাহ্মণ শূদ্রের ইতর বিশেষ নাই ; ধনীদরিদ্রে ভেদজ্ঞান নাই ; সকলেরই সমান দশা। যাহারা পারিয়াছে প্রাণভয়ে পালায়ন করিয়াছে। কিন্তু যাইবে কোথায় ? নিদারুণ মহামারি সঙ্গে সঙ্গে। অধিকাংশ ব্যক্তিই পথিমধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে। কেহবা গন্তব্য স্থানে পঁহুছিয়া রোগাক্রান্ত হইতেছে। নগর ঘোর শ্মশানে পরিণত হইল। বাঙ্গালার সুবাদার মোনায়েমখাঁ এই মহামারির আক্রমণে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। গৌড়ের অবস্থা অতিশোচনীয়। আর সে নন্দন কাননের অতুল শোভা, গৌড়ের উদ্যান রাজিতে শোভাপায় না। আর সে মধুরকণ্ঠী রমণীগণের মনোমুগ্ধকর নৃত্যে, সে সকল উদ্যান মুখরিত হয় না। দুর্গদ্বারে সৈন্য সমাবেশ নাই ; পণ্যবিথিকায় জন কোলাহল নাই ; নদীতীরে পণ্যদ্রব্যবহনকারী যান বাহনের নামগন্ধ নাই। স্নানাগার, পাঠাগার, শিল্পাগার নীরব, নিস্তব্ধ। সেই ঘোর কোলাহলময়ী গৌড়পুরী এখন নিবীড় নিস্তব্ধতায় এবং গহন গম্ভীর শূন্যতায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মহামারি ক্রমশঃ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালবৎ অধিবাসীগণ, ভবিতব্যের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট এবং নিষ্ক্রিয়। তাহারা করিবেই বা কি ? এ নিদারুণ দৈব বিড়ম্বনা নিবারণ করা মানুষের সাধ্যাতীত। হায়! কত ফুল্লারবিন্দ নবীনা ললনা, স্বামীর বক্ষেঃ চিরশূল নিঃক্ষেপ করিয়া, অকালে কালগ্রাসে পতিতা হইল। কত অস্ফুটকুসুম যুবকযুবতী, ফুটিতে না ফুটিতে পিতামাতাকে চিরতরে কাঁদাইয়া চলিয়া গেল। সংসারের একমাত্র

অবলম্বন নবীন স্বামী, পত্নী, পুত্রকে অগাধ সলিলে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিল। রোগের চিকিৎসা নাই; রোগীর শুশ্রূষা নাই; শবের সৎকার নাই। স্তূপীকৃত শবদেহের পূতিগন্ধে রোগ আরও ভীষণ বেগে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এ ঘোর দুর্দ্দিনে কি রক্ষা করিবার, শুশ্রূষা করিবার, সমবেদনা প্রকাশ করিবার কেহ নাই? অভিশপ্ত, রোগতপ্ত অধিবাসীগণ কি এইরূপ অনন্ত যাতনায় দগ্ধ হইয়া, প্রাণপরিত্যাগ করিতে থাকিবে? বিধাতার কোপ কি শান্ত হইবে না? না সে অনন্ত দয়ারআধার বিশ্বপতির কার্য্যে নিষ্ঠুরতার নাম গন্ধ নাই। তিনি পাপী, তাপী, পাষণ্ডকে ঘৃণা করেন না। তিনি অবশ্যই কৃপাহস্ত বিস্তার করিয়া, এই সমস্ত পরিতাপিত রোগীর রোগযাতনা নিবারণ করিবেন।

ঐ দেখ—ভগবান্ কৃপা করিয়াছেন। শতশত সাহায্যকারীর আবির্ভাব হইয়াছে। এই সাহায্যকারীদলে যতী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ সকলেই আছেন। এই ঈশ্বর প্রণোদিত শুশ্রূষাকারীদলে স্ত্রী, পুরুষ এবং বালকবালিকা পর্য্যন্ত যোগ দিয়াছে। পীড়িতের শুশ্রূষা, রোগের ব্যবস্থা এবং শবের সৎকার তাঁহাদের কার্য্য। এই কার্য্যে তাঁহারা প্রাণ মন অর্পণ করিয়াছেন। আহার, নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহারা এই পর-হিতৈষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অদ্ভুত অবদান; আশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগ। ঘৃণা নাই, অশ্রদ্ধা নাই, ঘোর সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা নাই; অবাধে পূতিগন্ধ শবের সৎকার সাধন করিতেছেন; ভৃত্যানির্ব্বিশেষে পীড়িতের সেবা করিতেছেন। অর্থ সামর্থ্য প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে এই পরার্থ প্রিয়তা কার্য্য সমাধা হইতেছে। ভগবানের প্রত্যক্ষ হস্ত এ সাহায্যে বিগু-মান। তাঁহারই প্রত্যক্ষ কার্য্য ইহাতে পরিদৃশ্যমান। এ সাহায্য তাঁহারই প্রেরণা। সাহায্যকারীগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়াছেন। কেহ সৎকার্য্যের

ভার লইয়াছেন; কেহ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন; কেহ রোগীর শুশ্রূষা করিতেছেন; কেহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ করিতেছেন। এই কর্ম্মবীর সকলকে দেখিলে দেবতা বলিয়াই বোধ হয়। দেবতা না হইলে এ অমানুষিক কার্য্য কি মানুষে করিতে পারে? মানুষে কি এমন ক্ষিপ্রহস্ত, এমন নির্ব্বিকার, এমন শ্রমসহিষ্ণু হইতে পারে? সেই জন্য বলিতেছি, এ মনুষ্যদেহে দেবতার আবির্ভাব। সেইজন্য বলিতেছি, এ দেবতার কার্য্য, মনুষ্যের নহে। গৌড়ের হৃদয়ভেদী দুর্দ্দশা দেখিয়া, দেবগণ দিব্যলোক হইতে অবতরণ করিয়া, এইরূপে বিপন্নের শুশ্রূষা করিতেছেন। এইবার গৌড়রক্ষা পাইবে; এইবার গৌড়ের দুর্দ্দশা দূর হইবে। সোনার গৌড়, এইবার বুঝি সর্ব্বগ্রাসী করালকালের কাল হস্ত হইতে মুক্তি পাইল।

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত রাজা রতিকান্ত রায়, হরসুন্দরী এবং শশী-মুখীপ্রভৃতি মহোৎসাহে এই মহাকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাঁহারা অভেদে, অবাধে হিন্দু মুসলমানের সেবায় নিযুক্ত। বিজয়মহারাজা এবং বীরেন্দ্ররাজা প্রচুর অর্থ লইয়া, অনুচরবর্গ সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের অর্থবল এবং লোকবলের অভাব নাই। যত অর্থ এবং যত লোকের প্রয়োজন হইতেছে, তাঁহারা তৎসমুদায়ই সরবরাহ করিতেছেন।

উমাশঙ্কর এইবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। তাঁহার তৎপরতা দেখে কে? উমাশঙ্করের প্রাণের মায়া নাই, শরীরের প্রতি দৃষ্টি নাই; সাধ্যাসাধ্যের বিচার নাই। কার্য্য যতই কঠোর হউকনা, স্থান যতই দুর্গম হউক না, উমাশঙ্কর কিছুতেই পরাঙ্মুখ নহেন। উমাশঙ্কর আজি পরম যোগী ঘোর তপস্বীকেও হারাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ঘৃণা নাই, অশ্রদ্ধা নাই, বিকারের নাম মাত্র নাই; সকল সময়ে সকল কার্য্যেই

উমাশঙ্কর অগ্রসর। এখন তাঁহাকে দেখিলে কে বলিবে যে, এই সেই অহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তি ঘোর নারকী উমাশঙ্কর।

উমাশঙ্কর একাকী কত শব দাহ করিয়াছেন, এবং কত শব প্রোথিত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। নিজের সাধ্যাতীত না হইলে তিনি প্রায় অন্যের সাহায্য লইতে স্বীকৃত নহেন। তাঁহার মলমূত্রে ঘৃণা নাই. শঠিত শবসৎকারে বিকার নাই। শুদ্ধ কার্য্য লইয়াই উমাশঙ্কর ব্যস্ত। উমাশঙ্কর গৃহে গৃহে রোগীর অনুসন্ধান করিতেছেন; পথে পথে শবের সন্ধান লইতেছেন। নগরের উপকণ্ঠে উমাশঙ্কর, রোগীর অনুসন্ধান করিতে করিতে কেশবলালের গৃহে উপস্থিত। দেখিলেন—পতি পত্নী উভয়েই শয্যাগত। সম্মুখে সুকুমার শিশু উচ্চৈঃস্বরে পিতা মাতাকে ডাকিতেছে। সেও অস্থিচর্ম্মসার। তাহারও রোগের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। শিশু পরিত্রাহি চিৎকার করিতেছে; কিন্তু অচেতন পিতামাতা নিরুত্তর। উমাশঙ্কর ত্বরিত গতিতে শিশুকে বক্ষেঃ ধারণ করিলেন। চক্ষুতে অবিরল ধারা পড়িতে লাগিল। মহাপাপী উমাশঙ্কর, আজি দেবতা; তাই শিশুর দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত। শিশুকে তৎকালোচিত কিঞ্চিৎ খাদ্য দিয়া সান্ত্বনা কবিতে লাগিলেন। পরে বক্ষেঃ ধারণ করিয়া দ্রুতগমনে সর্ব্বানন্দস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—ঠাকুর! একবার আসুন! এ হৃদয়ভেদী দৃশ্য আর দেখিতে পারি না। ধ্বংসপ্রায় গৌড়ের শত শত দৃশ্য দেখিয়া হৃদয় কাতর হইয়াছে বটে, কিন্তু এমন হৃদয়ভেদী, এমন প্রাণান্তকর যাতনা আমার হয় নাই। দেব! আপনি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ। মানুষী শক্তিতে না হইলে, অমানুষ শক্তি প্রয়োগ করিয়াও, এই তিনটী প্রাণীর জীবনরক্ষা করিতে হইবে। স্বামীজী ত্বরিত গতিতে, উমাশঙ্করের সমভিব্যাহারে কেশবলালের ভবনে আগমন করিলেন। দেখিলেন—পতিপত্নী ঘোর বিকারে আছন্ন হইয়া মৃতবৎ

পড়িয়া আছেন। স্বামীব নয়নে জলবিন্দু। সন্ন্যাসীর চক্ষে জল কেন বেটা? বলিয়া, আর এক তেজঃপুঞ্জ জটাজূটধারী মহাযোগী, গৃহে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বানন্দ স্বামী, পশ্চাতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন—পবমহংস পরমানন্দ স্বামী।

সর্ব্বানন্দস্বামী কহিলেন—গুরুদেব! এ লোমহর্ষণ দৃশ্যে আমার সন্ন্যাস ভাসিয়া গিয়াছে। জানি না কোন্ অজ্ঞাত কারণে এই বোগ শয্যাশায়ী যুবককে দেখিয়া আমার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। দেব! আজ আমি সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী নহি। ঘোব মায়ায় আবদ্ধ হইয়া, আমি গৃহস্থেরও অধম হইয়া গিয়াছি। গুরুদেব! কেন আমার এমন অবস্থা হইল? কেন আমার হৃদয়ে এত দুর্ব্বলতা আশ্রয় করিল? আপনার কৃপায় অনেক দূব উচ্চে আরোহণ করিয়া, আমার এমন অধঃ-পতনের সূচনা হইতেছে কেন? গুবো! সংসার জলধির কর্ণধার! কৃপা করিয়া আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করুন, যেন আমি মায়ামোহের নিগড়বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাই।

পরমহংসদেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন—বৎস! প্রকৃতি জাত অবশ্যম্ভাবী ঘটনাব অস্ফুট ছায়াপাতে, আজ তোমার এই মানসিক বিকার। এ বিকার স্থায়ী নহে; তবে অঙ্কুরেই বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে বলিয়া, এখন একটু ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে। এ নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিবার এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই বলিয়া, তোমাকে কিছুদিন অন্ধ-কারে থাকিতে হইবে। সময় উপস্থিত হইলে, সমুদয় জানিতে পারিবে; মনোবিকারও অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।

এই সময়ে রাজা রতিকান্তরায়, হরসুন্দরীদেবী, শশী, এবং বিজয়মহারাজা ও বীরেন্দ্ররাজা প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন সুশীলা ও কেশবলালের হৃদয়বিদারক অবস্থা শ্রবণ করিয়া, সকলেই

দরবিগলিত নেত্রে আসিতেছেন; প্রত্যক্ষে দর্শন করিয়া কাতরতার অবধি রহিল না। কিন্তু রতিকান্তের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। সর্ব্বানন্দের ন্যায় তাঁহারও হৃদয়ে আজি শোকের উচ্ছ্বাস। গিরিতুল্য অটল রতি-কান্ত এখন বালকের তরলতায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছেন। কেন এ তরলতা, কেন এ শোকোচ্ছ্বাস, কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে পরমহংস পদে পতিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কহিলেন—গুরুদেব! এ আমার কি হইল? এই রোগক্লিষ্টা অচৈতন্যা সুশীলাসুন্দরীকে দেখিয়া আমার বাৎসল্যস্নেহ উথলিয়া উঠিতেছে কেন? যেন কে বলিতেছে—এ তোর হারানিধি ভ্রাতৃদুহিতা উমাসুন্দরী; কিন্তু ইহার বিবর্ণ বদনে তাহার সাদৃশ্য কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। প্রভো! আমার প্রাণ প্রবোধ মানিতে চাহিতেছে না। যাহা হউক যে কোন উপায়ে ইহাদের জীবনদান দিতে হইবে; ইহাদিগকে রোগমুক্ত করিতে হইবে। এই বলিয়া—কঠোরকর্ম্মত্যাগী রতিকান্ত, বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে স্বামীজীর শিষ্যমণ্ডলী, উমাশঙ্কর, বিজয়, বীরেন্দ্র প্রভৃতি সকলেই আসিয়া স্বামীজীকে ধরিয়া বসিলেন। বলিলেন—ঠাকুর! আপনি দেবতা। আপনি ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই ইহারা রোগমুক্ত হইতে পারিবে।

হরসুন্দরীর আর সে ব্রহ্মচর্য্যের ভাব নাই; রোগিণীর মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া অবিচল নেত্রে বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর নেত্রজলে বক্ষঃ প্লাবিত করিতেছেন। সর্ব্বানন্দ, দূরে দণ্ডায়মান আছেন; কিন্তু কেশবের বদন হইতে নয়ন ফিরাইতে পারিতেছেন না। এক এক-বার কঠোর হইয়া প্রস্থান করিবার ইচ্ছা করেন; পারেন না। কে যেন দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

শশীমুখী মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন, আর রোগী রোগিণীর শুশ্রুষা করিতেছেন।

উমাশঙ্করের আগ্রহ সকলের অপেক্ষা অধিক। কি করিলে ইহারা ভাল হইবে, কি করিলে ইহাদের উপকার হইবে, উমাশঙ্কর তাহার জন্য পাগল। শিশুত উমাশঙ্করের বক্ষেঃ বক্ষেই ফিরিতেছে। যখন যাহা প্রয়োজন হইতেছে উমাশঙ্কর তখনই তাহা সম্পন্ন করিয়া দিতেছেন।

এইবার সকলে সমবেত হইয়া, স্বামীর নিকট রোগীদের রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সকলের কাতর প্রার্থনায় দয়ার্দ্র হইয়া স্বামী কহিলেন—তোমরা যখন সকলেই প্রার্থনা করিতেছ, তখন আমি ইহাদের মধ্যে এক জনকে রোগমুক্ত করিব। বল—কাহার প্রাণভিক্ষা চাও ? কে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় বল—আমি তাহাকে রোগ হইতে মুক্ত করিব।

স্বামীজীর কথায় সকলে হতাশনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। একজনের প্রাণরক্ষা হইলে তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন; তাঁহারা তিনজনেরই প্রাণ ভিক্ষা চাহেন।

স্বামীজী কহিলেন—তাহা হইতে পারে না। আমার এতাদৃশ অলৌকিক শক্তি নাই যে, তিনজনের জীবনরক্ষা করিতে পারি।

তখন সকলে কহিলেন—দেব! যদি তিনজনের প্রাণরক্ষা না হয়, তবে কাহাকেও বাঁচাইবার প্রয়োজন নাই। বরং এই অনুগ্রহ করুন, যেন আমরাও সকলে এই দারুণ সংক্রামক মহামারিতে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারি। আমরা আর ইহাদের যাতনা দেখিতে পারি না। ইহাদের অধর্ম্মের সংস্রব থাকিলে, আমরা এতদূর নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতাম না। শুনিতেছি—পরহিতৈষণা এবং পরোপকার ইহাদের জীবনের ব্রত। এই যুবদম্পতির প্রশংসা দিগন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

ইহাদের যেমন রূপ তেমনি গুণ। এই সুশীলাসুন্দরীর স্বামীভক্তি অতুলনীয়। শুনিয়াছি—এই যুবতী রাজার কন্যা। রাজ-ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিতা হইয়াও অকাতরে দারিদ্র দশা ভোগ করিতেছেন। আবার এই দারিদ্র দশাতেই ইহার গৌরব ফুটিয়াছে; সৌরভ ছুটিয়াছে। দেখুন—বাটীর কি পরিচ্ছন্নতা, দ্রব্যাদির কি পারিপাট্য। দাসদাসী নাই, পাচক পাচিকা নাই; তত্রাচ লক্ষ্মীস্বরূপিণীর সংসারশৃঙ্খলতায় এই দরিদ্রপুরী স্বর্ণপুরী হইয়াছে। যুবকের চরিত্রও পত্নীর অনুরূপ। এমন সাধুসদাশয় এবং শান্তশীল আর দেখা যায় না। আমরা ইহাদের যশোগৌরবের ধন্য ধন্য রব শুনিয়া আসিলাম। আপনাদের অবস্থা বিস্মৃত হইয়া সকল লোকেই ইহাদের জন্য দুঃখিত। সকলেই ইহাদের রোগমুক্তির নিমিত্ত কায়মনে প্রার্থনা করিতেছে।

স্বামীজী কহিলেন—তোমাদের সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করা আমার অভিপ্রেত নহে। আচ্ছা, তিনটী প্রাণীরই প্রাণরক্ষা হইবে। কিন্তু ইহার জন্য তোমাদের একটা কার্য্য করিতে হইবে। রুগ্ন যুবকের শোণিত যে প্রকার বিকৃত হইয়াছে, তাহাতে ইহার শোণিত শোধন বা ইহার শরীরে বহু পরিমাণে বিশুদ্ধ শোণিত প্রবেশ করান আবশ্যক। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ নিজ শোণিত প্রদানে সম্মত থাক, তবে অগ্রসর হও। যন্ত্র বিশেষ দ্বারা তাহার শোণিত রোগীর শরীরে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে। স্ত্রীলোকের শোণিতে কার্য্য হইবে না। তখন "আমি শোণিত দিব," "আমি শোণিত দিব" শব্দে কোলাহল উঠিল। সকলেই শোণিত দানে অগ্রসর।

রতিকান্ত কহিলেন—গুরুদেব! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; আর কতদিনই বা বাঁচিব। আমার ইচ্ছা যুবকের প্রাণরক্ষার্থ শোণিত প্রদান করিয়া, জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি। বিজয়মহারাজা অগ্রসর হইয়া কহিলেন—দেব! রাজা বৃদ্ধ হওয়ায় তাঁহার শোণিতের কার্য্যকারীতা

শক্তির হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এ জন্য বোধ হয় রাজার শোণিতে, যুবকের বিশেষ উপকার না হইতে পারে। আমার অল্প বয়স; অতএব অনুগ্রহ-পূর্ব্বক অধমের শোণিত গ্রহণ করিয়া, যুবকের প্রাণ রক্ষা করুন। আমি আনন্দের সহিত শোণিত প্রদান করিয়া কৃতার্থ হই।

বীরেন্দ্র অগ্রসর হইয়া কহিলেন—প্রভো! বিজয় মহারাজা, শৌর্য্য বীর্য্য এবং নানা সদ্‌গুণে বঙ্গবিহারউড়িষ্যায় অগ্রগণ্য। এরূপ মূল্যবান্ জীবন নষ্ট না করিয়া, এই অপদার্থের শোণিত গ্রহণ করিয়া, আমাকে ধন্য করুন। আমি জীবিত থাকিয়া অন্য কোন সৎকার্য্য করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিব বলিয়া বিবেচনা করি না; অতএব কৃপাকরিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করিতে আজ্ঞা হউক। স্বামীজীর সন্ন্যাসী শিষ্যগণও একে একে ঐমত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বানন্দ স্বামী সর্ব্বাপেক্ষা নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলেন। স্বামীজী নির্ব্বাক। কাহারও কথায় কোন উত্তর দিতেছেন না; অগাধ গাম্ভীর্য্যের সহিত সকলের প্রার্থনা শ্রবণ করিতেছেন।

উমাশঙ্কর, আসিয়া আছাড় খাইয়া স্বামীজীর সম্মুখে পতিত হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—দয়াময় আমার প্রার্থনা শুনিতেই হইবে, না শুনিলে আমি আত্মঘাতী হইব। আমার তুল্য নারকীর শোণিতে যদি যুবকের জীবন রক্ষা হয়, তবে আমার পুঞ্জীকৃত পাপরাশির কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। দেব! প্রভো! আমায় এসুখে বঞ্চিত করিবেন না। বলিয়া—উমাশঙ্কর বড়ই কাতরতা, এবং আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইবার স্বামীজী কথা কহিলেন; বলিলেন—উমাশঙ্কর! কেন বৃথা আত্মহত্যা করিবে? শোণিত প্রদান করিলে তোমার প্রাণবিয়োগ হইবে। তুমি অনেক পাপ করিয়াছ বটে, কিন্তু সে সকলের মোচন আছে; আত্মহত্যার মোচন নাই; অতএব

এ সংকল্প পরিত্যাগ কর। উমাশঙ্কর কহিলেন—দেব! আমি অনেক পাপ করিয়াছি, এবং তাহার জন্য প্রবল অনুতাপ অনুভব করিতেছি। কিন্তু তাহার মধ্যে একটী উৎকট পাপের কার্য্য আমাকে নিরন্তর বৃশ্চিক-দংশনযাতনা প্রদান করিতেছে। সে যাতনা মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে বিরাম প্রদান করে না। আজ এই যুবকের মুখ দেখিয়া, আমার সে যাতনা নবীভূত হইয়া উঠিয়াছে। উহু কি যাতনা! সর্প দংশন, বৃশ্চিক দংশন ইহা হইতে শতগুণে লোভনীয়। প্রভো! প্রাণ যায়। প্রাণত যাইবেই, তবে এই কার্য্যে প্রাণ দিতে পারিলে, আমার জ্বালা অনেক পরিমাণে জুড়াইবে। প্রভো! অনুমতি করুন, আমি শোণিত প্রদান করি। আত্মহত্যাই হউক, আর যাহাই হউক প্রাণ দিতে পারিলে জ্বালা জুড়াইবে। জীবিত থাকিয়া অনন্ত যাতনায় দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা, প্রাণ দিয়া নিদারুণ জ্বালা জুড়াইতে পারিলে আমি পরম শান্তি মনে করিব।

পরমহংসদেব উমাশঙ্করের আগ্রহাতিশয্য দর্শনে কহিলেন—বৎস উমাশঙ্কর! আমি তোমার আগ্রহ দেখিয়া, যারপরনাই সন্তোষলাভ করিলাম। বুঝিতেছি, প্রবল অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া তুমি অনন্ত যাতনা পাইতেছ; কিন্তু এই অনুতাপানলেই তোমার পাপরাশি দগ্ধ হইয়া যাইবে। এইবার তুমি যাতনা হইতে মুক্তিলাভ করিবে। 'তুমিই এই কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া, আমি তোমার প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলাম। দেখিও—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যেন তোমার এই দৃঢ়তা অটল এবং অচল থাকে। কাতরতা প্রদর্শন করিলে তোমার সকলদিক্ নষ্ট হইবে। উমাশঙ্কর, পরমানন্দে স্বামীজীর পদরেণু গ্রহণ করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

রক্তগৈরিক এবং রুদ্রাক্ষমালা পরিশোভিত অভয়ানন্দ স্বামী, সন্দংশ হস্তে, রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। সন্দংশের অগ্রভাগে সূক্ষ্মাগ্র সূচিকা। অভয়ানন্দ, যন্ত্র দেখাইয়া কহিলেন—উমাশঙ্কর রায়! এই

যন্ত্র সাহায্যে তোমার রুধির আকর্ষণ করিতে হইবে। রক্তস্রোত বন্ধ হইলে সন্দংশ দ্বারা মাংস ছিন্ন করিয়া পুনর্ব্বার যন্ত্র প্রয়োগ করিব। ইহাতে যাতনার একশেষ হইবে; সহ্য করিতে পারিবেত? উমাশঙ্কর একবার রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। নরতত্ত্ববিদ্ স্বামীদেব সম্মুখেই দণ্ডায় মান। তিনি বজ্রগম্ভীর নাদে কহিলেন—উমাশঙ্কর! ইতস্ততঃ করিতেছ? রুধির দিবার প্রয়োজন নাই। উমাশঙ্কর করযোড়ে কহিলেন—দেব! কাতর হই নাই; ইতস্ততঃ করিয়াছি বটে; কিন্তু প্রাণের মায়ায় করি নাই। আমি যে যুবকের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি; যাহার প্রাণান্ত পর্য্যন্ত করিয়াছিলাম; আর যাহার পত্নী—আর বলিতে পারিলেন না—কাঁদিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি—সে যুবক প্রাণে মরে নাই। সাদৃশ্য দেখিয়া, এই যুবকই সেই বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে: কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য বিতর্ক আসিয়া, এই সন্দেহ জন্মাইয়া দিল যে, এ যদি সে যুবক না হয়? তাই ইতস্ততঃ করিয়াছি মাত্র। প্রাণের ভয়ে ইতস্ততঃ করি নাই পরমহংস-দেব কহিলেন—আচ্ছা, মনে কর এ সে যুবক নহে। তবে আর শোণিত দিবে কেন? উমাশঙ্কর কহিলেন—যুবক যেই হউক, আমি শোণিত প্রদান করিয়া স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

তখন অভয়ানন্দ, উমাশঙ্করের শরীরে যন্ত্র স্থাপন করিলেন। উমাশঙ্কর আনন্দের সহিত রুধির দানে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া, স্বামীজী সস্নেহে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—বৎস! আর রুধির দিতে হইবে না; যুবক শীঘ্রই রোগমুক্ত হইবে। অধিকন্তু তুমি নিষ্পাপ হইলে। তুমি যাহার প্রতি অমানুষ অত্যাচার করিয়াছিলে, এ সেই যুবক। তোমার ভয়ে নাম, বংশ গোপন করিয়া ছদ্মবেশে এই স্থানে অবস্থান করিতেছে। এসকল কথা এখন প্রকাশ করিও না। রোগমুক্ত হইলে সকল কথা প্রকাশিত হইবে। এই বলিয়া স্বামীজী যোগজীবনকে আহ্বান করিয়া

রোগীগণের রোগমোচনের আদেশপ্রদান করিলে, যোগজীবন বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা সুশীলাসুন্দরী, কেশবলাল ও শিশুর রোগ মোচন করিলেন। সুস্থদেহে পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সর্ব্বানন্দস্বামী চীৎকার করিয়া কেশবলালকে বক্ষেঃ ধারণ করিলেন। রতিকান্ত রায় এবং হরসুন্দরী, মা! মা! বলিয়া সুশীলাসুন্দরীকে ক্রোড়ে লইলেন। শিশু একবার সর্ব্বানন্দের ক্রোড়ে, একবার হরসুন্দরীর, একবার রতিকান্ত রায়ের এবং এক একবার পিতামাতার ক্রোড়ে যাইতে লাগিল। স্বামীজীও তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন সকলে পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হইয়া স্বামীজীর চরণে প্রণত হইলেন। উমাশঙ্কর কাঁদিতে কাঁদিতে যুবকের কৃপাভিক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

সুধাংশুমোহন (কেশবলাল) অন্তরের সহিত উমাশঙ্করকে ক্ষমা করিয়া, স্বামীর পদতলে পতিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর কহিলেন—সুধাংশুমোহন? তোমার গুণের কথা শুনিয়াছি, আজ প্রত্যক্ষে উদারতা দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। তোমার মঙ্গল হইবে।

উমাশঙ্কর কহিলেন—দেব! ভগবানের কৃপায় বিজয়কুমার অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। অতএব আমার ইচ্ছা যে আমার সমুদয় সম্পত্তি সুধাংশুমোহনকে প্রদান করিয়া, পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।

রতিকান্ত কহিলেন—রায়জি! তোমার সম্পত্তি দিবার প্রয়োজন হইবে না। আমার ভ্রাতা নিশিকান্ত, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সমস্ত বৈভব আমার অধিকারে আসিয়াছে। আমি সে সমস্ত আমার প্রিয়তমা ভ্রাতৃদুহিতা উমাসুন্দরীকে প্রদান করিব; আর আমার ভ্রাতার রাজা উপাধি ছিল; অতএব সম্রাট্‌দরবারে চেষ্টা করিয়া সুধাংশুমোহনকে রাজা উপাধিও প্রদান করাইব।

বিজয়মহারাজ কহিলেন—সে ভার আমার রহিল ।

সর্ব্বানন্দস্বামী, বহুদিন হইল সংসার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। পত্নী ও শিশুপুত্র সুধাংশুমোহনকে গৃহে রাখিয়া, সর্ব্বানন্দ সংসার পরিত্যাগ করেন। সুধাংশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে (রাজা রতিকান্তরায়ের ভ্রাতা রাজা নিশিকান্তরায়ের একমাত্র দুহিতা) উমাসুন্দরীর সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। রাজার পুত্রসন্তান না থাকায়, সুধাংশু পুত্রনির্ব্বিশেষে রাজভবনে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। রাজার সহিত উমাশঙ্করের চিরশত্রুতা। উমাশঙ্কর নানা চক্র বিস্তার করিয়া রাজা নিশিকান্তকে বিপদগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করেন। এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং যুদ্ধবিগ্রহাদি চলিতে থাকে। একবার একখানি গ্রামের অধিকার লইয়া, উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম হয়। নিশিকান্ত বীরপুরুষ। তিনি উমাশঙ্করকে গ্রাহ্য করিবেন কেন? উমাশঙ্কর নবাবের বিশেষ অনুগৃহীত হইলেও, নিশিকান্ত তাঁহাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। সেই জন্যই গ্রাম লইবার চেষ্টা। এবং তাহাতেই যুদ্ধ ঘটনা। উভয় পক্ষই দলবল লইয়া সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। উমাশঙ্কর বঙ্গাধিপের সাহায্যে স্বীয় দল পুষ্ট করিয়া লইলেন। সুতরাং যুদ্ধে নিশিকান্তের পরাজয় হইল। শুদ্ধ পরাজয় নহে, নিশিকান্তের জীবনান্ত হইল। জামাতা সুধাংশুমোহনও এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও এই যুদ্ধে মর্ম্মভেদী আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বপক্ষ, বিপক্ষ সকলেই জানিত সুধাংশুর প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। দুর্দ্দান্ত উমাশঙ্কর তখন উমাসুন্দরীর উদ্দেশে লোক প্রেরণ করিলেন। উমাসুন্দরী অনিন্দ্যসুন্দরী বলিয়া, স্বার্থসাধনের জন্য, উমাশঙ্কর সেই পরমাসুন্দরী রাজদুহিতাকে নবাবকরে সমর্পণ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও উমাসুন্দরীর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। এদিকে সুধাংশুমোহন জীবিত আছেন বলিয়া উমাশঙ্কর সংবাদ পাইলেন। তখন দেশ,

বিদেশ নানাস্থানে পতিপত্নীর অন্বেষণ হইতে লাগিল। কিন্তু কুত্রাপি তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া গেল না। নিশিকান্তের সম্পত্তি নবাবসরকারে জব্দ হইল। এই সূত্রে রতিকান্তরায়ের সহিত উমাশঙ্করের বিবাদ ঘটিল। বঙ্গাধিপ দায়ুদখাঁর অধিকারে, রতিকান্তের দুরবস্থার একশেষ হইল। তত্রাপি রায়মহাশয় ভ্রাতৃদুহিতা ও জামাতার অনেক অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু তাঁহারা নাম, ধাম এবং বংশমর্য্যাদাদি গোপন করিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া, কোন মতে সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। দায়ুদের পরাজয়ের পরেই সুধাংশুমোহন নবাবসরকারে চাকরী স্বীকার করিয়াছেন; এবং নাম গোপন করিয়া, গৌড়ের উপকণ্ঠে অতি সামান্যভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। সুতরাং কেহই তাঁহাদিগকে চিনিতে বা জানিতে পারিল না। দুর্দ্দান্ত মহামারির সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত না হইলে, বুঝি চিরদিনই তাঁহারা অজ্ঞাতভাবেই অবস্থান করিতে থাকিতেন। উমাশঙ্কর হইতেই তাঁহাদের অবস্থাবিপর্য্যয় এবং অজ্ঞাত বাস; আবার উমাশঙ্কর হইতেই তাঁহাদের আত্মপ্রকাশ ও ঐশ্বর্য্যলাভ। সর্ব্বানন্দস্বামী, প্রাণের আবেগে পুত্রকে বক্ষেঃ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন—বৎস! সন্তানবাৎসল্যে অন্ধ হইয়া আমি ইহপরকাল হারাইতে বসিয়াছি। আমাকে বিদায় দাও। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরসুখী হইয়া সুযোগ্য সহধর্ম্মিণী লইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর। সৌভাগ্যবলে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর তুল্য অলোকসামান্যা পত্নীলাভ করিয়াছ। এই পত্নী হইতেই সুখৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া রাজাধিরাজ হইবে। সুধাংশুমোহন, পিতার পদযুগল ধারণ করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন—পিতৃদেব! শাস্ত্রে দেখিয়াছি—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং দেবঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

কিন্তু আমার দুরদৃষ্টে তাহার কিছুই হইল না। আমি প্রাণ ভরিয়া পিতৃসেবা করিয়া জীবনসার্থক করিতে পারিলাম না।

সর্ব্বানন্দ স্বামী, কহিলেন—বাবা! গুরুর কৃপায় সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি; যদি ভাগ্যবলে চিত্ত স্থির রাখিতে পারি, তবে বোধ হয়, উদ্ধারলাভ করিতে পারিব। কিন্তু তাহা কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে?

সুধাংশুমোহন পিতার চরণরেণু গ্রহণ করিয়া বলিলেন—বাবা! মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, আপনি সংসার বিরাগী যোগী। তবে এ হতভাগ্য সন্তান কি লইয়া সংসারে থাকিবে? অনুমতি হয় ত আমিও আপনার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হই। পরমগুরু পিতার কৃপায় যদি নশ্বর সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিতে পারি, তবে মনুষ্যজন্মের সফলতা সম্পাদন হইবে।

সর্ব্বানন্দ কহিলেন—বৎস! তোমার সংসার পরিত্যাগের উপযুক্ত বয়ঃক্রম হয় নাই। সময় আসিলে এবং চিত্তের ব্যগ্রতা হইলে যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবে। এক্ষণে আমাকে বিদায় দেও। আর মায়া বন্ধনে আমাকে আবদ্ধ করিও না। তোমার নিকট যতক্ষণ থাকিব, মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিব না। আমার ততদূর উন্নতি হয় নাই বলিয়াই আশঙ্কা। সেরূপ উন্নতি হইলে কাহার সাধ্য আমাকে আবদ্ধ করে?

সুধাংশু কহিলেন—দেব! আমি কুপুত্র হইয়া আপনার পরমার্থ কার্য্যে বাধা দিতে চাহি না। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার অধর্ম্মে মতি না হয়।

সর্ব্বানন্দ, পুত্রকে আলিঙ্গন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—বৎস! সুধর্ম্মে থাকিয়া চিরজীবী এবং চিরসুখী হও। সর্ব্বানন্দের নয়নে এক বিন্দু জল। ক্ষিপ্রহস্তে জলবিন্দু মোচন করিয়া, তিনি ত্বরিত গতিতে স্বামীজীর নিকটে উপস্থিত হইলেন।

স্বমীজী—

সর্ব্বানন্দ আসিয়াছ ? মায়া কাটাইতে পারিয়াছ ত ?

সর্ব্বানন্দ—

ভগবন্! দুশ্ছেদ্য বন্ধন অতিকষ্টে ছেদন করিয়াছি।

স্বামী—

বড় কঠিন পরীক্ষায় তুমি আজ উত্তীর্ণ হইলে। আর ভয় নাই। এক্ষণে এই ভীষণ মহামারি নিবারণের নিমিত্ত একটী হোমকার্য্য করিবার প্রয়োজন। গতকল্য আগ্রা হইতে সম্রাট্‌-প্রেরিত কর্ম্মচারী এবং নূতন সুবাদার আগমন করিয়াছেন। তাঁহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন। তুমি তাঁহাদের নিকট গিয়া বল যে, এই হোমকার্য্য সাধনে যেসকল দ্রব্য প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদিগকে সরবরাহ করিতে হইবে। আর বিজয়কুমার ও বীরেন্দ্রনারায়ণকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হোমকার্য্য।

গৌড়ের প্রান্তভাগে দুর্গপ্রাকারের সন্নিহিত বিস্তীর্ণ ভূমিতে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। পর্ব্বতপ্রমাণ কাষ্ঠরাশি স্তূপীকৃত হইয়াছে। ঘৃতের সরোবর হইয়াছে। হোমের প্রধান উপাদান এবং কাষ্ঠ আহরণের নিমিত্ত শতশত লোক নিযুক্ত হইয়াছে। যে, যেখানে পাইতেছে—কাষ্ঠ এবং ঘৃত আনিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিতেছে।

শুভ ক্ষণলগ্ন দেখিয়া কাষ্ঠস্তূপে অগ্নিসংযোগ করা হইল। অগ্নিরাশির অনন্তধূমে আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে। সে প্রচণ্ড অনলরাশিতে

ঘৃত প্রক্ষেপ সহজসাধ্য নহে বলিয়া, ঘৃতসরোবরে অসংখ্য যন্ত্র স্থাপিত হইল। লৌহনির্ম্মিত যন্ত্রের ফোয়ারায় ঘৃতরাশি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। স্রোতোবেগে ফোয়ারা ছুটিতেছে, আর বৃষ্টির ধারায় অগ্নি মধ্যে ঘৃত নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ঘৃত সংযোগে সে অনল প্রবল বেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

বহু বিস্তৃত নিবিড় অরণ্যে দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইলে বুঝি অগ্নিকাণ্ডের এত প্রবলতা হয় না। নিশীথকালে দূর দুরান্তর হইতে সে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শিখাধূম পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। পীতগৈরিক পরিহিত সন্ন্যাসীগণ সেই অগ্নি বেষ্টন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক লাজাঞ্জলী এবং আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। সাধারণ লোকের সাধ্য কি যে, সে অগ্নির ত্রিসীমায় গমন করে? এইরূপে একচত্বারিংশ দিবস পর্য্যন্ত সবেগে এবং সতেজে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। দ্বিচত্বারিংশ দিবসে স্বামিজীর আদেশে অগ্নি নির্ব্বাণ আরব্ধ হইল। সন্ন্যাসীগণ পুনর্ব্বার মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি এবং অর্ঘ্য প্রদান সহকারে প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণান্ত করিলেন। ঘৃত নিক্ষেপের ন্যায় যন্ত্রযোগে বারিপ্রক্ষেপ চলিতে লাগিল। সে প্রলয়াগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পঞ্চদশ দিবস অতিবাহিত হইল। এ দিকে মহামারিরও সমতা হইয়া আসিল। এখন কদাচিৎ দুই একটী শবদেহ দৃষ্ট হয়। ক্রমে তাহারও খর্ব্বতা হইয়া আসিল। আর শবদেহ দৃষ্ট হয় না। আর সে ভীষণতা, সে নিস্তব্ধতা নাই; শোক, তাপ এবং আশঙ্কাপূর্ণ নগরীর ভীতিপ্রদ দৃশ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। নিদাঘতপ্ত শুষ্কবৃক্ষ যেমন প্রাবৃট্ বর্ষণে মুঞ্জরিত হইয়া উঠে, নগরবাসীগণও সেইরূপ এই পরম শান্তিকর হোমকার্য্যের পরে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল। আবার পূর্ব্বের ন্যায় শিল্প বাণিজ্যের বিকাশ হইল; অধ্যয়ন, অধ্যাপনা আরম্ভ হইল; ধর্ম্মকার্য্য, রাজকার্য্য চলিতে লাগিল। শিল্পাগার, পণ্যাগার, লোকসংকুল হইল। বিদ্যালয় বিচারালয় জনতাপূর্ণ। বিলাসীর লীলানিকেতন

কেলিকানন আবার কমলনয়না কোমলা রমণীর কলকণ্ঠে নিনাদিত হইতে লাগিল। জাহ্নবীর ঘট্টতটে পুনর্ব্বার সেই অলক্তরাগরঞ্জিত অবলা কুলের অলঙ্কারধ্বনি ধ্বনিত হইল। প্রনষ্টগৌরব গৌড় নগরীর পূর্ব্বশ্রী প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যাহা কিছু হইল তাহা কেবল পরমহংসদেবের কৃপায়। দয়াময় স্বামিজী, ধ্বংসমুখ হইতে গৌড়ের পুনরুদ্ধারসাধন করিলেন। মহাপুরুষের কোন কার্য্যই অসম্ভব নহে। ইহার মধ্যে যদি কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য নিহিত থাকে, তবে তাহাও তাঁহারই ইচ্ছা এবং তাঁহারই গভীর গবেষণাব ফল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পাঠানের শেষ চেষ্টা।

সম্রাট্ মোনায়েমখাঁর পদে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা হোসেনকুলিখাঁকে নিযুক্ত করিয়া, দায়ুদখাঁকে দমন করিবার নিমিত্ত বিশেষ করিয়া আদেশ করিয়াছেন। নূতন নবাব পাঠানশাসনে বদ্ধপরিকর হইয়া, সমরসজ্জার আয়োজন করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্যকসৈন্যসামন্ত মোগল পতাকাতলে সমবেত হইল। মহারাজা বিজয়কুমার এবং বীরেন্দ্রনারায়ণ উৎসাহের সহিত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বীরেন্দ্রের বড়ইচ্ছা স্বহস্তে পাঠান ভূপতির লাঞ্ছনা করিয়া, বৈরনির্য্যাতন করেন। সেইজন্য বিজয়মহারাজার চেষ্টায় দায়ুদের দমনভার বীরেন্দ্রের প্রতি অর্পিত হইল। এদিকে স্থানেস্থানে খণ্ডযুদ্ধ হইতে লাগিল। পাঠানগণ, প্রাণাস্তপণ করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

মোগলসৈন্য তাহাদের এই অপ্রতিহত গতি নিবারণ করিতে না

পারিয়া অনেকস্থানে পরাজিত হইল। মহারাজাবিজয়কুমার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। বিগতযুদ্ধে অসীমপরাক্রম প্রকাশ করিয়া, তাঁহারা পাঠানদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন বাদসাহ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; রাজা তোডর্ম্মল্ল, সেনাপতি মোনায়েমখাঁ প্রভৃতি নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপস্থিতক্ষেত্রে সে সকল মহারথীর মধ্যে কেহই উপস্থিত নাই। সুবাদার নূতন নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। এ যুদ্ধে মোগল পক্ষ পরাজিত হইলে, সমস্ত দোষ তাঁহার স্কন্ধে পতিত হইবে। তিনি বাদসাহ দরবারের একজন সুদক্ষ পুরাতন সেনাপতি। কতবার কতযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, সম্রাটের সন্তোষভাজন হইয়াছেন, আর এই পলায়িত পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হইবেন? এখন তিনি বঙ্গের জমিদার ও জায়গীরদারগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান; সুতরাং এ পরাজয়কলঙ্ক পূর্ণপরিমাণে তাঁহাকেই বহন করিতে হইবে। মহারাজা-বিজয়কুমার, এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে, সসৈন্যে বীরেন্দ্রের সহিত যোগদিবার নিমিত্ত রাজমহল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দায়ুদখাঁ, তখন বীরেন্দ্র কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া রাজমহলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তুমুল যুদ্ধ হইতেছে। উভয় পক্ষ পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে; জয় লক্ষ্মী কোন্‌দিক্ অবলম্বন করিবেন তাহার স্থিরতা নাই; এমন সময়ে মহারাজাবিজয়কুমার স্বদলে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। বিজয় মহারাজার সৈন্যদলের কোলাহল শব্দে বীরেন্দ্রের সৈন্য, উৎসাহিত এবং উত্তেজিত হইয়া উঠিল; আর পাঠানদল এই অতর্কিত সাহায্য দর্শনে এবং বিজয়মহারাজার নাম শ্রবণে হতোদ্যম হইয়া পড়িল। দায়ুদ, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যারপরনাই বীরত্ব প্রকাশ করিতেছে। সে বুঝিয়াছে যে, এই যুদ্ধে তাহার সবশেষ হইবে। এ যুদ্ধে জয় লাভ করিতে না পারিলে, তাহার আর কোন আশাভরসা নাই। সে পুনঃ পুনঃ

মোগলের সহিত সন্ধি করিয়া, সেইসন্ধি ভঙ্গ করিয়াছে। এ যুদ্ধে পরাজিত হইলে প্রাণদণ্ড নিশ্চত; এই সকল চিন্তা করিয়া দায়ুদ, আজি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। যাহা কখন না হইয়াছে, তাহাই হইতেছে। বীরেন্দ্রেরও বিরাম নাই। যেখানে ঘোরতর যুদ্ধ সেইস্থানেই বীরেন্দ্র। বীরেন্দ্র উন্মত্ত। আততায়ীকে বধকরিবেন; ধৃত করিবেন; লাঞ্ছনা দিবেন; এই তাঁহার লক্ষ্য হইয়াছে। সহসা বিজয়মহারাজার সৈন্য কোলাহল শ্রুত হইল। বীরেন্দ্রের উন্মত্ততা আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি নিজসৈন্য পরিত্যাগ করিয়া তীরবেগে পাঠানদলে প্রবেশ করিলেন; একাকী অশ্বের পৃষ্ঠে চলিয়াছেন। বহুসংখ্যক পাঠানসৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া, দায়ুদখাঁ যেস্থানে যুদ্ধ করিতেছেন, বীরেন্দ্র সেইস্থানে উপস্থিত। দায়ুদ, হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন; সহসা বীরেন্দ্রের আগমন দর্শন করিয়া হতবুদ্ধি হইলেন। বীরেন্দ্র কালবিলম্ব না করিয়া অশ্ব পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং হস্তী হইতে দায়ুদখাঁকে অবতরণ করাইয়া, স্বীয় অশ্বে স্থাপিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে যেন ইন্দ্রজালের মত কার্য্য হইয়া গেল। দায়ুদখাঁকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া তিনি তীরবেগে নিজসৈন্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইবার পাঠানের চমক-ভাঙ্গিয়াছে; ভীমবেগে বীরেন্দ্রের প্রতি পাঠান সৈন্য ছুটিয়াছে। বৃথাচেষ্টা। তখন সহস্র সহস্র মোগলরাজপুতসৈন্য বীরেন্দ্রের পৃষ্ঠ রক্ষা করিতেছে; বিজয় কুমারের প্রবলবাহিনী রণক্ষেত্র ছাইয়া ফেলিয়াছে। আর উপায় নাই দেখিয়া, পাঠান পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল।

দায়ুদখাঁ, শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায়, বিজয়কুমারের শিবিরে নীত হইল। জয় বীরেন্দ্রনারায়ণের জয় শব্দে গগন বিদীর্ণ হইয়া গেল। বিজয়কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণকে আলিঙ্গন করিয়া, শতমুখে তাঁহার এই রণনৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বীরেন্দ্রনারায়ণের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল।

আততায়ীর উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। যে এতদিন ধন মান ঐশ্বর্য্যে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তাছিল; আজ সেই দায়ুদ, হতমান গর্ব্বগৌরব হইয়া বীরেন্দ্রের পদতলে। হীরামণি মাণিক্যের পরিবর্ত্তে কঠিন লৌহশৃঙ্খলে তাহার হস্তপদ আবদ্ধ হইয়াছে। অভিমানে অপমানে দায়ুদখাঁ জীবন্মৃত।

মোগল দরবারের বিচারে রাজবিদ্রোহের অপরাধে দায়ুদের প্রাণদণ্ড হইল। পাঠানগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া, যে, যেখানে পারিল পলায়ন করিল। নবাবদরবারে রাজা বীরেন্দ্রনারায়ণের সম্মানের সীমা নাই। মহারাজা বিজয়কুমারের নিম্নেই বীরেন্দ্রের আসন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রস্থান।

হোমকুণ্ডের অনতিদূরে দুর্গপ্রাকারের সন্নিহিত বটবৃক্ষতলে, পরমহংস পরমানন্দস্বামী অজিনাসনে উপবিষ্ট। চতুর্দ্দিকে সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ শিষ্যপ্রশিষ্যগণ মণ্ডলাকারে বসিয়া আছেন। বাদসাহ প্রেরিত কর্ম্মচারী প্রভুনারায়ণ সিংহ আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া স্বামীজীর পদরেণু গ্রহণ করিলেন। স্বামীজী আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিতে বলিলেন।

প্রভুনারায়ণ কহিলেন—ভগবন্! আপনি দয়ার্দ্র হইয়া গৌড়ের উপস্থিত দুর্ব্বিপাক নিবারণ করিতে আসিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, সাহান্‌সাহা

কৃতার্থ হইয়াছেন। আপনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, তখনই তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি আমাকে বিশেষ করিয়া আদেশ দিয়াছেন। তৎসম্পাদনার্থ তিনি আমার সহিত পঞ্চাশসহস্র মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছেন এবং আবশ্যক হইলে সুবাদারকেও অর্থ সাহায্যের আদেশ দিয়াছেন; আর যান বাহন অনুচর ইত্যাদি যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে, তৎসমুদয়ই সরবরাহ করিবার অনুমতি সুবাদারকে প্রদান করিয়াছেন। তদনুসারে আমরা হোম-কার্য্যের দ্রব্যাদি আহরণ করিয়াছি। কিন্তু এখনও প্রচুর অর্থ আমার নিকট আছে। অনুমতি করুন সেই অর্থ কোন্ কার্য্যে ব্যয় করিব? আর আপনার হিমালয়ে প্রত্যাগমনের কি ব্যবস্থা করিতে হইবে তৎ-সম্বন্ধেও অনুমতি হইলে সম্পাদন করিতে পারি। সম্রাট্, প্রয়াগধামে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া আপনার অভ্যর্থনা করিবেন বলিয়াছেন। সাহান্-সাহা আপনার ও আপনার অনুচরবর্গের পরিচর্য্যাসম্বন্ধেও বিশেষ আদেশ প্রদান করিয়াছেন। সে বিষয়ে কোন ক্রটী হইতেছে না ত? উপস্থিত যুদ্ধকার্য্যে বিব্রত হইয়া আমরা আপনার বিশেষ তত্ত্বাবধান করিতে পারিনাই; তজ্জন্য বড়ই অপরাধী হইয়াছি। পরমহংসদেব কহিলেন—না সে বিষয়ে কোন ক্রটী হয় নাই। বিশেষতঃ এ প্রদেশের লোকেরা আমাদের পরিচর্য্যার জন্য বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। তাহাদের সন্তোষসাধনের জন্য ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে তাহাদের প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিতে হইতেছে।

উভয়ের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে সুবাদার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুবাদার মস্তক অবনত করিয়া কুর্ণিস করিতে করিতে স্বামীর নিকট গমন করিলে, স্বামী হস্ত-উত্তোলন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিতে বলিলেন। সুবাদার অবিচারিত চিত্তে তৃণাসনে উপবেশন করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। সম্রাট্ আক্‌বরসাহা যাঁহাকে সম্মান

করেন, যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতার্থ হন, বাঙ্গালার সুবাদার তাঁহার নিকট অবনত হইবেন, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? স্বামীজী কহিলেন--সুবাদার সাহেব! তোমার কার্য্যে আমি বড় প্রীতিলাভ করিয়াছি। হোম কার্য্যে তোমার বিশেষ সাহায্য পাইয়া, আমার বড় উপকার হইয়াছে। সুবাদার কহিলেন—গুরুজী মালিক। আমি সামান্য ব্যক্তি, সাহান্‌সাহা যাঁহাকে পীর বলিয়া সম্মান করেন, আমি তাঁহার কি সাহায্য করিব? তবে সাহান্‌ সাহা জিজ্ঞাসা করিলে—বলিয়া, নিস্তব্ধ হইলেন। স্বামীজী কহিলেন—সম্রাট্‌ জিজ্ঞাসা না করিলেও আমি তোমার এ সাহায্যের উল্লেখ করিব। সুবাদার পরমানন্দে উঠিয়া কুর্নিস করিলেন। তাঁহার কার্য্য সাধন হইয়াছে; আর অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। সুবাদার বিদায় হইলেন। এইবার প্রস্থানের উদ্যোগ। এ প্রস্থান অনেকের পক্ষে মহাপ্রস্থান হইবে। স্বামীজী বোধহয়, আর এ প্রদেশে আগমন করিবেন না। তিনি বহু দিনাবধি দেহ রক্ষা করিয়া ভগবানের কার্য্য সাধন করিতেছেন; আর দেহ রাখিবার ইচ্ছা নাই। রতিকান্ত হরসুন্দরীরও সেই ইচ্ছা। তবে তাঁহাদের এখনও তপঃসাধন করিতে হইবে। ফল তাঁহারা আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। উমাশঙ্কর, সমভিব্যাহারী হইবার জন্য ধরিয়া বসিয়াছেন। স্বামীজীও তাঁহাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইয়াছেন। উমাশঙ্কর এখন আর সে উমাশঙ্কর নাই। এখন অনুতাপানলেবিশুদ্ধচিত্ত, উমাশঙ্কর কঠোর প্রায়শ্চিত্তে পাপরাশি বিধৌত করিয়া, পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছেন। তাই স্বামীজীর সম্মতি হইয়াছে। বিজয়মহারাজা, বীরেন্দ্ররাজাকে এবং তারাসুন্দরী, শ্যামাসুন্দরী ও উমাসুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। জীবনও আসিয়াছে। শশিমুখীরত কথাই নাই। তাঁহার সদাগতি; কখন্‌ কোথায় থাকেন তাহার স্থিরতা নাই। কেবল প্রচ্ছন্ন আছেন, সুধাংশু-মোহন। পিতৃদেবের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া, তিনি নিকটে আসিতে সাহসী

চইতেছেন না। স্বামীজী শুনিয়া, আসিতে অনুমতি করিলেন। মনেমনে বলিলেন—সর্ব্বানন্দের আবার পরীক্ষা উপস্থিত ; কিন্তু এ পরীক্ষায় তাঁহার প্রথম হইইতে অটল থাকা উচিত। তাঁহার প্রথমবারের চাঞ্চল্য ক্ষমার্হ। সে প্রকার অবস্থায় আমি পতিত হইলে, কখনই স্থির থাকিতে পারিতাম না। সে অবস্থায় যে স্থির থাকিতে পারে, সে মনুষ্য নামের অযোগ্য কঠোরপ্রকৃতি রাক্ষস, অথবা ভীষণ কপটাচারী।

এইবার পরমহংসদেব রতিকান্তপ্রভৃতিকে নিকটে আসিতে কহিলেন। তাঁহারা নিকটে আসিয়া, স্বামীকে প্রণাম করিয়া, অনুমতি মতে উপবেশন করিলেন। বিজয়, বীরেন্দ্র, উমাশঙ্কর, তারা, শ্যামা, উমা প্রভৃতি সকলেই ঐ প্রকার করিলেন। শৈলজাসুন্দরী, পীড়ানিবন্ধন স্বামীজীর সন্দর্শনলাভে বঞ্চিতা হইয়াছেন। সর্ব্বশেষে সুধাংশুমোহন কম্পিতকলেবরে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আশঙ্কা পাছে পিতৃদেবের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। সুধাংশু, স্বামীজীর চরণরেণু গ্রহণ করিয়া, পিতৃচরণে প্রণত হইলেন। স্বামীজী, আশীর্ব্বাদ করিয়া সর্ব্বানন্দের দিকে দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন—সর্ব্বানন্দ নির্ব্বিকার। তাঁহার কাতরতাও নাই, কঠোরতাও নাই। বিরক্তিও নাই, ঔদাস্যও নাই। তিনি পদধূলি দিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন, সহাস্যে সম্ভাষণ করিলেন।

পরমহংসদেব কহিলেন—সাধু সর্ব্বানন্দ! সাধু! আজ তোমার আত্মবিজয় দেখিয়া যারপরনাই সুখী হইলাম। তোমার জন্য বড় চিন্তিত ছিলাম; আজ সে চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইলাম। তুমি যদি অদ্যও কাতরতা প্রকাশ করিতে, তাহা হইলে দুঃখিত হইয়া, শিক্ষা দানপূর্ব্বক আবার উন্নত করিবার চেষ্টা করিতাম; ঘৃণা করিতাম না। কিন্তু কঠোরতা প্রকাশ করিলে, ভণ্ড জ্ঞান করিতাম; সুতরাং অশ্রদ্ধার সহিত তোমার সংস্রব পরিত্যাগ করিতাম। তুমি জ্ঞানধর্ম্মেসমুন্নত পরমযোগী

যতিব্রহ্মচারীই হও, আর যাহাই হও; কর্ম্মবন্ধন-বিজড়িত প্রকৃতিগত পিতা পুত্র সম্বন্ধ নিষ্কাসিত করিবার তুমি কে?

দেহ সম্বন্ধ রাখিতে হইলে সকল সম্বন্ধই রাখিতে হইবে। তবে আসক্তি এবং আনুরক্তি পরিত্যাগ করা তোমার সাধ্যায়ত্ত মাত্র। তুমি সেই আসক্তি এবং আনুরক্তির আশঙ্কায় পুত্রের আগমনে বিরক্তি প্রকাশ কর নাই বা তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা কর নাই দেখিয়া, বুঝিলাম যে, তোমার প্রকৃত উন্নতি হইয়াছে। তুমি আমার সন্ন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আজ সেই শ্রেষ্ঠতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছ। তোমার নিম্নেই যোগজীবনের আসন। সেও অল্পবয়সে বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছে। এক্ষণে আমার গৃহস্থ শিষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, রতিকান্তের অভিপ্রায় শুনিবার ইচ্ছা করি বলিয়া—স্বামীদেব রায়মহাশয়ের দিকে দৃষ্টি-পাত করিলেন।

রতিকান্ত কহিলেন—গুরুদেব! আমার আসক্তি অনাসক্তি কার্য্যাকার্য্য আর কিছুই নাই। সকলই শেষ হইয়াছে। আমাকে শ্রীচরণে স্থান দিন। হরসুন্দরীরও সেই ইচ্ছা। স্বামীজী কহিলেন—তাহাই হইবে। এই সময়ে জীবন আসিয়া প্রভুপদে প্রণাম করিয়া নতমুখে দণ্ডায়মান রহিল। স্বামীজীকে কোন কথা বলিতে তাহার সাহস নাই। রতিকান্ত কহিলেন—প্রভো! প্রভুভক্ত জীবন আমার সেবাকাঙ্ক্ষী। স্বামী কহিলেন—উহাকে সঙ্গে লইতে পার। উমাশঙ্কর কোন কথা কহিতেছেন না; কিন্তু অবিরাম ধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতেছে। কৃপাময় স্বামীজী কহিলেন—বৎস উমাশঙ্কর! তুমিও আমাদের সমভিব্যাহারী হইবে। আমি যোগজীবনকে তোমার জন্য বলিয়াছি। তিনি তোমার শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। নগরবাসী এবং নিকটবর্ত্তী অধিবাসীগণের অনুরোধে স্বামীজী আরও দুই চারি দিবস অবস্থান করিলেন। পরিশেষে প্রস্থানের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

সম্রাট্ প্রেরিত কর্ম্মচারী, সুবাদারের সাহায্যে, স্বামীজীর জন্য যান বাহন এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সরঞ্জাম করিয়া দিলেন। বিক্রমমহারাজা এবং বীরেন্দ্র, মুক্ত হস্তে অর্থ বিতরণ করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর এবং তাঁহার অনুচরবর্গের যখন যাহা আবশ্যক তাঁহাদের বন্দোবস্তে তাহার কোন দ্রব্যেরই অভাব হইল না। তাঁহারা সপরিবারে এবং সানুচরে রাজমহল পর্য্যন্ত অনুগমন করিলেন। সেইখানেই এই মহাপ্রস্থানযাত্রীগণ শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্যামা, উমা, তারা, বিজয়, বীরেন্দ্র এবং সুধাংশুমোহন, স্বামীজী ও অন্যান্য সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম করিয়া, রতিকান্ত, উমাকান্ত ও হরসুন্দরীর নিকট আসিলেন।

এবার ক্রন্দনের পালা। তারা, উমা ও শ্যামা কাঁদিয়া আকুলা হইলেন। রতিকান্ত ও হরসুন্দরীও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা সাশ্রু নয়নে কন্যাদিগকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। রতিকান্ত কহিলেন—মা তারাসুন্দরি! উমাসুন্দরি এবং শ্যামাসুন্দরি! প্রসন্ন অন্তরে আমাদিগকে বিদায় দেও। তোমাদিগকে এই প্রকার রোদনপরায়ণা দেখিয়া গেলে আমাদের পরমার্থচিন্তার ব্যাঘাত হইবে। ইষ্টচিন্তা করিবার সময়ে অশ্রুমুখী তনয়াগণের বিবন্নবদন মনে পড়িলে সে চিন্তা ভুলিয়া যাইব। অতএব চিত্তস্থির করিয়া, দৃঢ় হইয়া আমাদিগকে বিদায় দেও; আর মায়াবন্ধনে আবদ্ধ করিওনা। তোমরা আমাদের ধর্ম্মশীলা, পুণ্যশীলা, এবং কর্ত্তব্যশীলা দুহিতা, তেমাদিগকে আর অধিক কি বলিব—গুরুজনের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহাই কর।

হরসুন্দরী কহিলেন—মা সকল! আমি স্ত্রীলোক; অটল গিরি সদৃশ স্বামীদেব যখন তোমাদের কাতরতা দর্শনে চঞ্চল হইয়াছেন, তখন আমার কি হইতেছে বুঝিয়া দেখ।

এই বলিয়া—তিনি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। উমাকে

কহিলেন—মা! অধিক দিন তোমাকে লইয়া আদর আহ্লাদ করিতে পারিলাম না। আশীর্ব্বাদ করি সুধাংশুমোহনকে লইয়া চিরসুখী হও। দিদিকে ভালবাসিবে, আর তারা দিদিকে সহোদরা জ্ঞান করিবে। তারা আমার তনয়া। শ্যামা তারায় বিভিন্নতা নাই। আর এক কথা এই যে, ধর্ম্মে মতি রাখিবে, এবং স্বামীভক্তি করিবে। স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর গতি নাই। মা তারা ও শ্যামা! তোমাদের প্রতিও আমার ঐ উপদেশ। এক্ষণে রাজার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, তোমরা গৃহে চলিয়া যাও।

রাজা, কন্যাগণের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং মধুর সম্ভাষণে একে একে কন্যাগণের নিকট বিদায় লইলেন। এইবার বিজয়, বীরেন্দ্র এবং সুধাংশুমোহন অগ্রসর হইলেন। সকলেরই ছলছল নয়ন গদ্‌গদ্ ভাষণ।

চিতোরবিজয়কারী বিজয়কুমার, এবং দায়ুদের দর্পহারী বীরেন্দ্র-নারায়ণ আজ তরলমতি বালক; সুধাংশুমোহনও তাহাই। রাজা সকলকেই আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া বিবিধ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

উমাশঙ্কর আসিলেন। তাঁহার কঠোরতা নাই বটে; কিন্তু বড় দৃঢ়তা। তারার নিকট আসিয়া কহিলেন—মা! মায়া বাড়াইওনা। আমার বড় ব্যগ্রতা হইয়াছে। মহাপাপীর পাপমোচনের উপায় হইল বলিয়া, ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দাও। তোমার গর্ভধারিণীকে আমার জন্য দুঃখ করিতে নিষেধ করিবে। আমার পুনর্জন্ম হইল। এই বলিয়া, তারা, শ্যামা ও উমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহারা সকলে উমাশঙ্করের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তারার হৃদয়ে ঘোর তুফান। হৃদয় দৃঢ় করিয়া পিতৃ-দেবকে বিদায় দিলেন বটে, কিন্তু প্রবলতরঙ্গে হৃদয় তোলপাড় করিতে লাগিল। উমাশঙ্কর, বিজয়, বীরেন্দ্রপ্রভৃতির নিকট গিয়া বিদায়গ্রহণ

করিলেন। বিজয়ের নিকট কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, কহিলেন—বাবা! অনেক অত্যাচার করিয়াছি, অনেক কষ্ট দিয়াছি; এখন তাহার জন্য ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি; মহাপাপীকে ক্ষমা করিবে কি? বিজয় কাঁদিতে কাঁদিতে পদধূলি লইয়া কহিলেন—বাবা! এখন আপনি মহাপুরুষ। প্রতিপালন করিয়াছেন, সম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন, না করিয়াছেন কি? অবাধ্যতার জন্য সামান্য তিরস্কার করিয়াছেন মাত্র; কিন্তু সে তিরস্কারে আমার অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। আমি সেইসময়ে দেশত্যাগ করিয়াছিলাম বলিয়া, আজ বঙ্গবিহার উড়িষ্যার শীর্ষস্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছি। উমাশঙ্কর আর কোন কথা না কহিয়া, বিজয়, বীরেন্দ্র এবং সুধাংশুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন। সকলের শেষে জীবন ঘোষ আসিয়া বিজয় প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিল। বিজয় ও বীরেন্দ্র একযোগে কহিলেন—জীবন দাদা! সত্য সত্যই কি তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলে? জীবন কহিল—আমি দাসানুদাস; আমাকে কি দাদা বলিতে আছে? গুরুতর লোক না হইলে দাদা বলা যায় না। বিজয় ও বীরেন্দ্র বলিলেন—জীবন দাদা! তুমি ক্ষুদ্রনহ। তুমি বংশ মর্য্যাদায় ক্ষুদ্র হইলে কি হয়, যে অসাধারণ স্বার্থত্যাগের, যে অলৌকিক প্রভুভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছ, তাহার তুলনা নাই। আমরা বাল্যকাল হইতে তোমাকে দাদা বলিয়া আসিতেছি,—এখন না বলিব কেন? তুমি যদি আমাদের নিকট থাকিতে, তাহাহইলে আমরা তোমাকে দাদার ন্যায় পরম সমাদরে রাখিতাম। কিন্তু তোমার পরমার্থকার্য্যে বাধা দিতে ইচ্ছা যায় না। যাও, পরম যোগী প্রভুর পবিত্র চরণ সেবা করিয়া, সাধুসঙ্গের উপাদেয় ফললাভ কর গিয়া। বলিয়া—বিজয়মহারাজ সকলকে লইয়া বিষণ্নমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। স্বামীজীও সানুচরে হিমাচল যাত্রা করিলেন।

উপসংহার।
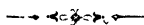
বিজয় মহারাজার যশঃপ্রভা দিগন্ত বিস্তারিত হইয়াছে। যেমন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, তেমনি দয়ামায়া।

হাটে, বাজারে, পথে, ঘাটে সর্ব্বত্রই বিজয়মহারাজার কথা। লোকে মনে করিতেছে, আবার বুঝি রামরাজ্য ফিরিয়া আসিল। বহু বিস্তৃত বঙ্গরাজ্যের সুদূরভূমি লইয়া, বিজয়মহারাজার রাজ্য। রাজ্যমধ্যে বঙ্গাধিপের অস্তিত্ব অনেকেরই অপরিচিত। এখানে বিজয়মাহারাজার দোহাই চলিয়া থাকে। রাজ্যমধ্যে মহারাণী তারাসুন্দরীও, অপরিচিতা নহেন। তাঁহাকে লোকে অন্নপূর্ণা বলিয়া থাকে। মহারাণীর আদেশে, রাজধানী এবং প্রধান প্রধান ডিহীতে অন্নসত্র খোলা হইয়াছে। সেখানে দীনদরিদ্র, অন্ধ, আতুর পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিতে পায়। ইহাভিন্ন বস্ত্রদানেরও আদেশ আছে। শারদ ও বাসন্তী দুর্গোৎসবের সময়ে, বৎসরে দুইবার দরিদ্রগণ প্রত্যেকে একজোড়া করিয়া বস্ত্র এবং বিবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্যের প্রচুর আহার্য্য প্রাপ্ত হয়। এই জন্য মহারাণী, রাজ্যমধ্যে অন্নপূ নামে পরিচিতা।

মহারাণীর ঐসকল অন্নসত্রের নিয়মাবলী অতি সুন্দর। কাহাকে কর্কশকথা কহিবার হুকুম নাই। যে, যখন আসিবে তাহাকে তখ ভোজন করাইতে হইবে। ইহাভিন্ন সরকারীব্যয়ে মহারাজার পৃ অতিথিশালাও আছে। মহারাজা সস্ত্রীক্ জমিদারী দর্শনে বহির্গত হই গগনভেদী জয় মহারাজা বাহাদুরকি জয়, জয় মহারাণী অন্নপূর্ণা মাতাজী জয় শব্দে গগন বিদীর্ণ হইয়া যায়। শা রেন্দ্ররাজারও লে যশঃ গাহিয়া থাকে।

দেবী শৈলজাসুন্দরী, তারামহারাণীর কল্যাণে, দোলদুর্গোৎসব এবং ব্রত নিয়মাদি করিয়া, মনের আনন্দে কাল কাটাইতেছেন।

গৌরী কখন শ্যামার রাজ্যে, কখন তারার রাজ্যে, সখীরূপে সমাদৃতা। আর সিরাজু? পিতৃদত্ত হীরা, মতি মাণিক্যে তাঁহার অর্থের অভাব নাই। দায়ূদখাঁ পলায়নকালে, রাজকোষ হইতে বিস্তর সম্পত্তি লইয়া যান। ঐসকল সম্পত্তি সিরাজুর নিকট ছিল। দায়ুদের মৃত্যুর পরে সিরাজু ঐসকল সম্পত্তি লইয়া পাটনার পরপারে হাজিপুরের সন্নিকটে একটী মসজীদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। দীনদুঃখী এবং অনাথগণের থাকিবার জন্য উহার চতুষ্পার্শ্বে গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন। পীড়িতের চিকিৎসার জন্য হাকিম নিযুক্ত করিয়াদিয়াছেন। দরিদ্র মুসলমান বালকদিগের শিক্ষার জন্য মৌলভির ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনাথা বিধবাগণের ভরণ পোষণের মাসিক সাহায্য আছে। দরিদ্রদিগের দৈনিক ভোজনের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। মুসলমান ফকির এবং হিন্দু সন্ন্যাসীদিগের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ বন্দোবস্ত আছে। তাঁহার দানের হিন্দু মুসলমান বিচার নাই। দানের পাত্র হইলেই, তিনি দান করিয়া থাকেন। তাঁহার এই সৎকার্য্যের কথা নবাবের এবং সম্রাটের কর্ণগোচর হইয়াছে। সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া, স্বহস্তে পত্র লিখিয়া ধন্যবাদ দিয়াছেন। নবাব ভক্তিগদ্‌গদ্ হইয়া কয়েকবার আসিয়া সেলাম করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানেরা তাঁহার উক্ত স্থানকে পীরবিবির দরগা এবং হিন্দুরা কুমারীবিবির স্থান বলিয়া থাকে।